রবীন্দ্রনাথ

শতবার্ষিকী প্রবন্ধ-সংকলন

রবীন্দ্রনাথ

শতবার্ষিকী প্রবন্ধ-সংকলন

সম্পাদক
গোপাল হালদার

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ
ক লি কা তা — ১২

প্রকাশক
সুরেন দত্ত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মুদ্রক
শ্রীঅজিতকৃষ্ণ ভট্টাচায
মুদ্রণশ্রী প্রেস
১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা-৬

গ্রন্থন
নিউ বেঙ্গল বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

প্রচ্ছদপট
গণেশ বসু

সূচীপত্র

রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি : শিল্পী যামিনী রায়

নিবেদন

রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রকাশনীর এটি শ্রদ্ধার্ঘ্য।

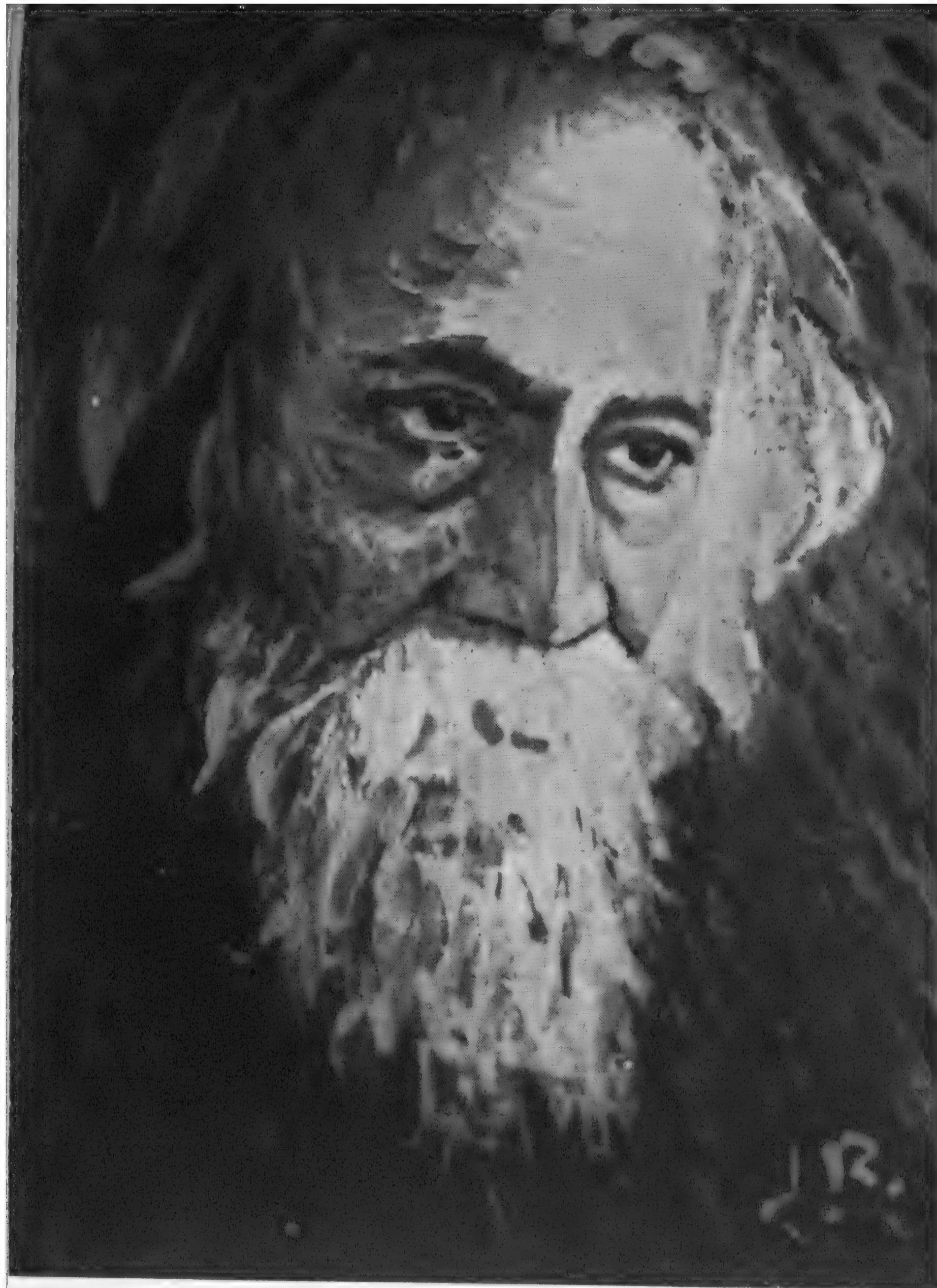
রবীন্দ্র-প্রতিভা আধুনিক ভারতের ইতিহাসের এক অসামান্য সম্পদ। এমন বহুমুখী সৃষ্টিপ্রতিভার আবির্ভাব আমাদের দেশে আর হয়েছে কিনা জানি না; পৃথিবীতেও সম্ভবতঃ আর বেশী হয় নি। সাহিত্যের সর্ববিভাগে রবীন্দ্রনাথের দানের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য, এবং তাঁর কীর্তির চমৎকারিত্বের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁর পঞ্চাশৎ জন্মোৎসবের দিনে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রায় সে প্রয়াসে ব্যর্থ হন। পরবর্তী ত্রিশ বৎসরের রবীন্দ্র-কীর্তি যে সে-মাহাত্ম্যকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে, এ কথাও সুনিশ্চিত। সেই সঙ্গে সঙ্গীতে, শিল্পে, ভাবনায় ও কর্মে তাঁর দানের কথা স্মরণ করলে এই কথাই মনে হয়, এরূপ সর্বতোমুখী প্রতিভা আমাদের ইতিহাসে আর আবির্ভূত হন নি।

ইতিহাসের এই পর্বে ছাড়া কোনো প্রতিভার এরূপ বহুমুখী প্রকাশ ইতিপূর্বে সম্ভবও ছিল না। ভারতীয় সভ্যতার নিজস্ব ধারা ও পৃথিবীর সভ্যতার বিচিত্র ধারা, প্রাচীন ইতিহাসের তপস্যা ও আধুনিক ইতিহাসের অভিযান, সাম্রাজ্যবাদের পৃথিবীগ্রাসী দৌরাত্ম্য ও পৃথিবী-জোড়া মানুষের মুক্তি-চেতনা,—রবীন্দ্র-জীবনকালেই পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাতে দুর্বার গতিময় আলোড়নের সৃষ্টি করে। শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসেই গতি-চাঞ্চল্য দেখা দেয় এমন নয়,—সে চাঞ্চল্য এশিয়া-আফ্রিকার নব-জীবনেরই প্রথম শিহরণ। পৃথিবীর ইতিহাসেই কালান্তরের আবর্ত-সংকুল উদ্বেলতা তখন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, দেখা দেয় নবদিগন্তে জীবনের রক্তিমাভাস। রবীন্দ্র-প্রতিভাও এই মহালগ্নেই আত্মপ্রকাশ করে। আর রবীন্দ্র-প্রতিভার সেই প্রকাশের মধ্য দিয়ে সেই কালান্তরের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় ঘটে, ভাবীকালের আভাসও আমরা লাভ করি। পৃথিবীর বিচিত্র জীবনের কবি এবং কালান্তরের এই বাণী-বাহক রূপে রবীন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে সত্যই আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

এই অনুভূতিবশেই শতবার্ষিকী বৎসরে আমাদের এই সশ্রদ্ধ আলোচনার সংকল্প—সাধারণভাবে রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়-গ্রহণের সম্মেলিত আয়োজন। প্রকাশকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে স্বীকার্য—আয়োজন সংকল্পানুযায়ী সুসম্পন্ন হল না। রবীন্দ্র-প্রতিভার কোনো কোনো প্রধান দিক অনালোচিত রইল, অন্য কোনো কোনো দিকেও বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর হয় নি, আলোচনায় ক্রমভঙ্গও অনিবার্য হয়ে পড়েছে। সম্পাদকের পক্ষ থেকে বক্তব্য—শ্রদ্ধা ও যুক্তির সঙ্গে আলোচনার দায়িত্ব ও অধিকার প্রত্যেক লেখকেরই স্বীকৃত হয়েছে; দৃষ্টিভঙ্গির সাধারণ ঐক্য সত্ত্বেও কারো বক্তব্যের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য স্বীকার করতে বাধা দেখি নি। কারণ, এ সংগ্রহ রবীন্দ্র-প্রতিভার সঠিক পরিমাপ নয়, রবীন্দ্র-প্রতিভার বুদ্ধি ও শ্রদ্ধা-সম্মত পরিচয়। সমগ্রভাবে রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় বা তার সম্পূর্ণ পরিমাপ এ পরিসরে সম্ভবপরও নয়।

লেখকমণ্ডলীর প্রত্যেকের নিকট সম্পাদক ও প্রকাশকগণ কৃতজ্ঞ। তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতাতেই এই শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন সম্ভবপর হল। রবীন্দ্র আলোচনায় তা সহায়ক হোক, আমাদের সকলেরই তা আন্তরিক কামনা।

গোপাল হালদার



সার্বভৌম কবি

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

'Tis sufficient to say, according to the proverb, that here is God's plenty.—*Dryden on Chaucer*

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখতে গেলে সর্ববিধ অতিকথন হতে নিবৃত্ত থাকার সংকল্প গ্রহণ করা অবশ্যই কর্তব্য। কিন্তু বাংলা যাদের ভাষা রবীন্দ্রনাথের কাছে তাদের ঋণের বোঝা এত বেশী যে একেবারে মেপে কথা বলা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অতিকথন হয়তো কিছু ঘটবে, তাকে যথাসাধ্য বর্জনের প্রয়াস ভিন্ন অন্য কোনো প্রতিশ্রুতি বানচাল হয়ে পড়ারই সম্ভাবনা।

কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম-বর্ষপূর্তি উপলক্ষে যে জয়ন্তী উৎসব হয়েছিল, সেখানে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁকে মানপত্র অর্পণ করতে গিয়ে "সার্বভৌম কবি" বলে সম্বোধন করেছিলেন। যদি কোনো বিশেষণে কবি রবীন্দ্রনাথকে ভূষিত দেখতে ইচ্ছা করে তো বোধ হয় সব চেয়ে শোভন এই "সার্বভৌম" শব্দটি। সর্ব ভূমিতে তার বিচরণ, সর্ব ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাপ্তি, সর্ব দেশে তাঁর অধিষ্ঠান, সর্ব মানবীয় আস্বাদে ও আকুলতায় তার শিল্প সত্তার পুষ্টি, সর্ব জনের অন্তরে তাঁর অধিকার। প্রায় ত্রিশবৎসর পূর্বে এক ভাষণে (পৌষ, ১৩৩৮) তিনি যা বলেছিলেন, তা অনলস রূপস্রষ্টার অমিত শ্লাঘা বিনা কারও মুখ থেকে নিঃসৃত হতে পারে না :

"আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জনীয় জিনিস ভূরি ভূরি আছে তাতে সন্দেহ নেই। এ-সমস্ত আবর্জনা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে-মুক্তি পরম

পুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে, যিনি 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট'; আমি আবাল্য অভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্য-সাধনার গণ্ডীকে অতিক্রম করে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশে যথাসাধ্য আমার কর্মের অর্ঘ্য আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি—তাতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ। আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা—তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহঙ্কার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।"

বহুধা কীর্তির যে ভাতি রবীন্দ্রনাথের অশীতিবর্ষব্যাপী সাধনায় বিকীর্ণ হয়েছে, তাকে ধরে রাখার মতো ব্যাপ্তি বাঙালী মনের আকাশে এখনও নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও চরিত্রে এমন এক কুহক ছিল, লোকোত্তর শিল্পকর্ম আর মানবিক মহানুভবতার এমন আশ্চর্য সংমিশ্রণ তাঁর মধ্যে ঘটেছিল যে বাঙালী তাঁকে শুধু শুষ্ক শ্রদ্ধা দিয়ে তুষ্ট হতে পারে নি। ধর্মগুরু বা জননেতা না হয়ে যদি কেউ বাঙালীর হৃদয়ের পূজা পেয়ে থাকেন তো তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ।

বাঙালী মনে রবীন্দ্রনাথ যে স্থান নিয়ে আছেন, তার কিছু পরিচয় মেলে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি কথায়। তিনি বুঝি একবার বলেছিলেন যে ভারতবর্ষীয় লেখকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হলেন ব্যাস এবং তাঁর অব্যবহিত পরেই উল্লেখ করতে হয় রবীন্দ্রনাথের নাম। কবিকৃতি নিরূপণে এরূপ তুলনাব্যঞ্জক মন্তব্য সর্বদা সহায়ক না হলেও এর যে এক বিশেষ মূল্য ও ইতিহাসগত গুরুত্ব আছে, তাতে সন্দেহ নেই। সাহিত্যের ক্ষেত্রে মহাভারতকার বলে কীর্তিত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস ব্যতীত অপর সকল মহাত্মার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখের চেয়ে সম্মান দেখানো কোনো ভারতবর্ষীয়ের পক্ষেই সম্ভব নয়। এডোয়ার্ড টম্‌সন্ বলেছিলেন যে কালিদাসের পর যে হাজার দেড়েক বৎসর কেটেছে তখনকার সব চেয়ে বড়ো ভারতবর্ষীয় কবি হলেন রবীন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্রের মন্তব্যের তাৎপর্য এর চেয়েও অনেক বেশী।

ধর্মশাস্ত্রমিদং পুণ্যমর্থশাস্ত্রমিদং পরং।
মোক্ষশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা॥
ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভারতর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ॥

এই শ্লোকেরই লোকায়ত অনুবাদ হল—'যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে'। মহাভারতে যা নেই, ভারতবর্ষেও তার কোনো অস্তিত্ব নেই। তাই হিমবান্ গিরি আর ভারত মহাসাগরের মতো মহাভারত হল ভারতবর্ষের তৃতীয় রত্ননিধি। যে সম্ভার আমরা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছি, তাকে মহাভারত ভিন্ন অপর সকল রচনা দ্বারা অনতিক্রান্ত বলার চেয়ে বিপুল প্রশস্তি আমাদের পক্ষে কল্পনীয় নয়।

এতে বিস্মিত হওয়ার যে কিছু নেই, তা আমাদেরই কবিকুলের কাছ থেকে জেনেছি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সরল আবেগে বলেছিলেন ১৯১৩ সালে :

যে ভাবই ওঠে প্রাণের মাঝে,
তোমার গানে সকলই আছে—

বাস্তবিকই অনুভূতির সর্ববিধ অন্বয় তাঁর বিচিত্র সৃষ্টিতে এমন সৌষ্ঠব ও শক্তিতে সমুজ্জ্বল যে বাঙালী মনে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তাই ১৯৫৭ সালে "রবীন্দ্রনাথের কোন্ লেখা অভিভূত করেছিল" প্রশ্নের উত্তরে বিষ্ণু দে বলেন :

এ যেন বা জিজ্ঞাসা সূর্যের
কোন ক্ষণ ভালো লাগে সারাদিনে প্রহরে প্রহরে।
কিংবা কবে কোন্ দিন ঋতুতে ঋতুতে বৎসরে
সূর্যের কি গান ভালো লেগেছিল প্রকাশ্য-উহ্যের
মধ্যাহ্নে ঊষার স্বচ্ছ বৈকালীতে সন্ধ্যায় করুণ?

তাই রবীন্দ্র-চিন্তায় নিবিষ্ট হতে গেলে মনে হয় যেন প্রকৃতই সৌরাকাশে ভাসছি। "হে সূর্য, হে মোর বন্ধু" বলে সম্বোধন করার আর্য অধিকার যে রবীন্দ্রনাথের ছিল, তাতে আর সন্দেহ থাকে না।

সমগ্রভাবে এবং সংক্ষেপে রবীন্দ্রকাব্যের বিচার শুধু যে দুরূহ তা নয়, বোধহয় অতি কৃতী লেখকের পক্ষেও অসাধ্য। এ-কথা মনে রেখেই কয়েকটি কথা বলার চেষ্টা এখানে করা যাবে।

১৩০১ সালের বৈশাখ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

"একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মতো এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্মসংকীর্তন করিবার উপযোগী ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক-একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত

করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্য সুর বাজিত, আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুবপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।" বাংলা ভাষায় এই "কলাবতী রাগিণী আলাপ" প্রথম করলেন রবীন্দ্রনাথ; তাঁর অগ্রজ কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৪-১৯২০) তাই উৎফুল্ল হয়ে বলেছিলেন যে যেখানে "বাজিত গো ঢোল আর কাঁসি" সেখানে "কাব্যের বংশীধর" এসে কবিতা-কালিন্দীকে লীলারঙ্গে উজান বইয়ে দিলেন। মধুর নবছন্দে যখন রবীন্দ্রনাথের "আলোকবীণা" বেজে উঠল, তখন যেন বাংলার আকাশে অকস্মাৎ এমন এক জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটেছিল যা দূরাবস্থিত হয়েও আনন্দের অজানা তুফান প্রবাহিত করে দিল। বাংলা কবিতার অপরিসর ঐতিহ্য সেই অসামান্য প্রতিভার মায়াস্পর্শে বুঝি দিক্-দিগন্তে সম্প্রসারিত হয়ে গেল। বাংলার প্রাণকে শুধু পূর্ণ করে নয়, তাকে আপ্লুত করে যে গান বাজতে থাকবে, তার সুর দীর্ঘজীবন ধরে রচনা ও সাধনা করলেন রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাপ্তি আর বিস্তারের দিক থেকে রবীন্দ্র-প্রতিভা বিস্ময়কর; যদি বলা যায় অতুলনীয় আর ভাবতে হয় লিয়োনার্দো আর গ্যেটে-র মতো মহারথীদের কথা তো অন্যায় হবে না। টম্‌সন্ হিসাব করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ কবিতার পংক্তি লিখেছেন দেড় লক্ষেরও বেশী। (মিল্‌টনের কাব্য আঠারো হাজার পংক্তিরও কম)। আর গদ্য রচনার পরিমাণ তার দ্বিগুণেরও বেশী—অপ্রকাশিত লেখা তো এ-হিসাবে একেবারেই ধরা হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেতর ক্ষেত্রেও এই আশ্চর্য কর্মযোগীর অবদান স্মরণ করলে বোঝা যাবে যে রবীন্দ্রনাথের গঠনে ইস্পাত আর কংক্রীট-এর ভাগ ছিল কত বেশী, বোঝা যাবে দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা ও সাধনা বিনা কখনও শুধু সহজাত প্রতিভার পূর্ণ স্ফুরণ ঘটে না। বাংলা সাহিত্যের প্রাদেশিকতাদুষ্ট পরিবেশে যিনি সূক্ষ্ম সৌকুমার্যের সন্ধান এনে হৃদয়বৃত্তির বহু রুদ্ধ দ্বার খুলে দিলেন, তিনি যে পেলব বলতে যা মনে হয় তা ছিলেন না, বজ্রমানিক দিয়ে মালা গাথার মতো চিত্ত আর বাহু যে তার ছিল, প্রাণের হৃদকে যে দীপক তানে ধ্বনিত করার মতো দীপ্তি ছিল, তা বোঝা সহজ হবে যখন কবির আজীবন ক্লান্তিহীন অন্বেষার কথা আমরা স্মরণে রাখি।

দীর্ঘকাল ধরে নিরন্তর লিখে গেলে কোনো কোনো রচনায় কিছু দোষ আর দুর্বলতা ঢুকে পড়া স্বাভাবিক; রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তা ঘটেছে স্বীকার

করতে সংকোচ থাকা উচিত নয়। বীণার তার সামান্য একটু আলগা হলেই ধ্বনি-মাধুর্যে হানি ঘটে। কিন্তু বলতেই হবে যে মাঝে মাঝে সেদিকে রবীন্দ্রনাথেরও বিচ্যুতি দেখা গেছে, সুর ঠিক বাজে নি। ধূপ না পোড়ালে যে গন্ধ ঢালে না আর দীপ না জ্বালালে যে আলো দেয় না, এ-কথা তিনিই আমাদের বলেছেন। কিন্তু হয়তো মাঝে মাঝে তিনি লক্ষ্য করেন নি যে ধূপ ঠিক পুড়ছে না আর প্রদীপের শলতে ভালো করে জ্বলছে না। বিশেষ করে তাঁর কবিতার ইংরেজী অনুবাদে এই দোষ কটু হয়ে উঠেছে বলে বিদেশী ছিদ্রান্বেষীরা নিন্দার ভাষা সহজে খুঁজে পেয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য এমনও দেখা যায় যে অনুবাদে কবিতার মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় নি (হয়তো বা "Thou art the sky and thou art the nest as well"-এর মতো লাইনে তার রূপ আরও উজ্জ্বল হয়েছে), কিন্তু প্রায়ই যেন বাংলা কাব্যলক্ষ্মী ইংরেজী পরিচ্ছদে অস্বস্তি বোধ করেছে আর কিছুতেই তার অবগুণ্ঠন খুলতে রাজী হয় নি। ব'ছাইয়ের দোষে বিষয়ের একঘেয়েমিও অনুবাদে একটু বেশী ধরা পড়েছে। যে-ভাবধারা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টির ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র, তাই ইংরেজী "গীতাঞ্জলি"-তে ক্রমাগত প্রকাশ পেয়েছে, বিদেশী মনকে একদা তার অপরিচিত সৌন্দর্য মুগ্ধ করলেও সেই মোহভঙ্গ হতেও বিলম্ব ঘটে নি। আবার এমনও দেখা গেছে যে বাংলার কাব্যভাণ্ডার ইংরেজীর তুলনায় শীর্ণ বলে সুর আর ছন্দ মিলে আমাদের কাছে যা মনোরম ঠেকে থাকে, তারই রস ইংরেজীতে লেগেছে যেন নিরেশ। অনুবাদের কথা বাদ দিলেও বলতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ যে-স্তরের কবি তা মনে রাখলে তাঁর রচনাবলীর কিয়দংশকে বাতিল না করলেও খানিকটা আড়ালে সরিয়ে রাখতে হবে। তাঁর জীবন ও কাব্যের ইতিবৃত্তে অবশ্যই তাঁর লেখা প্রতি অক্ষরটি আমাদের কাছে মূল্যবান। কিন্তু তাঁর অজস্র ও অপর্যাপ্ত সৃষ্টিধারায় ত্রুটি আর অপূর্ণতার অস্তিত্ব স্বীকার করলে প্রত্যবায় ঘটে না।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ-বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। আমাদের দেশে নিন্দুকের অভাব সাধারণত হয় না, এবং রবীন্দ্রনাথ তাদের কটুবাক্যে একদা বড় কম ক্লিষ্ট হন নি। আমাদের সৌভাগ্য এই যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অন্তর্দৃষ্টিবলে তরুণ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে অভিবাদন করেছিলেন, আর প্রিয়নাথ সেনের মতো "সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক" রসবিচারের রশ্মি দেখিয়ে কবিকে পুলকিত করতে পেরেছিলেন। কবি "জীবনস্মৃতি"-তে (পৃঃ ১৪৫) লিখেছেন :

"ভগ্নহৃদয় পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাসংগীতে তাঁর মন জিতিয়া লইলাম।…তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিযাছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ-আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত তাহা বলা শক্ত।"

নিজের লেখা সম্বন্ধে মমতা স্বাভাবিক, কিন্তু "সঞ্চয়িতা"-র জন্য কবিতা সংকলন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটুও ইতস্তত না করে বলেছেন যে অতি অল্পকয়েকটি কবিতা বাদ দিয়ে "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী", "সন্ধ্যাসঙ্গীত", "প্রভাতসংগীত" আর "ছবি ও গান"-গ্রন্থগুলিকে তিনি স্বীকার করতে পারেন না, কারণ তাদের "কেবল একটি অপরাধ, লেখাগুলি কবিতায় রূপ পায় নি।" "কড়ি ও কোমলে অনেক ত্যাজ্য জিনিস আছে কিন্তু সেই পর্বে আমার কাব্য ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে।" ভুললে চলবে না যে "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী"-তে আছে "মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান" কিংবা "কো তুঁহু বোলবি মোয়"-এর মতো মনোহর রচনা, আর ঐ পদাবলী ছিল বৈষ্ণব কাব্যরীতির এমন নিপুণ প্রতিধ্বনি যে তা আপাতচতুর এক বঙ্গসন্তানকে ইয়োরোপের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে "ডক্টর" খেতাব পাওয়ার সরঞ্জাম সরবরাহ করেছিল। আবার "প্রভাত- সংগীত"-এ আছে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' আর 'প্রভাত-উৎসবে'র মতো কবিতা যার মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্রকাব্যপ্রভার পুণ্য সূচনা। "ছবি ও গান"-এরই অন্তর্ভূত হল 'রাহুর প্রেম'—হৃদয়ের তীব্র দহন যাতে রূপ পেয়েছে, কবির হাতের কাছে সহজে জড়ো-করা ফুলের গন্ধ আর বাঁশীর আওয়াজকে একেবারে ছাপিয়ে উঠেছে। যখন এমন লেখা তাঁর কলম থেকে বার হচ্ছিল তখনকার কাজ সম্পর্কেই কবি নিজে কত কঠোর, তা মনে রাখা আমাদেরও দরকার।

"জীবনস্মৃতি" প্রথম প্রকাশ হয়েছিল ১৩১৯ বঙ্গাব্দে। যখন "সন্ধ্যাসঙ্গীত" প্রকাশ হয় (১২৮৮) তখনকার সম্বন্ধে কবি লেখেন (পৃঃ ১৪২):

"এখন হইতে কাব্যসমালোচকদের মধ্যে আমার সম্বন্ধে এই একটা রব উঠিতেছিল যে আমি ভাঙা-ভাঙা ছন্দ ও আধো-আধো ভাষার কবি। সমস্তই আমার ধোঁয়া-ধোঁয়া, ছায়া-ছায়া। কথাটা তখন

আমার পক্ষে যতই অপ্রিয় হউক না কেন, তাহা অমূলক নহে। বস্তুতই সেই কবিতগুলির মধ্যে বাস্তব সংসারের দৃঢ়ত্ব কিছুই ছিল না। ছেলেবেলা হইতেই বাহিরের লোকসংস্রব হইতে বহুদূরে যেমন করিয়া গণ্ডিবদ্ধ হইয়া মানুষ হইয়াছিলাম তাহাতে লিখিবার সম্বল পাইব কোথায় ? ”

দুঃশীল নিন্দুকেরা “পায়রা কবি”, “রবিয়ানা” ইত্যাদি কথা ব্যবহার করে তাঁকে উপহাস করলে সেই কটূক্তিতে কিঞ্চিৎ পীড়িত হলেও তাকে গায়ে মাথার মতো ক্ষুদ্রতা রবীন্দ্রনাথের কখনও ছিল না, কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করা দরকার। ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ কিভাবে কেমন করে লেখা হয়েছিল, তার যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন তা খুবই সুবিদিত। সদর স্ট্রীটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফ্রী-স্কুলের বাগানের দিকে চেয়ে তাঁর “চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল।” তিনি দেখেছিলেন “একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত।” জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিতে তাঁর মন্তব্য আছে: “সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে।” আরও উদ্ধৃতি দিতে লোভ হয় :

“বন্ধুকে লইয়া বন্ধু হাসিতেছে, শিশুকে লইয়া মাতা লালন করিতেছে, একটা গোরু আর একটা গোরুর পাশে দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিতেছে। ইহাদের মধ্যে যে একটি অন্তহীন অপরিমেয়তা আছে তাহাই আমার মনকে বিস্ময়ের আঘাতে যেন বেদনা দিতে লাগিল। এই সময়ে লিখিয়াছিলাম—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।” (পৃঃ ১৪৭-৪৮)

এই সময়কে কবি তাঁর হৃদয়-অরণ্য থেকে নিষ্ক্রমণের কাল বলেছেন, কিন্তু “কড়ি ও কোমল”-প্রসঙ্গে যখন তিনি বলেন : “আমার কবিতা এখানে মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে,” কিংবা “যৌবনের আরম্ভে মানুষের জীবলোক আমাকে তেমনি করিয়াই টানিয়াছে। তাহারও মাঝখানে আমার প্রবেশ ছিল না, আমি প্রান্তে দাঁড়াইলাম।”—তখন তাঁর বহু কবিতা পাঠে যে ধারণা জন্মে, তারই যেন সমর্থন মেলে। মানুষের বিচিত্র জীবন তাঁকে সর্বদা প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে, কিন্তু তার একান্ত অন্তঃপুরে তাঁর প্রবেশে যেন কী এক বাধা

প্রায় নিয়তই এসে দাঁড়াত। তাই "সবুজপত্র"-এ লেখা এক প্রবন্ধে (১৩২৪, পৃঃ ২৩৭-৩৯) তিনি বলেন :

"আমি সত্যি বুঝতে পারিনে সুখদুঃখ-বিরহমিলন-পূর্ণ ভালবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল", আর উল্লেখ করেন দোটানার কথা, যাতে "কাব্যসৃষ্টি নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে বাষ্প হয়ে যায় না এবং নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে কঠিন সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।"

এই উভয় সংকটের চাপে রবীন্দ্রকাব্য কথঞ্চিৎ কক্ষভ্রষ্ট হয়েছে বললে অমর্যাদা করা হয় না, কবির বহু অনবদ্য সৃষ্টিকে অনাদর করা হয় না।

"মানসী" (রচনাকাল ১২৯৪-৯৭) প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবির যেন বয়ঃসন্ধি কাটল আর শক্তির সতেজ পরিণতি যে দীপ্তি নিয়ে দেখা দিল তার তুলনা আমাদের সাহিত্যে নেই। কিন্তু তার পূর্বেই বাংলা কাব্যের রাজ্যে নতুন জিনিসের ভিড় তিনি লাগিয়ে দিয়েছিলেন। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে কর্তৃত্ব বিস্তারের যে ভাস্বর পরিচয় তিনি জীবনের প্রায় সর্বশেষ দিন পর্যন্ত দিয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছিলেন, তারই আভাস আছে অল্প বয়সের অপরিণত রচনায়, আছে তাঁর অনুবাদে, আছে বৈজ্ঞানিক বিষয় প্রবর্তনে, আছে শালীনতা ও সাহসের সংমিশ্রণে। "কড়ি ও কোমল" (১২৯৩) তাঁকে কবি-যশঃপ্রার্থিত্ব থেকে যশস্বিতায় উত্তীর্ণ করেছিল—তাঁর কণ্ঠে দেশ শুনল—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

আর একটু চকিত অস্বস্তি নিয়ে তাঁর চতুর্দশপদীর বাঁধন থেকে খসে-পড়া প্রেমের ছবি দেখল। এর মধ্যে ফাঁক আর ফাঁকি কিছু ছিল বলতেই হবে—হয়তো সে-ফাঁক কখনও একেবারে ভরাট হয় নি, কিন্তু "মানসী" হল যেন প্রকৃতই এক গুণগত উত্তরণ, চিত্রকল্প আর সৃষ্টি সেখানে রয়েছে 'মেঘদূত', 'অহল্যার প্রতি', 'বধূ' প্রভৃতির মতো কবিতায়, আর আছে প্রেমের বিবিধ ব্যঞ্জনা। তবে যে খটকার কথা বলা হয়েছে, শিল্পোৎকর্ষের স্পর্শেও তা মিলিয়ে যায় নি। কবি নিজে একবার বলেছিলেন : "আমি ভালোবাসি অনেককে—কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া করেছি, সে মানসেই আছে," আর খেদ করেছিলেন সত্য আর কল্পনাকে এক করতে পারবেন কিনা ভেবে। "আত্মপরিচয়"-এ ১৩৪৭ সালের ১লা বৈশাখে তাঁর এক ভাষণে আছে : "আবাল্যকাল

উপনিষদ আবৃত্তি করতে করতে আমার মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে মানতে অভ্যাস করেছে।" তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চারিত্র্য-নির্মাণে সহায় হলেও হয়তো তাঁর কবিসত্তাকে এই সহজলব্ধ বিশ্বাস কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ করেছিল। একই বক্তৃতায় তিনি ঋগ্বেদের এক আশ্চর্য বচন উদ্ধৃত করেছিলেন—

অসুনীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ
পুনঃ প্রাণমিহনো ধেহি ভোগম্।
জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তম্
অনুমতে মৃড়য়া নঃ স্বস্তি।

'প্রাণের নেতা, আমাকে আবার চক্ষু দিয়ো, আবার দিয়ো প্রাণ, আবার দিয়ো ভোগ, উচ্চরন্ত সূর্যকে আমি সর্বদা দেখব, আমাকে স্বস্তি দিয়ো।"

কিন্তু অত বড চক্ষুষ্মান্ হওয়া সত্ত্বেও কবিকে এদেশের নির্লিপ্তি সতত আকর্ষণ করেছে, বহির্দৃষ্টিকে হ্রস্ব করে দিয়েছে, অনুভূতির নিছক মানবীয় অন্তঃসারকে শীর্ণ করেছে। সৌভাগ্য আমাদের এই যে কবির মানসক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব চলেছে এমনভাবে যে খর্বতা সর্বদা বিলীন হয়ে থেকেছে, আর এক বিশিষ্ট মহিমারই সৃষ্টি হয়েছে, যার দেদীপ্যমান সৌন্দর্য আমাদের সাহিত্যের গৌরব।

"মানসী" যে পরিণতির সাক্ষ্য বহন করছে, তাকেই দেখা গেল "সোনার তরী"-র (রচনাকাল ১২৯৮-১৩০০) ছন্দের ছটায়, সুরের সিদ্ধিতে, ভাবের বৈভবে। মনের গহন থেকে যে মোহের স্পর্শ বিনা কাব্যশতদল উন্মীলিত হয় না, তারই নিভৃত নিলয়ের সীমাহীন অন্বেষণে কবিকে প্রবৃত্ত হতে দেখি—

ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিক্‌বধূ যেন ছলছল আঁখি অশ্রুজলে,
হোথায় কি আছে আলয় তোমার
ঊর্মিমুখর সাগরের পায়
মেঘচুম্বিত অস্তগিরির চরণতলে ?

রবীন্দ্রকাব্যের এই গূঢ়ার্থবাদিতা "ক্ষণিকা", "নৈবেদ্য", "খেয়া", "গীতাঞ্জলি" প্রভৃতি গ্রন্থে বহুরূপে দেখা দিয়েছে—তার কাব্য ও জীবনে এর যে বিশিষ্ট তাৎপর্য ও মর্যাদা আছে, তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু যখন পৃথিবীর সঙ্গে কবির

সংস্রব স্বল্পতর মনে হয় কিংবা কাব্যশিখরের কিয়দংশে বায়ু লঘুতর বলে অনুভূত হয়, তখনও বারংবার তিনি স্মরণ করেন ভূতলের কথা, বস্তু আর কালকে অস্বীকার যে করছেন না তার পরিচয় দিতে থাকেন। 'সোনার তরী' অভিহিত বহুখ্যাত কবিতাটিতে তত্ত্বের দিক অবশ্য একটা আছে, কিন্তু ছন্দের মধুরিমা আর "ভরা নদী ক্ষুরধারা খর-পরশা"র চিত্ররসকেই পর্যাপ্ত বলে মনে হয়। আর সতত-সঞ্চরমান তাঁর কাব্যজীবনে অচঞ্চল উপাদানরূপে যে ছিল জগৎ বিষয়ে আসক্তি, আর বাংলা দেশের আলো হাওয়ার বিশিষ্ট মাধুর্য ও সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির মধ্যেই যেন সন্নিবিষ্ট বিপুল অনাসক্তির সুর সম্বন্ধে আগ্রহ, তার শিল্পসিদ্ধ উদাহরণে "সোনার তরী" ভরপুর।

অনন্তপার হল রবীন্দ্র-কাব্যের মহিমা। ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যে বিস্ময়কর পরিণতি ও বৈচিত্র্য দেখা গেছে কবির রচনায়, তা থেকে দীর্ঘ জীবনব্যাপী কী বিপুল, বিরাট পরিক্রমা—কবিতায়, কাব্যনাট্যে, গানে (যা সর্বদাই মনোরম আর বিশেষ করে শেষের চল্লিশ বৎসর স্বচ্ছ অথচ গভীর কবিতাও বটে)। "চিত্রা", "কল্পনা", "নৈবেদ্য", "খেয়া", "সংকল্প ও স্বদেশ", "ক্ষণিকা", "বলাকা", "পলাতকা", "পূরবী", জীবনের শেষ দশকের আট দশটি বই—এদের বিষয় ও রূপায়ণের ঐশ্বর্য দেখে অবাক হতে হয়। তুলনার কথা উঠছে না, কিন্তু মনে পড়ে যায় শেক্স্‌পিয়র সম্বন্ধে কোল্‌রিজের কথা : 'সহস্রমনা', 'মহাসমুদ্রের মতো তাঁর চিত্ত'। রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের সকল প্রত্যাশা অবশ্য তুষ্ট নয়, কিন্তু সকল প্রত্যাশা যে শুধু তাঁরই কাছে আমরা নিবেদন করে এসেছি এতেই স্বীকৃত হচ্ছে তাঁর মাহাত্ম্য। যেখানে আমাদের অভাব পূরণ তিনি করছেন না, সে-কথা ভাবতে আর বলতে তাই কোনো বাধা নেই ; তাকে ছিদ্রান্বেষিতা যারা বলে তারা ক্ষুদ্রচেতা বই কিছু নয়।

অল্পবয়সে বন্ধুমহলে বোধ হয় অনেকেই তর্ক করেছেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে ভালো দুটোর নাম করা নিয়ে। এ-রকম বাছাই সত্যিই সম্ভব নয় ; কাব্যের বিবিধ সম্ভার এমনই গরিমায় চিহ্নিত যে কাকে ছেড়ে কাকে রাখা যায় এ-প্রশ্নের কোনো জবাব মেলে না। কিন্তু "চিত্রা" (রচনাকাল ১২৯৯-১৩০২) আর "কণিকা" আর "বলাকা"র নাম হয়তো প্রথমেই মনে এসে ভিড় করেছে, আর মনে পড়েছে 'উর্বশী' কবিতাটির কথা—

সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি,
হে বিলোল হিল্লোল উর্বশী

ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধু-মাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা—

উদ্ধৃতি দিতে গেলে তো তার অন্ত নেই, কিন্তু ভাবের গাম্ভীর্য, রূপের দাক্ষিণ্য আর ভঙ্গিতে গভীর ব্যঞ্জনা এবং সুঠাম সৌন্দর্যের সংমিশ্রণে 'উর্বশী' হল নিরুপমা। আর "চিত্রা"-য় কি শুধু আছে 'উর্বশী' ? একই মলাটের মধ্যে রয়েছে 'এবার ফিরাও মোরে' আর 'স্বর্গ হইতে বিদায়', রয়েছে সত্যকাম কথা, 'পুরাতন ভৃত্য', 'দুই বিঘা জমি', তালিকা তো বেড়েই যাবে, সম্পূর্ণ করার স্থান নেই। "সোনার তরী" আর "চিত্রা"-য় দেখা গেল জীবনদেবতা নামে এক মর্ত্যছাড়া সত্তার সন্ধানে কবির একক আকুলতা। এই নিয়ে অবশ্য অনেক আলোচনা চলেছে। ক্রমান্বয়ে এর আবির্ভাব হয়তো বা একটু কটু যদি লাগে তো আশা করি সেজন্য অপরাধবোধের প্রয়োজন নেই; কবির কাছে এত বেশী পাওয়া গেছে যে লীলাসঙ্গিনী বলে যদি নিরবয়ব কাউকে নিয়ে একটু ক্লান্তিকর ও পৌনঃপুনিক অভিসার চলে থাকে তো সেটা তাঁরই নিজস্ব ব্যাপার মনে করা উচিত এবং তাতে কারও আপত্তি পেশ করার কথা ওঠে না। কবি নিজেই ১৩১১ সনে আ‌মাদের যা বলেছিলেন, তাই এখানে স্মরণ করা যাক্ :

> "জগতের মধ্যে যাহা অনির্বচনীয়, তাহা কবির হৃদয় দ্বারে প্রত্যহ বারংবার আঘাত করিয়াছে, সেই অনির্বচনীয় যদি কবির কাব্যে বচন লাভ করিয়া থাকে; জগতের মধ্যে যাহা অপরূপ, তাহা কবির মুখের দিকে প্রত্যহ আসিয়া তাকাইয়াছে, সেই অপরূপ যদি কবির কাব্যে রূপলাভ করিয়া থাকে; যাহা সম্মুখে মূর্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা যদি কবির কাব্যে ভাবরূপে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে; যাহা অশরীর-ভাবরূপে নিরাশ্রয় হইয়া ফিরে, তাহাই যদি কবির কাব্যে মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে—তবেই কাব্য সফল হইয়াছে এবং সেই সফলকাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী।"

আশ্চর্য এই কবি যাঁর নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা যেন একটা প্রাকৃতিক ঘটনার মতোই দেখা দিয়ে চলেছিল। যখন তাঁর বয়স চৌত্রিশ হতে পঁয়ত্রিশ তখনকার লেখা "চৈতালি"-তে (১৩০২-০৩) লক্ষ্য করা যায় নূতন সৌন্দর্য—ভাবের নভোচারিতা, ভাষার উদ্বেলতা তখন যেন শান্ত সংহতির পরিচ্ছদে জীবলোকের মধ্যস্থলে প্রবেশ করেছে। এর প্রথম কবিতা—'আজি মোর

দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল'—ভাবোচ্ছ্বাসকে শুদ্ধ স্থাপত্যের দীপ্তি দিয়েছে; কয়েকটি চতুর্দশপদী দেখে মনে হয় যে তখন "কবীন্দ্র কালিদাস"-এর প্রভাব তাঁর ওপর সব চেয়ে বেশী। "প্রাচীন সাহিত্য"-এ কবি লিখেছেন:

"সেই প্রাচীন ভারতখণ্ডটুকুর নদী, গিরি, নগরীর নামগুলিই বা কি সুন্দর! অবন্তী, বিদিশা, উজ্জয়িনী, রেবা, সিপ্রা, বেত্রবতী। নামগুলির মধ্যে শোভা সম্ভ্রম শুভ্রতা আছে!···মনে হয় ঐ রেবা, সিপ্রা, নির্বিন্ধ্যা নদীর তীরে অবন্তী-বিদিশার মধ্যে প্রবেশ করিবার কোন পথ যদি থাকিত, তবে এখনকার চারিদিকের ইতর কলকাকলি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত।"

পলায়নপ্রবৃত্তি অবশ্য কবির কখনও ছিল না; "চৈতালি"-তেই রয়েছে 'বঙ্গমাতা' কবিতা: "সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করো নি।" নদীর ধারে ইঁটের পাঁজা সাজাবার জন্য মাটি কাটতে যে পশ্চিমা মজুররা এসেছিল, তাদেরই ছেলেমেয়েদের দেখে লিখছেন "কর্মভারে অবনত অতি ছোটো দিদি"-র কথা।

১৩০৭ সনে প্রকাশিত "কল্পনা"-য় কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল কবির ছত্রিশ থেকে আটত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যে; তাঁর প্রতিভা তখন প্রায় যেন মধ্যগগনে, শ্লথতা কোথাও নেই, গতিবিধি সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত। প্রাচীন ভারতের মোহময়, সৌন্দর্যখচিত জীবনাকাশের কথা সেখানে রয়েছে, আর রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধের শিল্পসুশৃংখল সমাবেশে প্রায় নিখুঁত এবং নিছক কয়েকটি কবিতা। লিখতে গিয়ে মনে আসছে প্রায় একত্রিশ বৎসর আগেকার কথা—অক্সফর্ডের ভারতীয় ছাত্রসভায় রবীন্দ্রনাথ গেছেন, সংবর্ধনা করতে গিয়ে তারুণ্যের ধৃষ্টতায় সভাপতি বললেন কবিকে—তুমি এখানে কেন, গান্ধীজী যে সংগ্রাম (১৯৩০) শুরু করেছেন, সেখানে তাঁর পাশেই তো তোমার স্থান—আর ক্লান্ত, মৃদু কণ্ঠে কবি বললেন তাঁর নিজস্ব আয়ুধের কথা, হঠাৎ একখণ্ড "চয়নিকা" চেয়ে নিয়ে পড়লেন 'দুঃসময়' কবিতাটি—

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া।
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া।
মহা-আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্‌-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,

তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

নিজেরই অন্তরতম কবিপ্রকৃতির প্রতি অপরিমেয় আস্থার সেই উদাত্ত নির্ঘোষ আজও ভুলতে পারি নি।

ভাষার কারুকার্য আর ভাবের প্রসাধন-কলা "কল্পনা"-য় এমনভাবে দেখা গেছে যাতে মহাকবির স্বাক্ষর যেন স্পষ্ট। 'দূরে বহুদূরে স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে' তিনি চলেছেন 'মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে' খুঁজতে। 'বর্ষামঙ্গল'-এ তিনি শুনিয়েছেন বহু যুগের কবিকণ্ঠের মূর্ছনা—'শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে, ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে, শতেক যুগের গীতিকা'। 'মদনভস্মের পূর্বে' এবং 'পরে' কবিতাদ্বয়ে তিনি মদনকে প্রথমে মানুষেরই মোহন সঙ্গীরূপে চিত্রিত করেছেন, আর তার ভস্মাবশেষ আত্মার বিশ্বময় পরিব্যাপ্তির বর্ণনা দিয়েছেন অপূর্ব সুন্দর আলুলায়িত ছন্দে। 'ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে, বাধাবন্ধহারা'—এই উদাত্ত শব্দৈশ্বর্য দিয়ে আরব্ধ, বহুখ্যাত 'বর্ষশেষ' কবিতা শেলির 'Ode to the West Wind' যদিও স্মরণ করিয়ে দেয়, আর স্থানে স্থানে যদিও চাঁদের কলঙ্কের মতো অতিকথন দোষে আক্রান্ত হয়ে কিঞ্চিৎ শিথিল, তবু এর ধ্বনিস্পন্দন, চিত্ররূপ আর অর্থগৌরব একে কালজয়ী করে রাখবে। আবার "কল্পনা"-তে রয়েছে 'বিদায়'-এর মতো নিথর সুন্দর কবিতা—

শুধু সুখ হতে স্মৃতি, শুধু ব্যথা হতে গীতি,
তরী হতে তীর,
খেলা হতে খেলাশ্রান্তি, বাসনা হইতে শান্তি,
নভ হতে নীড়।

আমাদের এই সংস্রমনা কবিকে ভারতবর্ষের প্রাচীন, বিশাল পটভূমি যে কত সংখ্যাহীন আহ্বানে আকর্ষণ করেছিল, তারই সবল, গম্ভীর, প্রাণবন্ত পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে ১৩০৪ থেকে ১৩০৬ সনে লেখা "কথা ও কাহিনীর" পাতায়। দেশের ঐতিহ্যের ধ্যানগম্ভীর ধারায় অবগাহন করে যেন তিনি সাজিয়ে ছিলেন "নৈবেদ্য"-এর (প্রথম প্রকাশ ১৩০৮) ডালা। পতিত ভারতবর্ষের জন্য তিনি চেয়েছিলেন 'পুনর্বার সেই প্রজ্ঞালোকিত, নির্মল নির্ভয় জ্যোতির্ময় দিন'।

তোমার নিখিলপ্লাবী আনন্দ-আলোক
হয়তো লুকায়ে আছে পূর্ব সিন্ধু তীরে।

তিনি বললেন সেই 'স্বর্গের' কথা—'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত'; আমরা শুনলাম তাঁর গদ্য রচনায় :

> "এককে বিশ্বের মধ্যে ও আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা —নানা বাধা-বিপত্তি-দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।" অখণ্ড সত্যের জন্য কবির আকুলতা প্রকাশ পেল পরিপূর্ণ

অস্তিত্বের সাধনায়—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

তাই কবির কাছে সংসার ভয় আর পাপ আর বাধার আকর নয়—'বিচিত্র ভাষায়, তোমার সংসার মোরে কাঁদায় হাসায়', কবিকে টানে মানুষ 'বেদনার ডোরে, বাসনার টানে'।

১৩০৮ সনে "নৈবেদ্য" প্রকাশিত হয়েছিল ; সেই বৎসরই কবি 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন, বোলপুরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁর "স্বাদেশিক জীবন" পূর্বের চেয়ে প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু তাঁর কবিসত্তার অখণ্ডতারই এক প্রমাণ দেখা যায় "নৈবেদ্য" প্রকাশের ঠিক এক বৎসব পূর্বে (১৩০৭) ছাপা "ক্ষণিকা"য়, যেখানে নবীনৃত্যমান গীতিকাব্যের যেন্ চূড়ান্ত ঘটেছে। 'নদীজলে-পড়া আলোর মতন ছুটে যা ঝলকে ঝলকে', তাকে কবি কথার চিকন জালে বেঁধে ফেলেছেন। 'জীবনদেবতা'-কে নিয়ে ভাবনা প্রায় কোথাও নেই, কল্পলোকের সন্ধানেও কবি ব্যস্ত নন—'যেমন আছ তেমনি এসো, আর কোরো না সাজ' বলে তিনি লোকালয়ে ঢুকে পড়েছেন, একেবারে বাংলার মাটি-ছোঁওয়া আর সংস্কৃতের বাঁধন-ছিঁড়ে-পালিয়ে যাওয়া ভাষায় তিনি লিখছেন। "কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস ওরে আমার গান, কোন্ খানে তোর স্থান ?" প্রশ্নের জবাবে যখন শোনেন :

ভাণ্ডারেতে লক্ষ্মী বধূ যেথায় আছে কাজে,
ঘরে ধায় সে ছুটি পায় সে যখন মাঝে মাঝে,

বালিশতলে বইটি চাপা, টানিয়া লয় তারে,
পাতাগুলিন ছেঁড়াখোঁড়া শিশুর অত্যাচারে—
কাজল-আঁকা সিঁদুর-মাখা চুলের-গন্ধে-ভরা
শয্যাপ্রান্তে ছিন্ন বেশে চাস কি যেতে ত্বরা ?

তখন 'বুকের পরে নিঃশ্বসিয়া স্তব্ধ রহে গান—লোভে কম্পমান'। আলো, হাসি আর মাটির সৌরভে "ক্ষণিকা" শুধু রবীন্দ্র-রচনায় কেন, বোধ হয় কবিতার সুবিস্তীর্ণ জগতেই অনন্য হয়ে রয়েছে। ভালোমন্দ, ছোটবড, সত্যমিথ্যা নিয়ে যে অবিকৃত জীবন, তারই সহজ টানে কবির 'অকারণ পুলক' জেগেছে আর তাঁর গান সংসারকে কাটিয়ে যেতে নারাজ—'আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে' ভাবতে গিয়ে স্থির করছেন :

আপাতত এই আনন্দে গর্বে বেড়াই নেচে—
কালিদাস তো নামেই আছেন, আমি আছি বেঁচে।

কেবল কালানুক্রমিক ভাবে রবীন্দ্রকাব্যের পরিচয় দিয়ে যাওয়া এই প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়, কিন্তু কালানুক্রমের দিক থেকে দেখা যায় যে "নৈবেদ্য" প্রকাশ হওয়ার পর বেশ কয়েক বৎসর ধরে কবিমানসে যেন কতকগুলি গুরুতর পরিবর্তন ঘটল। প্রমথনাথ বিশি তাঁর "রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ" গ্রন্থে মোটামুটি ১৯০২ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত সময়কে রবীন্দ্র-প্রতিভার বনবাস আখ্যা দিয়ে বলেছেন যে তখন যেন কবি স্বধর্মচ্যুত, কবিতার চেয়ে গদ্যরচনায় তখন তিনি ব্যাপৃত ছিলেন বেশী, রাজনীতি নিয়ে কিছুকাল খুব মেতেছেন, গান লিখেছেন অজস্র কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই উপজীব্য হল ভগবৎপ্রেম, যা মানুষের কবি রবীন্দ্রনাথকে যেন কক্ষভ্রষ্ট করেছিল। এই অধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আছে "শিশু" (১৩১০), "উৎসর্গ" (১৩১০), "খেয়া" (১৩১২-১৩), "গীতাঞ্জলি" (১৩১৩-১৭), "গীতিমাল্য" (১৩১৮-২১), "গীতালি" (১৩২১)। এই যুগেই তিনি বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনে সৃষ্টি এবং আস্বাদের উন্মাদনা পেয়েছিলেন, আশাভঙ্গের তীব্র অভিজ্ঞতাও তাঁর হয়েছিল। তখনই তাঁর জীবনে উপর্যুপরি এসেছিল মৃত্যুশোক আর শরীর-মনের উপর আঘাত। আবার তখনই প্রায় যেন অবসর বিনোদনের জন্য অন্যমনস্কভাবে কিছু অনুবাদের ফল হল ইংরেজী "গীতাঞ্জলি"-র প্রকাশ, বিদেশে বিপুল খ্যাতি আর নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তির আনুষঙ্গিক বহু ঘটনা। বিশি-মহাশয়ের মন্তব্যে চিন্তা করার খোরাক আছে

খুব, কিন্তু তিনি যে বনবাসের কথা বলেছেন, সে-বনের সমারোহ আর ফুলফলের বিচিত্র গম্ভীর সম্ভার তো অল্প নয়।

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কীর্তি হল এমন প্রকৃতির যে তার কোনো পরিচ্ছেদকেই বোধ হয় কক্ষচ্যুতি বলা চলে না। ক্রমান্বিত উত্তরণের মহিমা তার বৈশিষ্ট্য—মহত্ত্বের অবিচল ভিত্তির উপর তিনি অবিরাম ইমারত বানিয়ে চলেছেন, তাদের শ্রী আর ছন্দে স্তরভেদ আছে, তারতম্য আছে, কোথাও বা বাঁধুনি ভেঙেছে তাল কেটে গেছে, কিন্তু মুহূর্তের নিষ্কৃতি তাঁর সহ্য হয় নি, কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে যাওয়া-আসা না করে তাঁর স্বস্তি ছিল না—একদিকে একক অন্যদিকে বহুমুখী তাঁর মন এবং প্রতিভা। 'একাধারে তুমিই আকাশ তুমি নীড়' যিনি "নৈবেদ্য"-এ লিখেছেন, তিনিই লেখেন "উৎসর্গ"-এ 'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।' সীমার মধ্যে যিনি অসীমের সুর বাজতে শুনলেন, তিনি কিন্তু "শিশু" লিখতে গিয়ে ওয়াডস্‌ওয়র্থের মতো "intimations of immortality" না শুনে খোকার গাযের কচি কোমলতাকে খুঁজে পেলেন—

মা যবে ছিল কিশোরী মেয়ে
করুণ তার পরাণ ছেয়ে
মাধুরী রূপে মুরছি ছিল···

আর কক্ষচ্যুতি না বলে কক্ষান্তরযাত্রাই কি বলা ঠিক নয়, যখন দেখি যে তখন কবি লিখছেন "গীতাঞ্জলি" "গীতিমাল্য" এর অপূর্ব বিত্তশালী গান—"আমাদের গান ভারতবর্ষের নক্ষত্রখচিত নিশীথিনীকে ও নবোন্মেষিত অরুণরাগকে ভাষা দিতেছে; আমাদের গান ঘনবর্ষার বিশ্বব্যাপী বিরহবেদনা ও নববসন্তের বনান্তপ্রসারিত গভীর উন্মাদনার বাক্যবিস্মৃত বিহ্বলতা", এই যে গান তাকে ভাষার আর ভাবের অলঙ্কারে তো শুধু রবীন্দ্রনাথই ভূষিত করতে পেরেছেন! কক্ষচ্যুতির কথা চিন্তনীয় নয় সে-যুগের বিষয়ে যখন তিনি লিখছিলেন গদ্যে পদ্যে স্বদেশীযুগের মর্মকথা, আর এমন গান যা শুধু চোখের কোণ ভিজিয়ে আনে না, সঙ্গে সঙ্গে বুক ভরিয়ে দেয়, ভাবনাকে নাড়া দেয়, অন্তরের অন্তস্তল স্পর্শ করে। অবশ্যই একথা সত্য যে "খেয়া"-তে ছড়িয়ে রয়েছে বিদায় আর শ্রান্তি আর বিরতির সুর—যার বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায় কবির সমসাময়িক গদ্যরচনায়; কিন্তু বঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে সূত্র করে দেশসেবার আজন্মলালিত কামনা পূরণের জন্য কর্মক্ষেত্রে নেমে কথঞ্চিৎ

আশাভঙ্গ তো একেবারে অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়। হয়তো ক্ষমার্হ নয় এমন ক্ষুদ্রতা তাঁকে আঘাত করেছিল বহুজনের সমবায়ে কর্মে লিপ্ত হতে গিয়ে, কিন্তু সে-অভিজ্ঞতা তাঁর কবিসত্তার কোনো প্রকৃত হানি তো ঘটাতে পারে নি। বরঞ্চ স্বদেশে-বিদেশে জীবনের ক্রূর বাস্তবতাই হয়তো তাঁর সহজ সৌকুমার্যকে বলিষ্ঠ মানববোধে রূপায়িত করতে সহায় হল। তাই পঞ্চাশোর্ধ্বে আমাদের কবি 'বনং ব্রজেৎ' উপদেশ উপেক্ষা করে নিজেকে যেন সত্যই চরাচর ব্যাপ্ত করে দিতে পারলেন—"বলাকা" পর্ব (১৩২১-২২) থেকে আরম্ভ হল কবিপ্রতিভার নূতন জয়যাত্রা, যার অজর সাক্ষ্য রয়েছে একেবারে তার মৃত্যুপথবাহী রচনাতেও (১৩ই মে, ১৯৪১)—

রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম;
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ—
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়।
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম—
সে কখনো করে না বঞ্চনা।

১৯২৪ সনের একটি লেখায় কবি বলেছিলেন "যারা মনে করে তুফানকে এড়িয়ে পালানোই মুক্তি, তারা পারে যাবে কী করে? সেই জন্যই তো মানুষ প্রার্থনা করে, 'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতম্ গময়।' 'গময়' এই কথার মানে এই যে পথ পেরিয়ে যেতে হবে, পথ এড়িয়ে যাবার জো নেই।" ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধার আগেই পশ্চিম মহাদেশে ভ্রমণের সময় কবির মনে কেবলই আসতে থাকে ভাবীকালের সংকেত "যা মানুষকে আগে থাকতে ভিতরে ভিতরে ঘা দিচ্ছে"। 'বলাকা"-র প্রথম কয়েকটি কবিতা যুদ্ধের আগে লেখা, সেই চাঞ্চল্যের

সাক্ষ্যে ভরা। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে লেখা—'দূর হতে শুনিস্ কি মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন, ওরে উদাসীন'—প্রলয়ের করালী মূর্তিই শুধু আঁকে নি :

ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি ? মাথা কর নত।
এ আমার এ তোমার পাপ।
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান···

তবে অন্ধকারই কি চরম—

বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রু-ধারা,
এর যত মূল্য সেকি ধরার ধূলায় হবে হারা ?
স্বর্গ কি হবে না কেনা ?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ ?···

"বলাকা" পড়তে গিয়ে কেবল মনে হয় যে কবির হাতে শুধু বীণা তো নেই, রয়েছে অস্ত্র যা পর্বতবাসী যোদ্ধার বর্শাফলকের মতো সর্বব্যাপ্ত রৌদ্রে ঝলমল করে জীবনের সঙ্গে মিলে রয়েছে ।

"যাত্রা কর, যাত্রা কর, যাত্রিদল"
উঠেছে আদেশ,
বন্দরের কাল হল শেষ !"

'তুফানের মাঝখানে নূতন সমুদ্রতীর পানে,দিতে হবে পাড়ি', নবযুগের সাক্ষাৎ মেলেনি, কিন্তু ভরসার অভাব নেই—

নাই বুঝি, নাই চিনি, নাই তারে জানি,
ধর তার পাণি ,—
জ্বলিয়া উঠুক তব হৃৎকম্পনে তার দীপ্ত বাণী।

"আমার মনের বাসাছাড়া পাখী আলো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে অবিশ্রান্ত চলেছে—যা-কিছু গতিশীল, যা-কিছু উড়ে চলেছে তাদের সহযাত্রী হয়ে, অসংখ্য পাখীদের সঙ্গে সঙ্গে। এরা কোন্ দিকে চলেছে জানি না, কিন্তু আমি বসে বসে নিখিলের এই পাখার ঝাপট শুনছি।"

মনে হল এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।

আবার কবিপ্রতিভার সহস্রধার ঐশ্বর্যের কথা মনে পড়ে যখন 'চঞ্চলা'-য় তিনি বলছেন :

ওরে কবি তোরে আজ করেছে উতলা
ঝঙ্কার-মুখরা এই ভুবন মেখলা,
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।

আর শা-জাহানের সকল বৈভব বিলুপ্তিকে অগ্রাহ্য করে বলছেন যেন ঋষির মতো সূত্রাকারে :

শুধু থাক
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

গতি ও বিরতি, মুখরতা ও মৌন, সংগ্রাম ও শান্তিকে কবিতার মায়াজালে বাঁধা হয়ে গেছে। মহাকবিত্বের যদি কোনো পরীক্ষা থাকে তো "বলাকা"র সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাকে উত্তীর্ণ হয়ে বহুদূর চলে গেলেন। তারপর নিছক মহাকবিরই আস্থা নিয়ে ছন্দ আর বিষয়ে বিপ্লব ঘটিয়ে লিখলেন "পলাতকা" (১৩২৫)। আর কিছু পরে যখন লিখলেন "পূরবী" (১৩২৯-৩১), তখন তাঁর পরিণত কাব্যধারার প্রায় প্রতি ব্যঞ্জনারই সার্থক ও সুশোভন পুনরুক্তি পাঠককে হৃষ্ট করল, পুরাতন মোহ নবরূপে এসে উপস্থিত হল—'কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়, সারা হয়ে এল দিন'।

'বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিনীর বীন' লিখেছিলেন কবি। কিন্তু আমাদের পরম সৌভাগ্য যে বিশ্বজনকে মুগ্ধ করে সে বীণা আরও বহুদিন বেজেছিল। "বলাকা", "পলাতকা", "লিপিকা" গতানুগতিক ছন্দকে যে মুক্তি আনছিল, তাকেই কবি আরও বিকশিত করে তুললেন কাব্যে তাঁর গদ্য রীতিতে ; "সে সহজে চলে বলে তার গতি সর্বত্র।" "প্রতিদিনের তুচ্ছতার

মধ্যে একটি স্বচ্ছতা আছে, তার মধ্য দিয়ে অতুচ্ছ পড়ে ধরা—গদ্যের আছে সেই সহজ স্বচ্ছতা।" ছন্দোবন্ধে যিনি পারংগম, অবাক হতে হয় যে সেই কবি প্রায় পঁচাত্তর বৎসর বয়সে গদ্যছন্দকে বলছেন "যেন বনস্পতির মতো, তার পল্লবপুঞ্জের ছন্দোবিন্যাস কাটাছাঁটাসাজানো নয়, অসম তার স্তবকগুলি, তাতেই তার গাম্ভীর ও সৌন্দর্য।" ছন্দকে অবশ্য ছাড়ার কোনো প্রশ্ন উঠল না, কিন্তু পূর্বের সুদীর্ঘ কাব্যজীবনে অনুক্ত ছিল এমন বহু কাব্যবস্তু তিনি গদ্যছন্দে অবতারণা করে প্রতিভার নূতন শৃঙ্গকে আমাদের দৃষ্টিগোচর করলেন।

পরিশেষ" (১৩৩৭-৩৯) থেকে "শেষ লেখা" (১৩৪৮) পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যের যে অধ্যায়, তা শুধু সংযোজন নয়—

আমি পৃথিবীর কবি যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি—

এ-কথা যিনি অশীতিবর্ষ বয়সে দীপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, তাঁরই কাছ থেকে জায়মান নূতন জীবন তখন বুঝি নবসৃষ্টির শুভক্ষণে শিল্পের বরাভয় চেয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায় নি। আপাতবিরূপতাও তাঁকে অনুভূতির অপরিচিত আস্বাদ ও রূপায়ণ থেকে বিরত করে নি। ১৩৪০ সনে "সাহিত্যের মাত্রা" প্রবন্ধে লিখেছেন:

"আজ দ্বাররুদ্ধ য়ুরোপের দুর্গমতা অনুভব করছি আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যে। তার কঠোরতা আমার কাছে অনুদার বলে ঠেকে; বিদ্রূপপরায়ণ বিশ্বাসহীনতার কঠিন জমিতে তার উৎপত্তি; তার মধ্যে এমন উদ্বৃত্ত দেখা যাচ্ছে না, ঘরের বাইরে যার অকৃপণ আহ্বান। এ-সাহিত্য বিশ্ব থেকে আপন হৃদয় প্রত্যাহরণ করে নিয়েছে।"

কিন্তু শুধু যে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছিলেন তা নয়, মহৎ কবি বলেই এলিয়টের রচনা নিজে অনুবাদ করেছিলেন। আবার রাশিয়াতে গিয়ে (১৯৩০ সাল) পূর্বার্জিত সুদৃঢ় সংস্কারকে পরিহার করতে লেশমাত্র সংকোচ তাঁর ঘটে নি। একদা তাঁর বিশ্বাস ছিল যে সভ্যতায় অবসরের স্থান দরকার আর সেজন্য দুঃখের হলেও উচ্চ-নীচ শ্রেণীভেদেরও প্রয়োজন। কিন্তু সোভিয়েত দেশে গিয়ে সে ধারণা একেবারে বদলে গেল। "পৃথিবীর সব চেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান" সেখানে তিনি দেখলেন, বললেন যে না-দেখলে তাঁর আজীবন তীর্থপরিক্রমা অসমাপ্ত থাকত, লিখলেন বন্ধুজনকে: "বারবার মনে হয়েছে আর কোথাও নয়, রাশিয়ায় এসে তোমাদের সব দেখে যাওয়া উচিত।" সব চেয়ে তাঁর চোখে ভালো লেগেছিল "ধন-গরিমার



ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব।" আর রাশিয়ার পর আমেরিকায় গিয়ে কটু লাগল—"ঐশ্বর্যের মধ্যে যখন পৌছলুম একটু ভালো লাগলো না।" রাশিয়ার বিপ্লবকে দেখে বললেন; "এ-বিপ্লব মানুষের সব চেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব—এ-বিপ্লব অনেক দিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান। নব্য রাশিয়া মানব সভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড়ো মৃত্যুশেল তোলবার সাধনা করছে যেটাকে বলে লোভ।" সত্তর বৎসর বয়সে, খ্যাতি আর স্তুতির পসরা বহু পূর্বে পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, এমন আবিষ্কার যিনি করতে পারেন, তাঁর অনির্বাণ মানববোধকে বারবার প্রণতি জানাতে হয়।

১৩০০ সনে 'এবার ফিরাও মোরে' বলে কবি বৃহৎ জগতের সঙ্গে একাত্ম হতে চেয়েছিলেন: "এ দৈন্য মাঝারে কবি, একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।" ১৩৩৮ সনে ইংরেজ শাসনের ক্লৈব্য পরিহারের জন্য যখন ভারতবর্ষ ব্যাকুল তখন দেখি তাঁর ঋষিনেত্র থেকে বহ্নি ঠিকরে পড়ছে—

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

বজ্রাঘাত মাথায় পেতে নিয়ে তখন তাঁর মুখ দিয়ে (১৩৩৯) দেশ যেন বলেছিল—

এই মাত্র? আর কিছু নয়?
ভেঙে গেল ভয়।
যখন উদ্যত ছিল তোমার অশনি
তোমারে আমার চেয়ে বড়ো বলে নিয়েছিনু গণি।

"পুনশ্চ"-এ (১৩৩৯) দেখা দিল 'ছেলেটা' যে বেড়ে উঠেছে 'ভাঙা বেড়ার ধারে আগাছা'-র মতো, যার 'নিজের জগতের কবি' হতে না পেরে কবির খেদ; দেখা দিল "অন্তঃপুরের মেয়ে, চিনবে না আমাকে—তোমার শেষের গল্পের বইটি পড়েছি, শরৎবাবু", আর অমলি "যাকে দেবতাই নিয়েছে"—"আখোলা চিঠি খুলে দেখি, তাতে লেখা—তোমাকে দেখতে বড্ডো ইচ্ছে করছে—আর কিছুই নেই।" আশ্চর্য সহজ অথচ গভীর এ সব কবিতা। "পত্রপুট"-এ (১৩৪২-৪৩) "আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো পৃথিবী" বলে আরব্ধ বিখ্যাত কবিতায় চেয়েছিলেন "তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে"। মনে হয় একটি তিলক কেন, মাটির চন্দনে তাঁর বিস্তৃত কপালকে চর্চিত করেও বসুমতী তুষ্ট হতে পারে নি।

১৩৪৩ সনে লেখা "শ্যামলী"-তে রয়েছে 'অমৃত'-এর মতো কবিতা যেখানে ভালোবাসার অধিকারে উত্তীর্ণ হল যে ছেলে সে এমন যে

লোকে বললে, ওর বুদ্ধির কাঁচা ফলে
ঠোকর দিয়েছে
রাশিয়ার লক্ষ্মী-খেদানো বাদুড়টা।

আর 'হঠাৎ-দেখা'-য় রয়েছে

তার পর বললেম,
'রাতের সব তারাই আছে
দিনের আলোর গভীরে।'
খটকা লাগল, কী জানি বানিয়ে বললেম নাকি।

ছেলেবেলা থেকে কবিকল্পনার সঙ্গে যাঁর 'মালাবদল' হয়ে গিয়েছিল, তাঁরই নিরন্তর সত্যসন্ধিৎসা এক প্রোজ্জ্বল ঘটনা। মনে পড়ে যায় বহুদিন পূর্বের এক চিঠিতে লিখেছেন: "জীবনে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায় কিন্তু কবিতায় কখনও মিথ্যা কথা বলিনে—সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয় স্থান।" (ছিন্নপত্র, ৮ই মে, ১৮৯৩)।

জীবনের শেষ বর্ষে লেখা 'ঐকতান' (২১শে জানুয়ারী ১৯৪১) কবিতায় কবি বলেছিলেন: "বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।" কিন্তু এটা খেদের, বিলাপের সুর নয়—মর্তের অমরাবতীতে নিমন্ত্রিত হয়ে কবি দেখেছেন বারবার যে শান্ত, নিরাসক্ত মন নিয়ে না গেলে দ্বার মুক্ত হয় না, "বুভুক্ষুর লালসাকে করে সে বঞ্চিত"। কিন্তু সত্যকথনে পরাঙ্মুখ হতে তিনি পারেন নি—

আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

তাই তিনি বলতে ইতস্তত করেন নি—

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।

এক মাস পরে লেখা 'ওরা কাজ করে' কবিতায় ধ্বনিত হয়ে রয়েছে তাদের কথা যারা—

চিরকাল
টানে দাঁড, ধরে থাকে হাল ;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকাধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।

কী দশদিক-প্রসারিত মন এই কবিব, যে-মনের প্রান্তে আর মুক্তাঙ্গনে সর্ববিশ্বের কর্ম আর স্বপ্ন তার গুঞ্জবন নিয়ে বারবাব এসে উপস্থিত হয়। "রোগশয্যায়" (১৩৪৭) গ্রন্থের সূচনায় অমূলক সংকোচ নিয়ে তিনি বলেছিলেন :

মোর কাব্যকলা হয়েছে কুণ্ঠিত
তাপতপ্ত দিনান্তের অবসাদে—
কী জানি শৈথিল্য যদি ঘটে তার পদক্ষেপ তালে।

শৈথিল্য দূরে থাক, সিদ্ধির শিখরেই জীবনেব শেষ পর্ব পর্যন্ত তাঁর অধিষ্ঠান।

ব্যাপ্তি আর বিস্তারের এই মহীরুহ কীর্তি শিল্পেব ইতিহাসে অতুলন বললে অত্যুক্তি হয না। রবীন্দ্রনাথেব বিচরণ তো শুধু কাব্যের ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু যদি তিনি কবিতা ছাড়া আর কিছুই না লিখে যেতেন, তবুও সে-কৃতিত্বের পরিমাণ তো সহজ হ'ত না। সংক্ষেপেও সব কথা বলতে গেলে গোটা গ্রন্থ ভরিয়েও তুষ্টি নেই—তাই শুধু ভাবতে হয তাঁব কতকগুলি বিশিষ্ট ধারার কবিতার কথা। ছড়া আর গান (যা প্রায়ই হযেছে নক্ষত্রচুম্বী কবিতা), 'হিং টিং ছট্', 'বঙ্গবীর', 'জুতা আবিষ্কাব' ইত্যাদি অসংখ্য ব্যঙ্গ কাব্য, স্বদেশ-বিষয়ক অপূর্ব কবিতাবলী, বিশ্বমানব সম্পর্কে পরম আত্মীয়তাবোধেব যে বহু শক্তিপুঞ্জ কবিতা তিনি লিখেছিলেন 'আফ্রিকা'-ব মতো—

এল ওরা লোহার হাতকড়া নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমাব নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ-ধবার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যেব চেযে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপনার নির্লজ্জ অমানুষতা।

তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হল তোমার ধূলি তোমার রক্তেতে অশ্রুতে মিশে,
দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমায় অপমানিত ইতিহাসে……

'যুগান্তের কবি'-কে তিনি ডেকেছিলেন :

এসো—'

আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে,
বলো 'ক্ষমা করো'—
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।

মানুষের চিরন্তন মহিমা এমন সৌকর্য নিয়ে আর কোনও কবির কর্মে কি দেখা দিয়েছে আধুনিক কালে? আর কবিতার ক্ষেত্র ভিন্ন শিল্পের অপরাপর রাজ্যে তাঁর দৃপ্ত অথচ প্রসন্ন পদক্ষেপের কথা ভাবলে তো মনে হয় তিনি যেন অখণ্ড মণ্ডলাকার, সর্বচরাচরে তাঁর ব্যাপ্তি, এমন বিশ্বরূপদর্শনের শক্তি কোথায় আমাদের মিলবে?

বারবার ব্যাপ্তির কথা বলতে গিয়ে একটু থমকে ভাবতে হচ্ছে যে কাব্য-রাজ্যে পরিসর' তো মহত্তম বস্তু নয়, মানসিক ঐশ্বর্যের সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতির তীব্রতা ও গভীরতা বিনা তো কাব্যের কৈলাসে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। মহাকাশে সংখ্যাহীন গ্রহ-নক্ষত্র বিলীন হয়ে গেলেও প্রকৃতির হানি হয় না, কিন্তু পূর্বের দিকে তাকিয়ে ঘাসের যে প্রতিটি ডগা রোজ হেসে ওঠে সেখানে প্রকৃতির অসীম হৃদয়ের সকল যত্ন এবং কৌশল অবস্থিত না থাকলে তো চলে না। এই তীব্রতা আর গভীরতার দিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথকে একেবারে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা, মুষ্টিমেয় কয়েকজন কবির সারিতে না বসিয়ে তাদেরই কাছে, কিন্তু একটু নামিয়ে, জায়গা দেওয়াই হয়তো সমীচীন। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে শেক্‌স্‌পিয়রের মতো যিনি প্রায় প্রশ্নাতীত, তাঁর লেখাতেও গলদের অভাব নেই—এ বিষয়ে ড্রাইডন্, ভল্‌তেয়র, জন্‌সন্-প্রমুখ গুণীর বক্তব্য স্মরণীয়। আর যদি রবীন্দ্রনাথ যে-যুগে যে-দেশে যে-পরিবেশে জন্মেছিলেন

সে-কথা ভাবা যায় তো নিশ্চয়ই মনে হবে যে তদনুপাতে তাঁর কবিতার তীব্রতা ও গভীরতা সত্যই বিস্ময়কর। "জীবনস্মৃতি"-তে (পৃঃ ১৪৩-৪৪) কবি লিখেছিলেন : "যেখানে অসামঞ্জস্য অতিরিক্ত অধিক অথবা সামঞ্জস্য যেখানে সম্পূর্ণ, সেখানে কাব্যলেখা বোধহয় চলে না। যেখানে অসামঞ্জস্যের বেদনাই প্রবলভাবে সামঞ্জস্যকে পাইতে ও প্রকাশ করিতে চাহিতেছে, সেইখানেই কবিতা বাঁশির অবরোধের ভিতর হইতে নিঃশ্বাসের মতো রাগিণীতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।" উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার পুনর্জন্ম (renaissance) বিষয়ে বাক্‌বিস্তার যতই হোক না কেন, এ-কথা অকাট্য যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবজ শোষণ ও অনিবার্য অপশাসনের কালে যে নববাবু-সমাজের ভুঁইফোড় আবির্ভাব ঘটেছিল, তার পারিপার্শ্বিকে মহৎ শিল্পের অনুকূল আবহাওয়া ছিল না। হয় "অসামঞ্জস্য অতিরিক্ত অধিক" ছিল, নয় উপনিষদ্ আর ভারত-ইতিহাসের কল্যাণে "সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ" রূপ নেবার চেষ্টা করছিল, আর সেই দোটানায় অবিরাম ভুগছিলেন রবীন্দ্রনাথের মতো কবি—'দেবতার দীপ হস্তে' এসেছিলেন বলে তৎকালের বন্ধনশৃঙ্খল তাঁকে নমস্কার অবশ্য করেছিল, কিন্তু নিস্তার দেয়নি।

ইয়োরোপে মধ্যযুগের শেষভাগে মহাকবি দান্তে-র অভ্যুদয় ঘটেছিল। তাঁর কাব্যগরিমা সম্বন্ধে আমাদের নির্ভর করতে হয় সজ্জনশ্রুতির উপর, কিন্তু একথা তো অজানা নয় যে খ্রীষ্টধর্মে ও চিন্তায় পাপপুণ্য নিয়ে যে মৌলিক দ্বন্দ্ব আছে, তা আমাদের মনে সত্য নয়, আর তাই এদেশে, আর বিশেষত এ যুগে, দান্তের অপেক্ষায় থাকা হাস্যকর বই কি। বহুঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ইয়োরোপে মৌলিক সামাজিক শ্রেণী-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া মানসের অসম বিকাশ যখন ঘটছে, তখন আবির্ভূত হলেন শেক্‌স্‌পিয়র, আর সেই বুর্জোয়া মানসেরই শতদলস্ফুরণের শিল্পসাক্ষ্য বইলেন তাঁর পরবর্তী কবিকুল। আমাদের দেশের জীবনে যে স্থবির পঙ্গুতা এসে ভারতবর্ষের মজ্জাগত পূর্বগরিমাকেও মালিন্যে আবৃত করে দিয়েছিল, তা সচল সমাজের সাবলীল সঞ্চরণে প্রচণ্ড প্রতিবন্ধক হয়েছিল, এখনও তার পূর্ণ পরাজয় ঘটেনি। আমাদের এই পরিস্থিতিতে একদিকে দান্তে এবং অপরদিকে শেক্‌স্‌পিয়রের প্রত্যাশা কখনই সঙ্গত হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে গিয়ে যে এই স্তরের মহাকবিকে স্মরণ করতে হয়, এটাই তাঁর অবিসংবাদী মহত্ত্বের এক প্রমাণ, কিন্তু তাঁদের মহিমা রবীন্দ্রপ্রতিভায় আধৃত হয়েছে কল্পনা করা অসমীচীন।

"আত্মপরিচয়" (প্রথম প্রকাশ, ১৩৫০) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের (১৩১৮ সনে) একটি বক্তৃতায় আছে: "আমি জানি, আমার রচনার মধ্যে সেই

নিরতিশয় প্রাচুর্য আছে যাহা বহু পরিমাণে ব্যর্থতা বহন করে।...যিনি অমরত্ব-রথের রথী তিনি সোনার মুকুট হীরার কণ্ঠি মানিকের অঙ্গদ ধারণ করেন, তিনি বস্তা মাথায় করিয়া লন না। কিন্তু আমি কারুকরের মতো সংহত অথচ মূল্যবান গহনা গড়িয়া দিতে পারি নাই। আমি, যখন যাহা জুটিয়াছে তাহা লইয়া, কেবল মোট বাঁধিয়া দিয়াছি, তাহার দামের চেয়ে তাহার ভার বেশী। অপব্যয় বলিয়া যেমন একটা ব্যাপার আছে, অপসঞ্চয়ও তেমনি একটি উৎপাত। সাহিত্যে এই অপরাধ আমার ঘটিয়াছে।...কিন্তু সেই লোকসানের আশঙ্কা লইয়া ক্ষোভ করিতে চাই না।...অন্তত প্রাচুর্যের দ্বারাতেও বর্তমান কালের হৃদয়টিকে আমার কবিত্বচেষ্টা কিছু পরিমাণে জুড়িয়া বসিয়াছে এবং আমার পাঠকদের হৃদয়ের তরফ হইতে আজ যাহা পাইলাম তাহা যে অনেকটা পরিমাণে সেই দানের প্রতিদান তাহাতে সন্দেহ নাই।"

এই কথাটিতে ভাষণসুলভ আতিশয্য কিঞ্চিৎ আছে, কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় কবি নিজে তাঁর অতিকথন সম্বন্ধে একটুও অচেতন ছিলেন না। আমরা শুধু বলব যে তাঁর সার্থক সৃষ্টি বহুল পরিমাণে পেয়ে আমরা পরম পরিতুষ্টির সন্ধান পেয়েছি, কোথাও তাঁকে ব্যর্থ বলতে আমাদের মন ভারী হয়ে ওঠে। কিন্তু ব্যর্থতা কিছু যদি থাকে তো থাকুক, চাঁদের কলঙ্কের মতোই তা গুণসন্নিপাতে ডুবে থাকবে।

সমালোচকরূপেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন লোকোত্তর প্রতিভাবান, তাই "জীবনস্মৃতি" থেকে বহু উদ্ধৃতি দেওয়া যায় কাব্যসমস্যা তাঁকে কেমন ভাবিয়ে তুলেছিল সে-বিষয়ে। তিনি বলছেন (পৃঃ ১২৩): "ইংরেজী

সাহিত্য হইতে আমরা যে-পরিমাণে মাদক পাইয়াছি, সে-পরিমাণে খাদ্য পাই নাই।...আমাদের সমাজ, আমাদের ছোটো ছোটো কর্মক্ষেত্র এমন সকল নিতান্ত একঘেয়ে বেড়ার মধ্যে ঘেরা যে সেখানে হৃদয়ের ঝড়ঝাপট প্রবেশ করিতেই পায় না, সমস্তই যতদূর সম্ভব ঠাণ্ডা এবং চুপচাপ; এইজন্যই ইংরেজী সাহিত্যে হৃদয়াবেগের এই বেগ ও রুদ্রতা আমাদিগকে এমন একটি প্রাণের আঘাত দিয়াছিল যাহা আমাদের হৃদয় স্বভাবতই প্রার্থনা করে। সাহিত্যকলার সৌন্দর্য আমাদিগকে যে-সুখ

দেয় ইহা সে-সুখ নহে, ইহা অত্যন্ত স্থিরত্বের মধ্যে খুব-একটা আন্দোলন আনিবারই সুখ, তাহাতে যদি তলার সমস্ত পাঁক উঠিয়া পড়ে তবে সে-ও স্বীকার।"

তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে "য়ুরোপীয় সমাজের সেই হোলিখেলার (Renaissance-এর ফল) মাতামাতির সুর আমাদের এই অত্যন্ত শিষ্টসমাজে প্রবেশ করিয়া" হঠাৎ যেন "চমক" লাগিয়ে দিয়েছিল তাই ইয়োরোপে যা ছিল স্বাভাবিক, তা এখানে "জবরদস্তি" আর "অতিশয়োক্তির" চেহারায় দেখা দিল। তিনি আরও বলেছেন, যে "হৃদয়াবেগ সাহিত্যের একটা উপকরণমাত্র, তাহা যে লক্ষ্য নহে—সাহিত্যের লক্ষ্যই পরিপূর্ণতার সৌন্দর্য, সুতরাং সংযম ও সরলতা, এ কথাটা এখনও ইংরেজী সাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হয় নাই", আর "শিশুকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কেবলমাত্র এই ইংরেজী সাহিত্যেই আমাদের মন গড়িয়া উঠিতেছে" বলে বিপদ ঘটল। আরও বলেছেন চূড়ান্ত কথা :

"যে-সব সমাজে ঐশ্বর্যশালী স্বাধীন জীবনের উৎসব, সেখানে সানাই বাজিয়া উঠিয়াছে, সেখানে আনাগোনা কলরবের অন্ত নাই; আমরা বাহির প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া লুব্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি মাত্র—সাজ করিয়া আসিয়া যোগ দিতে পারিলাম কই!" (পৃঃ ১৮৬-৮৭)

রবীন্দ্রনাথকে ধন্যবাদ, তাঁরই কৃপায় আমরা ধনীর দুয়ারে কাঙালিনী মেয়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকি নি। যে-সাজ করে আমরা আজ আসতে পারি তা তাঁরই দেওয়া। কনিষ্ঠ কবি সুকান্তের ভাষায়—

এখনো প্রাণের স্তরে স্তরে,
তোমার দানের মাটি সোনার ফসল তুলে ধরে।

মানুষের কবি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাই মানুষকে ফেলে রেখে দূরে গিয়ে তাঁর স্বস্তি হত না—হিমালয় পাহাড়ের ওপর তাই সদর স্ট্রীটের "তুচ্ছ বাড়িটার জিত" হয়েছিল; নদীকে তাই তিনি এত ভালোবাসতেন, যে-নদী উথলে এসে পড়ে মানুষের দরজায়, যার ওপর একখণ্ড পাল তুলে যাওয়া নৌকো না দেখতে পেলে তাঁর অস্বস্তি। তাই গানে তাঁর অন্তরের কথা এমন মধুর হয়ে উঠেছে—জীবনের প্রতিদিনের বেষ্টনকে অতিক্রম করেও যা একান্তভাবে মানবহৃদয়ের আত্মীয়।

এ দুর্ভাগ্য দেশে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব যে কত বড় আশীর্বাদ তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আমাদের সাহিত্যে তিনিই আনলেন রূপ, আনলেন

শালীনতা—ভিন্ন প্রকৃতির হলেও মনে পড়ে যায় ইংরেজ কবিগুরু চসর্-এর কথা। তাঁর বিস্তৃত জীবনের অবিরাম সাধনা ও সিদ্ধির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় জার্মান মহারথী গ্যেটের কীর্তিকে। বাংলা সাহিত্যে তিনি আনলেন অজস্র বিন্যাস, আনলেন মার্জিত রুচি আর শিল্পবোধের মানদণ্ড, আনলেন রোমান্টিকের আকুলতা আর অভীপ্সা, সঙ্গে সঙ্গে বলিষ্ঠ সততা আর একান্ত সৌন্দর্যচেতনা, আর নিজের রচনাতে মধ্যে মধ্যে স্খলন ঘটলেও শেখালেন "হৃদয়ের মিতব্যয়িতা"-র কথা। তাছাড়া বিষ্ণু দে-র ভাষায়, তিনি শুধু শ্রেষ্ঠ নন, তিনিই আমাদের সাহিত্যিক পেশার দায়িত্বের প্রথম ও চরম উদাহরণ—যে-দায়িত্ব সযত্নে ও সশ্রমে পালন না করলে মহৎ সৃষ্টিকে কলম বা তুলির পাশে বন্দী করা যায় না। মাঝে মাঝে মনে না হয়ে পারে না যে যুধিষ্ঠিরের রথের মতো তাঁর বিচরণ পৃথিবী থেকে একটু যেন উর্ধ্বে হচ্ছে, অন্তত বাংলার ভিজে মাটি তাঁকে ধরে রাখতে পারছে না। তাঁরই ভাষায় কিন্তু তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলতে মন যায়: "একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়"।

বারবার বলতে হয় যে রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের প্রত্যাশার অন্ত নেই বলেই যেখানে যে কবির কোনো বিশিষ্ট উৎকর্ষের দিব্য জ্যোতি দেখি, তখনই মন সন্ধান করে রবীন্দ্রকাব্যে কোনো অনুরূপ সিদ্ধির আশায়। কিন্তু মহামহীরুহের মহিমারও তো সীমা আছে। অ্যালন্ ল্যুইস্ নামে যে তরুণ ইংরেজ কবি গত যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন, তিনি ভারতবর্ষে এসে নিজেকে প্রশ্ন করেছিলেন: "সূর্য প্রতিদিন যা শেখাচ্ছে, সেই ঘামঝরা, ডাকছাড়া বাস্তবতা এদেশে কবিতায় আনা এত শক্ত কেন?" তাঁরই জবাব ছিল—"এদেশে পরিণতি অর্জন করা বড় কঠিন; মানুষের পরিবেশ দেখে ক্রুদ্ধ হওয়ার মতো এত বস্তু রয়েছে, সমাজের চেহারায় দিশাহারা হওয়ার মতো এত ব্যাপার রয়েছে, আর বিশ্বজনীন যে ক্ষেত্র এখানে ছড়িয়ে রয়েছে সেখানে তো অহংকারকে লুপ্ত না করে উপায় নেই! কোথায় যেন সবকিছু অভিশাপগ্রস্ত হয়ে রয়েছে, নইলে সাহিত্যিকের পক্ষে কত অজস্র দৌলত যে এদেশে ছড়ানো!" ভাবতে ভালো লাগে যে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপনিষদের ধারায় লালিত-বর্ধিত মন নিয়ে এইরকম প্রশ্নই নিজেকে বহুবার করেছেন—হয়তো ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে সূর্যের প্রতি চেয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, আর যে উত্তরের সন্ধানে প্রবৃত্ত না হয়ে তাঁর উপায় ছিল না, তারই আভাস পেয়েছিলেন তাঁর পরিণত বয়সের ছবিতে—একেবারে শিল্পের এক স্বতন্ত্র মাধ্যমে বোধহয় তাঁর কবিমন স্বস্তি পেয়েছিল।

ব্যাপ্তির উত্তরণ পর্বের এমন বিপুল ঐশ্বর্য জগতের আর কোনো কবিতে মেলে না, গ্যেটে বা হ্যুগোতেও না। তাঁর ব্যক্তিত্বেরও তুলনা দেখি না—নিঃসঙ্গ কবির অবিরাম অভিযান ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা। একত্র সন্নিবিষ্ট হয়েছিল অসামান্য লিখনশক্তি, চারিত্র্যের অপূর্ব সাধনা, আর দীর্ঘ আয়ু—সমসাময়িক জীবনের হলাহল পান করে তিনি বলতে পেরেছিলেন :

তবু শূন্য শূন্য নয়
ব্যথাময়
অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন।
একা একা সে অগ্নিতে
দীপ্তগীতে
সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন।

জীবনের যে সমগ্রতা তাঁর ক্ষেত্রে দেখা যায়—"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ"--তা প্রকৃতই অতুলন। "সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়"—একথা তিনি বলেছিলেন খণ্ডিত সমাজকে দেখে; পরবশ ক্ষুদ্রাশয় গৌণ-জীবনের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম। আমাদের দেশের ও যুগের পরিবেশে তাঁকে নিজেরই ব্যক্তিস্বরূপে আশ্রয় নিতে হয়েছিল; তাতে হয়তো কোথাও কোনো ক্ষতি হয়েছে, হয়তো একেবারে স্পষ্ট, অকাট্য একটা ধারা তিনি খাড়া করেন নি, করতে চানও নি। কিন্তু তাঁর মন বেঁচেছিল বয়সের অভ্যাসিকতা থেকে, সেখানকার বাতায়ন ছিল চির-উন্মুক্ত, সচেতনে নববস্তুকে গ্রহণ ও আত্মস্থ করার শক্তি তাঁর ছিল। তাঁর কথা ভেবে তাই আজকের কবি বলেন :

কোথায় সে প্রতিদিন রূপের রচনা,
সেই নিরন্তর সুন্দরের ধ্যানের উন্মেষ,
অনাত্মীকরণে সদা নিজেকে সে উত্তরণ,

আর সেই "উদ্ভাসিত সুদীর্ঘ জীবন" স্মরণ করে আহ্বান জানান :

তোমার আকাশ দাও, কবি দাও
দীর্ঘ আশি বছরের,
আমাদের ক্ষীয়মান মানসে ছড়াও

সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আশি বছরের আলো,
বহুধা কীর্তিতে শতশিল্পকর্মে উন্মুক্ত উধাও
তোমার কীর্তিতে আর তোমাতে যা দিকে দিকে
একাগ্র মহৎ।.

("তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ"—বিষ্ণু দে)

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প ও প্রতীক

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ এক ॥

অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে সংহত হবার প্রয়োজনে চিত্রকল্পের জন্ম। যদিও অভিজ্ঞতা স্মৃতিকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে, তথাপি স্মৃতিনিপুণ গৃহিণীর মতোই, অভিজ্ঞতার আকাঁড়া সঞ্চয়কে যথা তথা মেলে ধরে না। অথচ তার বিপুল ভাণ্ডারে কী জমা হল, কী হল না সে সংবাদ মনের সচেতন কর্মশালা শুধু প্রয়োজনের সময়েই জানে। আবার পরিবজনের ভিতর দিয়ে স্মৃতি অভিজ্ঞতাকে ব্যক্তি-মানসের সেই স্বতন্ত্র আধারে ধারণ করে—যে স্বাতন্ত্র্যে রাম শ্যামের থেকে দূরে, শেলি কীট্স থেকে এবং রবান্দ্রনাথ শেলি-কীট্স থেকে। কাজেই একজন কবির স্মৃতিলোক বা তাঁর অভিজ্ঞতার জগৎকেই আমরা তাঁর শিল্পকর্মে অনুভব করে থাকি। অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতির বিশিষ্টতায় এবং বিশিষ্ট আচরণে কবি বিশিষ্ট হয়ে ওঠেন। স্মৃতিধৃত অভিজ্ঞতা মূল্যবোধের প্রেরণায় প্রকাশের জন্য অনিবায আবেগে কল্পনার ন্যায়ে সৃষ্টি করে চিত্রকল্পের পুষ্পরাশি। তাই কবির প্রতিটি চিত্রকল্প কবির অভিজ্ঞতার নিদর্শন। জীবন এবং জগৎকে তিনি যে ভালোবেসেছেন এবং অনুভব করেছেন তার সাক্ষ্য তাঁর ব্যবহৃত চিত্রকল্পরাশিতে। তাঁর জীবনকে ভালোবাসার এবং অনুভবের অনন্য মূল্যকে উপলব্ধি করার জন্যই তাঁর ব্যবহৃত চিত্রকল্পের, রূপকের বা প্রতীকের আলোচনার আবশ্যিকতা। ফলতঃ চিত্রকল্পের আলোচনা ব্যতীত একজন কবির মনোলোকের সমগ্র সৃজনী ক্রিয়াটির তাৎপর্যকে হৃদয়ঙ্গম করার অন্য কোনো পন্থা নেই। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বড কবিদের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার আকার এবং প্রকার, বিপুল এবং জটিল বলেই তার প্রকাশের বহুধা বিস্তারের মধ্যে উক্ত 'মনোলোকের সমগ্র সৃজনী ক্রিয়ার তাৎপর্য' সন্ধান কষ্টসাধ্য। তথাপি এ পথের কষ্টভারও পদে পদে কবি-কীর্তির প্রসাদেই লাঘব হয় বলে, পথের প্রলোভন কখনও হ্রস্ব নয়।

স্মৃতির কাজই হচ্ছে অনুষঙ্গ-সৃজন। অনুষঙ্গ-সৃজন ব্যতিরেকে চিত্রকল্প গঠিত হয় না, কবির বিক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতাগুলি একটি প্রসঙ্গে সূত্র-সম্বদ্ধ হয় না। অনুপ্রাণিত কাব্যসৃষ্টি বলতে আমরা তাকেই বুঝি যেখানে স্মৃতির অনুষঙ্গ-সৃজনী ক্ষমতা অব্যাহত। আবেগ এবং মননের সুসমঞ্জস সমন্বয়ের অনুকূল পরিবেশে অনুষঙ্গ-সৃজন ক্রিয়া কতকটা স্বাধীন এবং স্বচ্ছন্দ। কিন্তু এটাও তর্কাতীত যে শ্রেষ্ঠ কবিতা রচনার প্রয়োজনীয় পূর্বাবস্থা তখনই গঠিত হয়, যখন মন অব্যর্থ শৃংখলায় শিল্পলক্ষ্য হয়ে নিজের সমগ্রতাকে বেঁধে ফেলতে পারে ; অথচ মনের অনুষঙ্গ-সৃজনী-ক্ষমতার স্বাচ্ছন্দ্য থাকে অব্যাহত। বলা যেতে পারে এই দ্বৈতে শ্রেষ্ঠ শিল্পের জন্ম। মনের উপরের স্তর যখন একটা নির্দিষ্ট শিল্পলক্ষ্যের বশীভূত, মনের অবচেতনাংশ তখন নেপথ্য-ক্রিয়ায় ব্যস্ত অনুষঙ্গের পরম্পরা সৃজনের জন্য। মনের চেতনেতর অংশে বিধৃত থাকে লেখকের অভিজ্ঞতার বিস্তৃত ভাণ্ডার। যে কোনো বড় কবির চিত্রকল্পের আলোচনায় এই সূত্রগুলি স্মরণে রাখা কর্তব্য। কেননা, তাহলে বোঝা যায় যে মাত্র সদৃশ উদাহরণ সরবরাহ করা চিত্রকল্পের কাজ নয়। এবং সাদৃশ্যে তাদের সার্থকতাও নয়। যেহেতু এটা সমগ্র মানসের সৃজনী ক্রিয়ার অনিবার্য প্রকাশ, সেইহেতু এর বিচারও হবে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে। স্মৃতি, আবেগ এবং যুক্তি-ন্যায়ের ত্রি-ধাতুতে কল্পনা গঠিত ; তাই, মনের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই দুই শক্তির যোগাযোগ এবং সহযোগ ঘটে কল্পনার সাহায্যে। সুতরাং চিত্রকল্প এবং প্রতীকে কল্পনার বস্তুরূপায়ণ। জীবন সংক্রান্ত মনোভাবের পরিবর্তনে এই রূপায়ণেরও পরিবর্তন ধ্রুব।

সে-কারণে প্রাচীন মহাকাব্যের কবিরা যখন বস্তুসাদৃশ্য বিবৃত করতে গিয়ে উপমামূলক বাণীচিত্র রচনা করেছেন তখন তাঁদের ব্যবহৃত উপমারাশিতে আভাসিত হয়েছে জীবনের বহুধা-বৈচিত্র্য। সিংহতুল্য গতি, নগেন্দ্রতুল্য বিক্রম, কাশ্মিরী তুরঙ্গমীর ন্যায় সুন্দর—প্রভৃতি উপমা যখন প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল তখন এগুলি জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে কবির বাস্তব আগ্রহকে ধারণ করেছিল, জীবনের ঐশ্বর্য্যের বিপুলতাকে ব্যক্ত করাই ছিল এদের কাজ। যুদ্ধের সাগরে দ্বীপের সদৃশ অবিচল বীর, বিচ্ছিন্ন পিপীলিকাপুঞ্জের মতো সেনাপতিহীন সৈন্য, বল্মীক থেকে বহু সর্প নির্গত হওয়ার সঙ্গে বিশবাহু রাবণের অস্ত্র নিক্ষেপের তুলনা, অথবা ক্রুদ্ধা করিনী, মত্ত গজরাজের উপমা জীবন সম্বন্ধে মহাকবির বাস্তব অভিজ্ঞতার নিদর্শন। এই সমস্ত চিত্রকল্পে

প্রাচীন কবির এই দৃঢ় বিশ্বাসও নিহিত ছিল যে কাব্য-রস-ভোক্তা-সমাজও কবিরই মতো জীবনের বহুধা বিস্তৃত রূপ সম্বন্ধে ছিলেন সমান আগ্রহী এবং সচেতন। আকাশপথে পীত কৌষেয় বসনা সীতাকে রাবণ যখন হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন ব্যাপারটাকে বোধ হচ্ছিল যেন অগ্নিদীপ্ত পর্বত, সন্ধ্যা রাগ-রঞ্জিত মেঘ, কাঞ্চন-কাঞ্চী-ভূষিত নীল হস্তী। চেড়ী বেষ্টিতা সীতা যেন কুক্কুরী বেষ্টিতা যূথভ্রষ্টা হরিণী। প্রাচীন কবি অধিকাংশ উপমা সংগ্রহ করেছেন অরণ্য-জীবন থেকে। সঙ্গে সঙ্গে এও লক্ষণীয় যে অরণ্য-জীবনের অকস্মাৎ সংস্পর্শে উদ্ভূত বিস্ময় অপেক্ষা, সার্বজনীন অরণ্য-স্মৃতিই মহাকাব্যের যুগের এবংবিধ চিত্রকল্প সৃজনের মূলে। কাজেই প্রাচীন কবি যখন "বিদ্যুৎ পতাকা ও বলাকার মালায় শোভিত গিরিশৃঙ্গাকার মেঘ রণভূমিস্থ মত্ত গজেন্দ্রের ন্যায় গর্জন করছে"—এই বর্ণনা করেন তখন রণভূমিস্থ মত্ত গজেন্দ্রের হিংস্রতা অপেক্ষা গজেন্দ্রের গম্ভীর মর্যাদার ছবিটিই সর্বদর্শী, কেননা নিরাসক্ত, কবির স্মৃতিতে অধিক কার্যকরী ছিল। তাই অকস্মাৎ প্রকৃতিতে নারী সৌন্দর্যের সাদৃশ্য-সন্ধানেও আমরা আশ্চর্য হই না। কেননা রাজা অথবা নারী, সব কিছুই স্বভাব সৌন্দর্যের অঙ্গীভূত বিষয়। রামায়ণে বর্ষাকালীন অরণ্য-বর্ণনায় কবি বলছেন "নব তৃণাবৃত ভূমিতে স্থানে স্থানে নবজাত ইন্দ্রগোপ-কীট রয়েছে, যেন কোন নারী লাক্ষার বিন্দুযুক্ত শুকবর্ণ কম্বল গায়ে দিয়েছে"। পূর্বোদ্ধৃত উপমাগুলির ন্যায়, এ উপমাটিতেও মহাকবির উদ্দেশ্য ছিল বিষয়ের আত্মা অপেক্ষা বিষয়ের রূপকে পরিস্ফুট করা। এই প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছাড়া আর একটি ব্যাপকতর গভীর পরোক্ষ উদ্দেশ্য এখানে সক্রিয় ছিল। সেটি হল জীবনের বিস্তৃতির বিকল্প রচনা। শেষপর্যন্ত মহাকবির প্রদত্ত উপমারাশি সেই আলোকেই বিচার্য।

নিঃসন্দেহে আধুনিক কবির কাজ তা নয়। বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ের, বা বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সুপ্রযুক্ত সাদৃশ্য-রচনার ভিতর দিয়ে জীবনের বিশাল বিকল্প-রচনার চিত্রপটকে তিনি পূর্ণ করেন না। তাঁর লক্ষ্য বস্তুরূপের পরিভাষায় আত্মভাবনাকে ব্যক্ত করা। বিষয়পুঞ্জের আপাতসাদৃশ্যের সুপ্রযুক্ততা সেখানে একান্তই বহিরঙ্গ ব্যাপার। বাণী-চিত্র বা চিত্রকল্পের মাধ্যম কবির অনুভূতিকে ব্যাখ্যার উপায়ক্রম হিসাবে এখানে ব্যবহৃত। কীভাবে দেখেছেন, তদপেক্ষা কীভাবে অনুভব করেছেন আধুনিক কবির কাছে চিত্রকল্প সেই তাৎপর্যের সন্ধান দেয়। তাই কবিতার সমগ্রতার টানে এর প্রস্ফুটন, আবার সেই

প্রস্ফুটিত চিত্রকল্প তার বিনিময়ে কবিতার সমগ্রতাকেই সমৃদ্ধ করে। বাস্তবতার গভীরকে সন্ধান করাই এর উদ্দেশ্য। তাই কীট্‌স যখন পাঠকের কাছে রসসিদ্ধ কবিতার সার্থক চিত্রকল্পের প্রসঙ্গে তাকে সূর্যোদয়, মধ্য-সূর্যের কিরণ-সম্পাত এবং অস্ত-সূর্যের উত্তরগরিমার সঙ্গে উপমিত করেন তখন কবিমানসে চিত্রকল্প প্রস্ফুটনের ব্যাপারটা কতকটা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, "না বলা বাণীর আভাসের মত নীলাম্বরের প্রান্ত"—তখন আমুদিত নয়নের অনুক্ত বাণীর আভাসের সঙ্গে নীলাম্বরের প্রান্তেব তুলনা দেওয়া হচ্ছে না। তাহলে একে মিলিয়ে নেওয়া হবে দুরূহ। প্রকৃত পক্ষে নীলাম্বরের প্রান্ত প্রসঙ্গে কবির অভিজ্ঞতা কী আকারে রূপ পরিগ্রহ করেছে, কবি কীভাবে ব্যাপারটাকে অনুভব করেছেন, এখানে সেটাই প্রধান কথা। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'রাত্রে ও প্রভাতে'র শেষ স্তবকে—"দেবী তব সিঁথিমূলে লেখা বা নব অরুণ সিঁদুর রেখা। তব বাম বাহু ঘেবি শঙ্খবলয় তরুণ ইন্দুলেখা"—এই চিত্রকল্পে শঙ্খবলয়ের আভাসের প্রসঙ্গে তরুণ ইন্দুলেখার কল্পনা বাংলা কাব্য-ধারায় বৈষ্ণব পদকারদের দৌলতে আমাদের সুপরিচিত। কিন্তু এই পূর্ব-পরিচিতির জন্য চিত্রকল্পটি পাঠকদের কাছে তার তাৎপর্য হারায় না। এ তাৎপর্য কবিতাটির সমগ্রে বিধৃত প্রসঙ্গের পটে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে যুক্ত। স্বার্থপর ব্যবহারের অতীত, আসক্তি-হীন সৌন্দর্যের কল্পনাসঞ্চারিণী নারীমূর্তিতে তরুণ ইন্দুলেখার অনুভবতা সুন্দবের সম্বন্ধে মানবিক শ্রদ্ধার দ্যোতক। সমগ্র কবিতার মৌল ভাবপ্রেরণার আকর্ষণে এর জন্ম। চিত্রকল্পেব সার্থকতায় পাঠের পরিসমাপ্তিতেও তা অস্তাভার দিব্য গরিমার মতো আলোক-সম্পাতী। এবং সেটাই কবিতার উদ্দিষ্ট রস-লক্ষ্য।

গভীরের আহ্বানে গভীরের জাগবণ না হলে শ্রেষ্ঠ কবি-কর্মের জন্ম সম্ভব নয়। সচেতন কবিকর্মের সঙ্গে মনের চেতনেতর অংশ কেমনভাবে এক সমগ্রতায় ধৃত হলে কাব্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়, আবার কেমনভাবে আবেগের আতিশয্যে মনের অনুষঙ্গ-সৃজনী ক্ষমতা বিকল হয়ে কবিতার রস-লক্ষ্যের ব্যত্যয় ঘটায়, রবীন্দ্রনাথের বহু পঠিত 'দুঃসময়' কবিতাটি তার একটি নিদর্শন। ব্যক্তি-জীবনগত অনিশ্চয়তা-বোধ, শিল্পীর তপস্যা এবং বর লাভের মধ্যবর্তী দুরতিক্রম্য ব্যবধান এই কবিতার নেপথ্য-ভূমি। ক্লান্ত এবং উড্ডীন পাখি কবির চেতনেতর মনে তৎকালীন সমগ্র অভিজ্ঞতাকে জাগ্রত করেছে এবং জীবনের সমগ্র বেদনা ও রুদ্ধশ্বাস সংগ্রাম অন্ধ পাখির বেদনাকে

দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করেছে বলে কবিতাটি চিত্রকল্পের প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছে। "সঞ্চয়িতা" গ্রন্থে পাণ্ডুলিপির আলোক-চিত্রে দেখা যায় 'দুঃসময়' কবিতাটির একটি পূর্বরূপ ছিল। তখন এর নামকরণ হয়েছিল 'স্বর্গপথে'। স্বর্গ বা লক্ষ্যাভিসারী বিহঙ্গকে কবি তখন উদ্দিষ্ট রসমূর্তিতে ধারণ করতে পারেন নি। পাণ্ডুলিপির কবিতাটিতে দেখা যায় 'ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর' এই ধুয়া শুধু মাত্র শব্দঝঙ্কারের বশবর্তী হয়ে প্রত্যয়-সিদ্ধ হয়ে উঠতে পারে নি। 'দুঃসময়' রূপে পরিবর্তিত কবিতার প্রথম চার স্তবকে সেই রস-প্রত্যয় জাগ্রত হয়। কারণ পরিবর্জিত স্বর্গপথে কবিতাটির মতো এখানে কবি বহু অভ্যাসে বিজীর্ণ ধ্বনিহীন শব্দমালার উপর নিভরশীল নন। প্রসঙ্গোৎ-সারিত চিত্রকল্পমালায় কবিকল্পনা এখানে সুপরিস্ফুট। প্রথম স্তবকের মধ্যমণি এই চিত্রকল্পটি: "মহা আশঙ্কা জপিছে মৌনমন্তরে / দিক দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা।" ক্লান্ত পাখির ব্যর্থতা ও অচরিতার্থতা-বোধ-সঞ্জাত অনিশ্চয়তা আশঙ্কা উদ্বেলচিত্তে শুধু যেন স্বীয় অস্তিত্বকে ধারণ করে রয়েছে। 'জপিছে' এই ক্রিয়াপদ ভয়াবহ রাত্রির অনুষঙ্গে রবীন্দ্র-চিত্রকল্প-মালায় কতখানি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছিল 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের আলোচনা-কালে তা পরিস্ফুট হবে। বিপন্ন অস্তিত্বের প্রতিটি মুহূর্ত-গণনা জপমালার অক্ষগণনার অনুষঙ্গ সৃজন করেছে। অবগুণ্ঠিত দিগ্‌দিগন্তের চিত্রকল্পে চিত্রকল্পে চতুষ্পার্শ্বস্থ দুরূহ বিমুখতার গভীর প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন। মহা-আশঙ্কার মন্ত্র জপের চিত্রকল্পে যেন আত্যন্তিক বিনষ্টির ছায়া কম্পমান। পাখির প্রতি মুহূর্তের ক্লান্তি এবং প্রতি মুহূর্তের সংগ্রামের দ্বন্দ্বে ক্লান্তির অনুভূতি প্রথম দুই স্তবকে প্রধান। পরবর্তী দুই স্তবকে সংগ্রামের প্রেরণা ক্লান্ত পরাভবের অনুভবকে ধীরে ধীরে অতিক্রম করার প্রয়াস পেয়েছে। দ্বিতীয় স্তবকে কবিকল্পনা প্রথম স্তবক অপেক্ষা সংহত হওয়ার ফলে অনুসঙ্গ সৃজন স্বচ্ছন্দতর। "এ নহে মুখর বনমর্মর গুঞ্জিত"—এই চরণের বনের স্মৃতির আকর্ষণে পরবর্তী চরণে অজগর-গর্জিত হিংস্র সাগরের ছবি ফুটে উঠেছে—"এ যে অজাগর গরজে সাগর ফুলিছে"। এটি প্রথম স্তবকে আভাসিত পাখির আত্যন্তিক বিনাশের ভীতির অনুভবের সার্থক চিত্রকল্পগত অনুসরণ। এই পথেই এই কবিতার সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ চিত্রকল্পের উদ্ভব ঘটেছে তৃতীয় স্তবকে। তৃতীয় স্তবকের প্রথমে পাখির প্রতি মুহূর্তের বিপন্ন অস্তিত্বের অনুভূতি ভয়াল রাত্রি প্রসঙ্গে পুনরায় প্রহরগণনার চিত্রকে আকর্ষণ করেছে, এবং সম্বৃত-নিঃশ্বাস-

বায়ু ও স্তব্ধ আসনের উল্লেখে বোঝা যায় যে জপমালার অনুষঙ্গ তখনও ক্রিয়াশীল। "বিশ্বজগৎ নিঃশ্বাস বায়ু সম্বরি / স্তব্ধ আসনে প্রহর গণিছে বিরলে"—এই প্রহর গণনার চিত্রকল্পের পরেই—"সবে দেখা দিল অকূল তিমির সন্তরি / দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা" /—এই চিত্রকল্পে সমগ্র কবিতার মূল সুরের সাক্ষাৎ মেলে। কবিতাটি রচনাকালে কবির সচেতন সৃজনীবৃত্তি এখানে যে ব্যঞ্জনা সঞ্চারিত করতে চেয়েছে তার ব্যাখ্যা সহজ। স্তবকটির দ্বিতীয় চরণে "ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত অচলে"—একে অনুসরণ করে এই বক্তব্যে কবি উপনীত হতে চেয়েছেন যে পাখির সম্মুখে এখনও দীর্ঘ যাত্রাপথ—সূর্যকরোজ্জ্বল দিনের এখনও অনেক বিলম্ব। কিন্তু যে আত্যন্তিক বিনষ্টির আশঙ্কায় আতুর অস্তিত্বের যন্ত্রণা কবিতাটির কেন্দ্রস্থ ভাব, তার আকর্ষণে কবির সচেতন অভিপ্রায়কে লঙ্ঘন করে চিত্তকল্পটি স্বচ্ছন্দে বিকশিত হতে পেরেছে বলে কবিতার প্রসঙ্গে এর অর্থ অন্যতর। অকূল তিমির সন্তরনের পর যে ক্লান্ত ক্ষয়িষ্ণু চাঁদ দিগন্ত রেখায় দেখা দিল সে আকাশ অতিক্রম করতে পারবে কিনা এই সংশয় চিত্রকল্পটির প্রাণবস্তু। ক্ষীণ চন্দ্রাবশেষ এ স্থলে একদিকে অসামান্য প্রয়াসের প্রতিনিধি, অন্যদিকে সম্মুখবর্তী ব্যর্থ-বিলুপ্তির ইঙ্গিত। এই বিপন্ন অস্তিত্ব-বোধকে রূপময় করতে চেয়ে চতুর্থ স্তবকে প্রয়াস ও আশঙ্কার দ্বন্দ্বকে উর্ধ্ব আকাশের নক্ষত্রের প্রেরণা, ও নিম্নে (গভীর উচ্ছলতাকে) শততরঙ্গের রূপকে ধারণ করা হয়েছে। এই পর্যন্ত আশ্চর্য চিত্রকল্প পরম্পরায় পাখির অশেষ প্রয়াস সার্থকভাবে রূপায়িত। কিন্তু কবির ব্যক্তিগত শান্তি-বাসনার স্মৃতি-আবেগের আতিশয্যে কল্পনার ন্যায়কে অকস্মাৎ খণ্ডিত করেছে। এবং এতক্ষণ যে পাখি কবিতায় স্পষ্ট হয়ে উঠছিল তার প্রত্যয় বিনষ্ট হয়েছে। "বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি / এস এস সুরে করুণ মিনতি মাখা" /—এই চরণের ভাবাতিরেকে ইতঃপূর্বে সুগঠিত প্রত্যয়ের খণ্ডীভবন শুরু হয়েছে, এবং কবিতাটির শেষস্তবক একেবারেই ব্যক্তিগত আক্ষেপের সুরে ধ্বনিত হয়ে উঠল। "ওরে বাসা নাই, নাই ফুলশেজ রচনা"—কল্পনা ন্যায়ক্রমকে অনুসরণ করে নি। কেননা প্রশ্নটা যেখানে বিলুপ্তির অথবা অস্তিত্বের সেখানে "নাই ফুলশেজ রচনা"—এ আক্ষেপ একান্তই নিস্তেজ এবং মূল ভাবের বিরোধী। তাছাড়া অঞ্জলিবদ্ধ হাত উড়ন্ত পাখিকে মিনতি করে ডাকছে এ যদি বা পাখির পক্ষে প্রাসঙ্গিক, ফুলশেজ-রচনার উল্লেখে স্পষ্টই প্রতীয়মান যে পাখি কবির কল্পনা থেকে হারিয়ে গেছে

এবং আবেগাতিরেকে কবি স্বকণ্ঠে কথা বলতে চেয়ে রূপকের রসহানি ঘটিয়েছেন।

॥ দুই ॥

আমরা এ পর্যন্ত চিত্রকল্পের সাধারণ ধর্ম প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রেখেছি—এবং এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাকে চিত্রকল্পের স্বভাব উপলব্ধির জন্য ব্যবহার করেছি। এখন আমরা এই কবির চিত্রকল্পের বিশেষ স্বভাব ও বিবর্তনের আলোচনায় প্রবেশ করব। "কড়ি ও কোমল" পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রয়াসে যে খণ্ডতা তার মূলে কবির কল্পনার অপ্রস্তুতি। তখনও পর্যন্ত কবির আবেগ অভিজ্ঞতার বিস্তৃত সমর্থনে পুষ্ট হতে পারে নি। "সোনার তরী"-র পূর্বে রবীন্দ্র-জীবন সেই সচল অভিজ্ঞতার আভাস মাঝে মাঝে লাভ করলেও, তাকে হৃদয়ঙ্গম করেছেন তিনি "সোনার তরী"-"ছিন্নপত্রের" কালে। এখানে রবীন্দ্রনাথ স্বাধীন। বিহারীলালের কবিকৃতির ভিতরে রবীন্দ্রনাথ কিছু পথের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু বিহারীলালের কাব্যে ভাষার কাব্যিক আভিজাত্যকে লঙ্ঘনের ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থীয় প্রয়াস, কল্পনার নির্বস্তুক চালের জন্য তাৎপর্যহীন। তাই বিহারীলালের কাব্যে খণ্ডীভূত নগর-জীবনের প্রতিক্রিয়া যদিও কখনো কখনো উপস্থিত, তথাপি তার মূল-ভূমিতে ছিল শিথিলতা। মানুষের স্বার্থপরতাকে দেখে অরণ্যবাসের অভিলাষ, প্রকৃতি-প্রেমিকতা নয়। দৃশ্য-মুগ্ধতাও প্রকৃতি-চেতনা নয়। সে সময়ে রমেশ দত্তের সামাজিক উপন্যাস ছিল—"শহরে চল নতুবা উন্নতি নাই"—এই মনোভাব ; পাশাপাশি বিহারীলালে ছিল মানুষ জন্তুর ভয়ে নির্জনবাসের বাসনা। গদ্য-কাহিনী ও কবি-কল্পনার এই বিপরীতাচরণের হেতু আমাদের নগর-জীবনের উদয়ের মধ্যে যে অষ্টাবক্রতা তার মধ্যে অনুসন্ধেয়। তথাপি কল্পনার সদৃশ-সূত্রের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও চাকুরি-লক্ষ্য মধ্যবিত্ত নায়কদের অপেক্ষা বিহারীলালের অনুভূতিতে ব্যক্তিজীবনের যন্ত্রণার ঝঙ্কার বেজেছিল বেশী। কল্পনার বিস্তৃত সৃজনভূমির অপরিণত গঠনের জন্য তিনি সে অনুভূতিকে বস্তুরূপময় করে তুলতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি সে-ক্ষেত্রে কিছুর প্রতিক্রিয়ালব্ধ ব্যাপার নয়। এখানে প্রতিক্রিয়ার সে জাতীয় কোনো সর্বাঙ্গীন পটভূমিও ছিল প্রশ্নের বাইরে। স্মরণীয় যে রমেশ দত্তের

উৎসাহ এবং বিহারীলালের যন্ত্রণার বাস্তব শিকড় তখনও ক্ষীণ এবং অপুষ্ট। কেননা শিল্পবিপ্লবের কালে আবিষ্কারের যুগ সম্বন্ধে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের আক্ষেপোক্তিতে যে great changeএর কথা বলা আছে (I grieve when on the darker side of the great change, I look) সেই great change এর অস্তিত্ব ব্যতিরেকে এই উৎসাহ আর যন্ত্রণা দুইই হয়ে দাঁড়ায় অমূল তরু।

রবীন্দ্রনাথের "সোনার তরী" কাব্যগ্রন্থটি সে বিচারে কবির তৎকালীন অভিজ্ঞতার শুদ্ধ দান। এখানে প্রকৃতি-চেতনা কখনও নগর-জীবনের নেতিতে কল্পিত নয়। জীবনের দ্বন্দ্বকে উপলব্ধি করার মুকুর হিসাবে রবীন্দ্রকাব্যে প্রকৃতির ব্যবহার। বলা যায় তিনি জগৎ ও জীবনের প্রাণস্পন্দনকে প্রতিষ্ঠা করবেন বলেই প্রকৃতির শত শত প্রতিমা গড়ে তুলেছেন। 'সোনার তরী' কবিতাটি যে অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল বাঙালী পাঠককে কাব্য-রসামৃত দান করে চলেছে তার মূল এইখানে। কেন এই কবিতাটি আমাদের শান্ত আনন্দ দান করে? কিসে ঘটে চিত্তলোকের গভীর বিস্তৃতি? তাকে সন্ধান করতে গেলেই দেখা যাবে, সে শক্তির উৎস এ কবিতার রূপক-নির্মাণের সাহসিক অভিনবত্বে। কৃষক, ধানের ক্ষেত, এবং বর্ষার আকাশ—এই সমস্ত কিছুর মিলনের ভিতরে লৌকিক কর্মময় জীবনের যে প্রসাদ বিদ্যমান এই কবিতার অন্তরশায়ী কল্পনার পক্ষে তা অলৌকিক স্পর্শের স্বরূপ। রূপকের এই বিশিষ্টতায় কবিতাটি বিশিষ্ট। শ্রেষ্ঠ কবিবৃন্দ সদাই তাঁদের কল্পনাকে অভিজ্ঞতা-নিষ্কাশিত মূল্যে করে তোলেন পরম। যে মূল্যে ধৃত হলে সেই পরম প্রসন্নতা হয় কাব্যের সম্পদ তারই অভিব্যক্তিকে খুঁজি আমরা কাব্যের আত্মায় ও টেক্‌নিকে। এখানে দেশজ, প্রাকৃত জীবনাশ্রয়ী অভিজ্ঞতা কবি-কল্পনাকে সজীব করেছিল বলেই এর অবয়বে এসেছে এক গাঢ়-বদ্ধ চিত্রল সংহতি। "চারি দিকে বাঁকাজল করিছে খেলা"—কৃষকের প্রতিকূল বাস্তবতার আশ্চর্য ছবি। জলের বঙ্কিমতায় স্রোতের কুটিলতা এবং তদনুষঙ্গে সাপের বাঁকা গতির কথা মনে পড়ে। "তরুছায়া মসীমাখা" (বিশূন্য-ভবিষ্যৎ) কিংবা "ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে দুধারে" (ব্যর্থ আকুলতা) এবং "শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে" (বন্ধ্যা প্রাত্যহিকতা), সবাই সেই চিত্রল পারম্পর্য, যা সংহত কল্পনার বহিঃ-প্রকাশ। কবিতাটি রবীন্দ্র-কাব্য-পর্যায়ে গভীর তাৎপর্যে পূর্ণ। সোনার ধানের সঙ্গে বিচ্ছেদের এই স্মৃতি রবীন্দ্র-মানসের সমগ্রে জড়িয়ে যাওয়ার ফলে অতঃপর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিচ্ছেদকল্পনায় স্বর্ণবর্ণ স্বাভাবিক অনুষঙ্গ হিসাবে আকৃষ্ট

হয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতা কেমনভাবে কাব্যে ধৃত হল এবং কাব্য-ধৃত অভিজ্ঞতার স্মৃতি কেমন করে পরবর্তী কবিসৃষ্টিকে প্রভাবিত করল এ ব্যাপার তার একটা নিদর্শন বটে। কাব্য-রসিকদের কাছে এ কথা অজ্ঞাত নয় যে স্বর্ণবর্ণ 'সোনারতরী'-'চিত্রা'-পর্যায়ে বহু ব্যবহৃত বর্ণ-প্রসঙ্গ; এবং এই প্রসঙ্গে বিচ্ছেদের স্বর কেমন বিজড়িত হয়ে রয়েছে সেটাও লক্ষণীয় বটে।

(ক) আকাশে সোনাব বর্ণ সমুদ্র গলিত স্বর্ণ
পশ্চিম দিগ্বধূ দেখে সোনার স্বপন,
সন্ন্যাসী আবার ধীরে পূর্বপথে যায় ফিরে
খুঁজিতে নূতন করে হারানো রতন।

(খ) মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশী
বিশ্বের প্রান্তর মাঝে। শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিযা আছেন এলো চুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চল
ব… টানি দিয়া

(গ) কখন যে সায়াহ্নের শেষ স্বর্ণ বেখা
মিলাইযা গেছে ..
অন্তরেব অন্তহীন অশ্রুপাবাবাব
উদ্বেলিত উঠিযাছে হৃদয়ে আমাব।

(ঘ) অসীম রোদন জগৎ প্লাবিযা দুলিছে যেন
তারি পরে ভাসে তরণী হিরণ
তারি পরে পড়ে সন্ধ্যাকিরণ—

(ঙ) শুধু এ সোনার সাঁঝে বিজন পথের মাঝে
কলস কাঁদিয়া বাজে কাঁকনে।

এই মতো এ-তালিকার কলেবরের ইচ্ছামতো বৃদ্ধি ঘটিযে দেখানো চলে যে স্বর্ণবর্ণ ও বিচ্ছেদ-বেদনা কবিকল্পনায় জড়িত থাকার ফলে স্বর্ণবর্ণের প্রসঙ্গে রোদন, অশ্রু প্রভৃতির অনুষঙ্গও ব্যবহৃত হয়েছে। অপরাহ্ণ-সায়াহ্নের সূত্রে স্বর্ণবর্ণের ক্ষণস্থায়িত্ব এবং কৃষকের সঙ্গে সোনার ধানের বিচ্ছেদের স্মৃতি এ বিষয়ে কবি-

কল্পনায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। সোনার ধান সম্বন্ধে কৃষকের ভালোবাসায় যে অনুভূতি জড়িত—"আমি একে চিরস্থায়ী সঞ্চয় করে রেখে দিতে পারব না" অপরাহ্ণ-সায়াহ্নের স্বর্ণসৌন্দর্য সম্বন্ধে কবি-অনুভূতির মূল কথাও সেই জাতীয়—"একে এখনি বিদায় দিতে হবে"। কৃষক শ্রমে যাকে রচনা করেছে, পাগল যন্ত্রণায় যাকে সন্ধান করেছে, কবির কাছে তাই ভালোবাসায় সুন্দর। তা কখনও স্বার্থপর ব্যবহারের মুঠিতে ধরা দেয় না। তাই, স্বর্ণশস্য, স্বর্ণালোক, স্বর্ণাভা স্বর্ণসন্ধ্যা প্রভৃতি শেষপর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় জীবনের ঐশ্বর্যময় অমেয় সম্ভাবনার প্রতীক—সেই সম্ভাবনা এবং স্থিতাবস্থার দ্বন্দ্বে জীবনের যন্ত্রণাময় অগ্রগমনের ব্যাপারই রবীন্দ্রকাব্যের আত্মা।

'সোনার তরী' কবিতাটি রবীন্দ্রকাব্য-ব্যাখ্যায় আরো একটি দিকে আলোক-সম্পাত করে। "সোনার তরী" এবং "চিত্রা"-যুগে দেখা যায় যে কবিকল্পনার বিকাশের দুই ধারা বিদ্যমান। এক ধরনের কবিতার সাক্ষাৎ মেলে যেখানে কবিকে প্রত্যক্ষ জীবন কল্পনার মূর্তি গঠনে সাহায্য করেছে বেশী। সঙ্গে সঙ্গে আর এক ধরনের কবিতার ধারা বিদ্যমান যেখানে কবি কল্পনার মূর্তি গঠনে প্রত্যক্ষ জীবন অপেক্ষা, কাব্য-স্মৃতির দ্বারস্থ হয়েছেন অধিক। শেষোক্ত কবিতাগুলির ক্ষেত্রে কল্পনা যাদের অবলম্বনে অভিব্যক্ত সেই সব চিত্রকল্পের গঠনে কিছুটা সাদৃশ্য-সূত্র আছে। মাল্য, মন্দির, মালঞ্চ, প্রদীপ, আরতি প্রভৃতির ব্যবহারে বৈষ্ণব পদকারদের কাব্য-ধৃত পরিমণ্ডল আভাসিত—তাদেরই সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের কল্পনামূর্তি এসব ক্ষেত্রে প্রাণবন্ত হবার প্রয়াসী। অথচ এটাও লক্ষ্য না করে উপায় নেই যে "সোনার তরী" "চিত্রা" পর্যায়ের অপেক্ষাকৃতঅসংহত কবিতাগুলির সঙ্গেই এই মাল্য মন্দির, মালঞ্চ প্রদীপ, আরতি প্রভৃতির রূপক বিজড়িত। উদাহরণ স্বরূপ 'মানস সুন্দরী' ও 'সান্ত্বনা' কবিতার নাম করা চলে। কবিতাগুলি রীতিমতো কাব্যিক, এমনকি, কবি-আবেগের বিপুল আতিশয্যে যেন তারা মৃত্তিকার অনাত্মীয় কেউ এমনও মনে হয়। কিন্তু প্রথমোক্ত কবিতাগুলিতে প্রকৃতির প্রত্যক্ষ ছোঁয়া লেগেছে বলেই তাদের বৃন্তলগ্ন দৃঢ়বদ্ধ পাপড়িতে সুরভিত হাওয়া। তাই 'সোনার তরী', 'হৃদয় যমুনা', 'পরশ পাথর', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', এবং "চিত্রা"র 'দিনশেষ' কবিতায় দেখা যায় যে এইগুলিই হচ্ছে সেই সব কবিতা যেগুলি প্রথাসিদ্ধ কাব্য-সংস্কারের উপর নির্ভরশীল নয়। কবি বিষ্ণু দে যাকে বলেছেন রবীন্দ্রকাব্যের অধিষ্ঠাতা আবেগ সেই প্রকৃতির প্রত্যক্ষ ভাবাকাশে কবি-কল্পনা এখানে ধৃত—এবং প্রতিটি

কবিতার রূপকেই ব্যক্তির নৈঃসঙ্গ্যের যন্ত্রণার দীপ্তি। 'সোনার তরী' এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যে কবির নিজস্ব অভিজ্ঞানের সূচক-নিদর্শন।

॥ তিন ॥

লক্ষণীয় যে সন্ধ্যার আলো আঁধার বা মেঘময় দুর্যোগ বা ঘন আবর্ত-সঙ্কুলতা তরীর প্রতীককে কবিকল্পনায় সদাই সাহায্য করেছে। জ্যোৎস্না-পুলকিত রাত্রি বা নির্মল সূর্যালোকিত দিনের প্রসঙ্গে তরীর ব্যবহার যে ঘটে নি তা নয়। কিন্তু সেখানে তরী প্রতীকের শক্তিতে গুণান্বিত হয় নি। তরীর অনুষঙ্গে এই দুর্যোগের স্মৃতি পুষ্ট হতে হতে স্বাধীনভাবে "খেয়া"-"উৎসর্গ" অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথকে নবীন রূপ চিন্তার সন্ধান দিল। এই পর্যায়ে দেখা যায়—রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন বিরাট চিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের ঘাত-প্রতিঘাত, যাকে বলা যায় জীবনের দ্বান্দ্বিক সমগ্রতা, তাকে উপলব্ধির প্রয়াস আকর্ষণ করেছে একদিকে রাজা প্রভু প্রভৃতির রূপক আর একদিকে শিব বা রুদ্রের রূপক। এই দুই রূপকেরই আধারভূমিকে পুষ্ট করেছে ঝঞ্ঝা-ঘন দুর্যোগের কল্পনা। বিশ্বজীবন রাজার মতো দাবি করে ব্যক্তিজীবনের সর্বস্ব যেমন দুর্যোগের রাত্রি দাবি করে রুদ্ধার্গল ঘরের সুখসুপ্তি এবং শান্তি। নিঃসন্দেহে পরাধীন স্বদেশের বিক্ষুব্ধ জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত কবির তৎকালীন ব্যক্তিজীবন এই কল্পনায় অনেকখানি প্রাণশক্তির সঞ্চার করেছে। রাজা, প্রভু, রুদ্র, ঝড় এই সময়ের উপযুক্ত রূপকল্পনা। ইতঃপূর্বে মেঘ ঝড় দুর্যোগ বাংলা কাব্যে ছিল শুধু প্রকৃতিমুগ্ধতার উপাদান। জীবনের তাৎপর্যে মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথই তাদের মূল্য অনুভব করলেন প্রথম, এবং আমাদের শেখালেন সেই মূল্যে তাদের ভালোবাসতে। ঝড়ের প্রসঙ্গে দুয়ার রবীন্দ্রনাথের প্রিয় প্রতীক। দুয়ার বিশ্বজীবন ও ব্যক্তি-জীবনের মধ্যবর্তী বাধার চিহ্ন। দুয়ার সংশয়ের নিদর্শন।

এই মেঘ-বজ্র-ঝঞ্ঝার মূল্যকে উপলব্ধি করার কালে, রাজা বা প্রভুর বৃহৎ চেতনার ভাষানুষঙ্গে রথ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজনীয় প্রতীক। জীবনের স্থিতাবস্থায় প্রচণ্ড বিশ্বজীবনের সংঘাতে উত্থিত আলোড়নের সঙ্গে রাজার রথের অনিবার্য আবির্ভাব জড়িত। তরীর এবং পাখির প্রতীকের মধ্যে ক্লান্তি এবং অতিক্রমণের প্রয়াস নানাভাবে অর্থসঞ্চার করেছে। তরীর তীরে ফিরে আসায় এবং পাখির নীড়ে ফিরে আসায় ক্লান্তি, ঝড়ঝঞ্ঝায় উভয়ের যাত্রায়

অতিক্রমণের অসামান্য প্রয়াসের ইঙ্গিত। লক্ষণীয় যে এই ঝড় বা বৃষ্টির দুর্যোগের পটভূমিকায় কবিমানসে পুনরায় বাদলাভিসারের স্মৃতিতে বৈষ্ণব পদকারদের কাব্যধৃত পরিমণ্ডল জাগ্রত হয়েছে বলে অভিসারিকা নায়িকার চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছে বারে বারে। 'ঝড়ের দিনে' নামক অল্পখ্যাত কিন্তু সুসার্থক কবিতাটি রচিত হয়েছে এই সময়েই।

তথাপি "কল্পনা" থেকে "উৎসর্গ"-"খেয়া" পর্যন্ত বিস্তৃত পর্যায়ে পুনরায় দেখা গেল যে "ক্ষণিকা"র প্রত্যক্ষ জীবনের হাওয়াতেই রবীন্দ্রনাথের মুক্তির নিঃশ্বাস। "ক্ষণিকা"- কাব্যের অলৌকিক শক্তি লৌকিক জীবনের মৃত্তিকা হতে রস-সংগ্রহ করেছে। সে কারণে রবীন্দ্রকাব্য পর্যায়ে "ক্ষণিকা" অসামান্য। জীবনের সহজ ধারার অনুবর্তী হবার যে বাসনা "ক্ষণিকা"র মূল সুর তার মধ্যে প্রকৃতিকেই মুখ্য এবং ঋজু আবেগে ধারণ করার প্রয়াস সক্রিয়। "ক্ষণিকার" রসরূপের বিশিষ্টতা উপলব্ধির জন্য 'আষাঢ়' কবিতাটিকে প্রতিনিধি স্থানীয় বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। অলঙ্করণের প্রয়াসহীন, স্বচ্ছন্দগতি ভাষা, প্রকৃতির সহজ রূপ ও জীবনের সরল স্পন্দনের ত্রিবেণী সংগম ঘটেছে এই কবিতায় এবং এই কাব্যগ্রন্থে। সংস্কৃত ক্লাসিকের কাব্য-খ্যাত বর্ষার রূপ রবীন্দ্রকাব্যে বারে বারে দেখা দিয়েছে। মেঘদূতের প্রসঙ্গে অথবা স্বাধীনভাবেও 'বর্ষামঙ্গল' কবিতায় কবি বর্ষার কাব্য খ্যাত মূর্তিকেই গঠিত করেছেন ক্লাসিকের ছায়ায়। অবশ্যই সে সব কবিতায় কবির ঐতিহ্যমুখী মনের চেহারা আমাদের কাছে দিব্য স্ফূর্তি লাভ করেছে। কিন্তু 'সোনার তরী' কবিতাটির ন্যায় 'আষাঢ়' কবিতায় পুনরায় কবি প্রচলিত কাব্যসংস্কারকে পরিহার করে জীবনের লৌকিক ও প্রত্যক্ষ স্পন্দনকে ধারণ করেছেন। কবিতাটিতে কোনো শঙ্কাতুর গৃহস্থমাতা পরিবারের কর্মিষ্ঠ সন্তানগুলির জন্য বৃষ্টি-ঘন আসন্ন অকাল আঁধারে ভাবনাকুল চিত্তে কথাগুলি উচ্চারণ করছেন। স্বভাবতই মায়ের আশঙ্কা-বাণীর তন্নিষ্ঠ রূপায়ণে কল্পনার অভিজাত আচরণ পরিহৃত। চিত্রকল্পের প্রয়াস অপেক্ষা চিত্রকে বিবৃত করার প্রবণতা অধিক। "কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার ঘনিয়েছে দেখ চাহিরে" কিম্বা "দরদর বেগে জলে পড়ি জল ছলছল ওঠে বাজিরে"—এসব চরণে চিত্রকল্পের সচেষ্টতা নেই। কল্পনার কাজ এখানে মাতৃহৃদয়ের ছবিটিকে প্রস্ফুট করা। সরল ছবিগুলি সে উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হয়েছে বলে শেষতম স্তবকে বেণুবন শব্দেও মাতৃবাচনের বাস্তবতা খণ্ডিত হয়নি। "ক্ষণিকা" প্রসঙ্গে একথা বহুশ্রুত হলেও পুনরুক্তি দোষাবহ নয় যে

“কল্পনা” কাব্যে ‘দুঃসময়’ ‘অসময়’ প্রভৃতি কবিতায় যে সঙ্কট-চেতনা কবিকে অধিকার করেছিল “ক্ষণিকা”য় তার মুক্তি ঘটল জীবন ও প্রকৃতির উষ্ণ সান্নিধ্যে। “কল্পনা”র ‘অশেষ’ কবিতার যে ব্যাখ্যাই রবীন্দ্রনাথ দিন (এ আহ্বান এ তো শক্তিকেই আহ্বান, কর্মক্ষেত্রেই এর ডাক, রসসম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়) এখানেও শিল্পী-জীবনের সঙ্কটের কথাই প্রধান।

জীবনস্নানেই মুক্তি এই অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে “ক্ষণিকা”য় বর্ষার চিত্রকল্পের ব্যবহার ঘটেছে বারেবারে—কিন্তু “সোনার তরী”-“চিত্রা” পর্যায় থেকে কবিকল্পনা যে অগ্রসর হয়েছে তা বোঝা গেল বর্ষার অভিজ্ঞতা থেকে নবমূল্য নিষ্কাশিত করায়। “ক্ষণিকা”য় বর্ষা ব্যবহৃত হয়েছে বারেবারে—কিন্তু ভাবানুষঙ্গে বিরহকে আকর্ষণ করে নি। সে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে কর্মের উল্লাসের এবং নবসমাগমের উচ্ছ্বাসের অনুষঙ্গকে জাগ্রত করে। এই ভাবেই ভারতবর্ষের এই মহত্তম আধুনিক কবি ঐতিহ্যকে ব্যবহারের মাধ্যমে নবীন মূল্যে অর্থবান করে তুললেন। বুঝলেন যে ঐতিহ্য শুধু মেঘদূতে নয়, বাণভট্টে কালিদাসে নয—দেশের প্রাণবন্ত আবেগের প্রবহমান ধারাকে উপলব্ধি করায় তার তাৎপর্য বোঝা যায়, সেই জীবনযুক্ত আবেগকে কল্পনার উপাদানে মূর্ত করে তোলায় কবি-কীর্তির সার্থকতা ভবিষ্যপ্রভাবী হয়। তাই ‘নববর্ষা’ কবিতায় ধৃত নায়িকাদেব সৌখীন অথচ উচ্ছ্বসিত মূর্তির পাশে ‘কৃষ্ণকলি’ কবিতার লৌকিক নায়িকার সরল প্রাণময়তাকে প্রকৃত মূল্যে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। প্রথমে কল্পনার ঐ অভিজাত আচরণ দ্বিতীয়ে মুক্তির আকাশকে না পেলে সেই সর্বালিঙ্গন প্রয়াসী কলাপী আবেগ আবির্ভাবের চিত্রকল্পে সংহত হয়ে উঠতে পারত না।

অথচ নির্দ্বন্দ্ব স্নিগ্ধতার জন্য “ক্ষণিকা”য় কবিকল্পনার আকুলতা সত্ত্বেও বিস্তৃতির সঙ্গে সংহতির দ্বন্দ্বে তিনি কোনোদিন বিশ্রাম নিতে পারেন নি এও সত্য। সত্যই, তিনি যেন জীবনকে বলেছেন—তুমি নবনব রূপে এস প্রাণে। এই বিস্তৃতির সঙ্গে সংহতির দ্বন্দ্বে রবীন্দ্র-চিত্রকল্পের জন্ম। “ক্ষণিকা”য় প্রত্যক্ষ প্রকৃতি-ধৃত ছোট ছোট অসংখ্য ছবির স্মৃতি ক্ষণে ক্ষণে জীবনের বিস্তৃত পটকে উন্মোচিত করেছে বটে কিন্তু “বলাকা”তেই দেখা গেল সেই বিস্তৃত জীবন স্মৃতি-সঞ্জাত আবেগ প্রকাশে সংহত হতে চায়। দেশের নদী কূলে কূলে

ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতি-জীবনের অজস্র বিকাশ এবং অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মানুষের অন্তহীন প্রয়াস কবি-কল্পনাকে স্পর্শ করেছে। কল্পনা মুক্তি চেয়েছে টেকনিকের সাযুজ্যে—ছন্দে, ভাষাযোজনায় চিত্রকল্পের অভেদে। আবার এই টেকনিকের বিকাশেই জীবনের চলিষ্ণু স্বরূপকে উপলব্ধি করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। তিনি এতদিনে স্থিরপ্রত্যয় হয়েছেন যে 'সিন্ধুপারে' কবিতার কোলরিজীয় অতিপ্রাকৃত তাঁর অনাত্মীয়, রক্ত আলোর মদে মাতাল হয়ে ঝড়ের সন্ধানে শেলীউপম কল্পনাচারিতাও তার কেউ নয়, এবং তাঁর 'তাজমহল' হয়ে উঠল না গ্রীসীয় পাণপাত্রের মতো সত্যসুন্দরের বাণীবহ। তাই "বলাকা"র ভাবনায় "ক্ষণিকা"র প্রশান্তির প্রশ্রয় না থাকলেও সেই ভাবনাকে মূর্ত করার জন্য "ক্ষণিকায়" ব্যবহৃত প্রকৃতিগত সরল অভিজ্ঞতারই ডাক পড়েছে—যেখানে বিধুরতা নেই। "আমার যা শ্রেষ্ঠ ধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে/ দেখা দেয় মিলায় পলকে"—"বলাকা"র এই চিত্রকল্পের পশ্চাতে "ক্ষণিকা"র—"নদী জলে পড়া আলোর মতন ছুটে যা ঝলকে ঝলকে"—এই চিত্রের স্মৃতি প্রেরণাশীল। "বলাকা"য় রক্তসন্ধ্যা রক্ত-জবা, রক্ত আলো, লাল চেলি সমস্তই পর্যায়ান্তরে যাত্রার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত। বিবাহের লাল চেলির অনুষঙ্গেই "বলাকা"য় লালরঙের তাৎপর্য অনুসন্ধেয়। বিবাহে বধূর প্রসঙ্গে একটি অধ্যায়ের অবসান ও নবজীবন যাত্রা। রবীন্দ্রকল্পনায় বিবাহ কখনও কখনও মৃত্যুর রূপক কেননা মহৎ মৃতুকে তিনি সমাপ্তি বলে মানেন না। এও যাত্রা। তাই যাত্রার অনুষঙ্গে "বলাকা"র লাল রঙের ব্যবহার। যাত্রার ভাবানুষঙ্গেই আবার "বলাকা"য় কবির প্রিয় প্রতীক নদী আর পাখি। অথচ নদী পাখির অনুষঙ্গে "ক্ষণিকা"র যুগের পদ্মার জীবন-স্মৃতি বহুভাবেই প্রকাশিত। "আলোর আনন্দ নিয়ে জলের তরঙ্গে এবা নাচে" কিম্বা "যেদিন শ্রাবণ নামে দুর্ণিবার মেঘে / দুই কূল ডোবে স্রোতোবেগে" কিম্বা "সন্ধ্যা-রবির স্বর্ণকিরীট ফেলে দিল অস্তপারে" এই সমস্ত চিত্রকল্পে তার নিদর্শন। "সে আনন্দ থেমে যেত যদি/এই নদী/ হারাত তরঙ্গবেগ"—এ যেমন বলাকার উপযুক্ত ভাষা-চিত্র তেমনি এ পরিণতির মূলেও বিস্তৃত জীবনস্রোত। কবির কল্পনার পক্ষেও এই উক্তি সত্য। আর "শব্দময়ী অপ্সর রমণী/গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি"—এই চিত্রকল্পে তো কবির হাতে দেশের ক্লাসিক আর দেশের প্রকৃতির প্যাশন সমভাবে স্ফূর্তিলাভ করেছে। রবীন্দ্রকল্পনার মধ্যগগন বললে ঠিকই আখ্যাত হয় এই পর্যায়।

তথাপি "বলাকা"র ৪১নং কবিতাতে "পূরবী"র কালের সূচনাতে ও "ক্ষণিকা"র জীবনস্মৃতির সুস্পষ্ট স্বাক্ষরই আবার পাওয়া গেল। শিল্পীর যন্ত্রণা, নৈঃসঙ্গ্য পূরণের প্রয়াস ও সহজ জীবনপ্রীতিতে "বলাকা"র ৪১নং কবিতাটি গ্রন্থের অনেক কবিতায় ধৃত তীব্র দার্শনিক ভাবনার সম্পূর্ণ বিরোধী। "চলে কি না চলে/ক্লান্ত স্রোত শীর্ণ নদী নিমেষ নিহত/আধো জাগা নয়নের মত"—এই চিত্রকল্পে যে অবসন্নতার ব্যঞ্জনা তা যেন উজ্জীবিত হতে চাইছে সেই পথে যে পথ "চলেছে মাঠের ধারে ফসল খেতের যেন মিতা/নদীসাথে কুটিরের বহে কুটুম্বিতা"। এই পথেই "বলাকা"য় রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প যে প্রধান গুণ আয়ত্ত করেছে তা পরিপূর্ণ হয়ে উঠল "পূরবী"তে। তাঁর চিত্রকল্পই হয়ে উঠল ভাবনার ভাষা। "সোনার তরী"-"চিত্রা"য় চিত্রকল্পরাজির কাজ ছিল কবির কল্পনাকে সাহায্য করা। কিন্তু "বলাকা"র ঐ অপরিচিত পংক্তিকয়টির মধ্যেই দেখা গেল যে ধীরে ধীরে কবি ভাবানুভূতির প্রকাশকে চিত্রকল্পমাধ্যমী করে তুলতে চাইছেন। "সোনার তরী"র বিখ্যাত কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় দিনান্তের পশ্চিম আকাশ রবীন্দ্রনাথের হাতে হয়ে উঠেছে—"ওই যেথা জ্বলে সন্ধার কুলে দিনের চিতা।" পৃথক চিত্রকল্প হিসাবে এর সাদৃশ্য-বাচকতাকে কেউ সন্দেহ করবে না। কিন্তু কবিতাটির মূল রসকল্পনা-প্রসঙ্গে চিতা শব্দে রসাভাসের অভিযোগ উঠতে পারে। কেননা চিতাগ্নি যে ভাবানুষঙ্গের ধারক তা বিদেশিনী সুন্দরীর যিনি সহযাত্রী তাঁর বিস্ময়ঘন মানসিক অখণ্ডতার পক্ষে প্রক্ষিপ্ত শব্দ। "পূরবী"তে সন্ধ্যা বর্ণনায় সেক্ষেত্রে—"যেথা অস্তগামী রবি/সন্ধ্যা মেঘে রচে বেদী নক্ষত্রের বন্দনা সভায়/যেথা তার সর্বশেষ রশ্মিটির রক্তিম জবায়/সাজায় অন্তিম অর্ঘ্য"—এই চিত্রকল্প শুধু চিত্রকল্প নয় এই তাঁর অভিজ্ঞতার ভাষা। আরো লক্ষণীয় যে বলাকা-পূরবীর কালেই দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প এতকাল উপমা ও রূপকের হাত ধরে চলতে চলতে এইবার জীবনের ভাবনাগত জটিল গভীরের বিশিষ্ট ধ্বনি হতে পেরেছে। সে কারণে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' থেকে উদ্ধৃত চিত্রকল্পটির স্বতন্ত্র সম্মান থাকলেও 'পূরবী' থেকে উদ্ধৃত অংশটির পূর্ণরসভোগে কবির তৎকালীন সমগ্র অভিজ্ঞতাই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। "সাজায় অন্তিম অর্ঘ্য"—সেই আশ্চর্য ভাষার একাংশ। মন্দির, আরতি, প্রদীপ প্রসঙ্গে "সোনার তরী"-"চিত্রা"র যুগে কাব্য-সংস্কারগামী কল্পনা কিছুটা অসংহত ছিল সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে; কবির নিজ অভিজ্ঞতা-সিদ্ধ জীবন-প্রসঙ্গে তারাই "পূরবী"র কালে হয়ে উঠল নবীন অর্থ-গৌরবে সমৃদ্ধ। "প্রতিমা না হয়

হয়েছে চূর্ণ, বেদীতে না হয় শূন্যতা"-কিংবা "সন্ধ্যারতি লগ্নে কেন আনিলে না নিভৃত মন্দিরে/শেষ পূজারিণী" কিম্বা আরো পরবর্তী কালে "তবু ভাঙা মন্দির বেদীতে/প্রতিমা অক্ষুন্ন রবে সগৌরবে তারে কেড়ে নিতে/শক্তি নাই তব"— সমস্ত ক্ষেত্রেই মন্দিরের রূপকে নিজ বিস্তৃত জীবনের কথা ভাবা হয়েছে। প্রাচীনার্থ-বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে এরা এত দিনে হয়েছে যথার্থ কল্পনা-সিদ্ধ। অন্যদিকে, "তারার তারায় খোঁজে তৃষ্ণার আতুর অন্ধকার/সঙ্গসুধারস" কিংবা "ঝঞ্ঝার মদিরামত্ত বৈশাখের তাণ্ডব লীলায়/বৈরাগী বসন্ত যবে আপনার বৈভব বিলায়" প্রভৃতি চিত্রকল্পের তাৎপর্য বিষয়ের আত্মাকে আবিষ্কার করে কল্পনার বিকল্পবিহীন ভাষা হয়ে ওঠায় নিহিত। "পূরবী" পর্যায়ে কবি যে বেদনার ঝঙ্কারে অনুপম রস সিদ্ধির পথে পদার্পণ করেছিলেন তার উৎসে যদিও ব্যক্তিজীবনের সুখের স্মৃতি, শোকের স্মৃতি, যদিও আসন্ন মৃত্যুবোধের ছায়ায় তাদের জন্মভূমি, তথাপি যন্ত্রণাটির পরিণত আকারে শিল্পীর নিজস্ব দ্বন্দ্ব-বেদনার উপস্থিতি—"বহুদিন মনে ছিল আশা/অন্তরের ধ্যান খানি/লভিবে সম্পূর্ণ বাণী"। "পূরবী"তে এই অকৃতার্থতার বোধ থেকেই সৃজিত হয়েছে উদ্ধৃত চিত্রকল্পের ন্যায় অসংখ্য চিত্রকল্প।

"সোনার তরী"-"চিত্রার" যেমন বসন্ত স্থায়ী ঋতু, স্বর্ণ এর স্থায়ী বর্ণ, "ক্ষণিকা"র যেমন বর্ষা, মেঘ-নীল ও সবুজ এর স্থায়ী বর্ণ, "পূরবী"র তেমনি স্থায়ী ঋতু হল শরৎ, এর বর্ণ-সম্পদে নীল এবং শুভ্রের একাধিপত্য। অথচ এ শরৎ কবির মধ্য যৌবনের আলোকোজ্জ্বল আনন্দের ভাবানুষঙ্গে ধৃত নয়। বরঞ্চ বলা যেতে পারে এ শরৎ আসন্ন হেমন্তের ও শীতের নিঃসঙ্গ সমাপ্তির সূচক। তাই শরৎ এখানে শূন্যতা-বাচক। শরতের শূন্য আকাশ এখানে বর্ষণময় কীর্তিমান অতীতের স্মৃতি-বহ। যে অখণ্ড নৈঃসঙ্গ্যকে বারে বারে রবীন্দ্রনাথ নানা সম্পর্কে পূর্ণ করে তুলতে চেয়েছেন, যেটা তাঁর জীবন-সংগ্রামের একটা দিক, এবং যা তাঁর শিল্পপ্রয়াসেরও নেপথ্য-নিয়ামক, সে নৈঃসঙ্গ্য যেন "পূরবী"তে জীবন-সায়াহ্নের ম্লান ছায়ায় দুস্তর শূন্যতাকে আর বহন করতে অক্ষম। তবু "শূন্য শূন্য নয়/ব্যথাময়/অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন/একা একা সে অগ্নিতে/দীপ্ত গীতে/সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন"—এখানে কবির দৃঢ় অভিপ্রায়ের সোচ্চার ধ্বনি-গাম্ভীর্য সত্ত্বেও শূন্যতার নিঃসীমতাই আভাসিত। একদিকে শিল্পীর যন্ত্রণা, অন্যদিকে নৈঃসঙ্গ্যের বোধ আকর্ষণ করেছে শরৎ আকাশের নিঃসীম নীলিমাকে.

আর তারই অনুষঙ্গে ঘটেছে কাশ, শিউলি, শিশিরের ব্যবহার। এ বক্তব্যের সমর্থনে আর একদিকে রসিক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলে। দেখা যায় যে শূন্য শব্দের বিশেষ্য বিশেষণ উভয় ব্যবহার নানা ক্ষেত্রে ঘটেছে এই গ্রন্থে, আবার শূন্য শব্দের সমার্থক হীন, রিক্ত, হারা প্রভৃতির সাহায্যে গঠিত শব্দের আধিক্য "পূরবী"র বৈশিষ্ট্য। বৃষ্টিহারা, স্পর্শহারা, তৃপ্তিহীন, দীপ্তিহীন, রিক্ত বৃষ্টি প্রভৃতি শব্দের প্রতি পক্ষপাতিত্বে তৎকালীন কবিমানসের বিশেষ আবহাওয়ার পরিচয় মেলে। আরো লক্ষণীয় যে নদী, পাখি, ঝড় প্রমুখ রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রতীক ও রূপকেরা এখানে স্তিমিত। এখানে বিস্তৃতভাবে ছায়া ফেলেছে শুধু আকাশ। "পূরবী"র ভাবাকাশের প্রতিফলনগুলিকে বিশ্লেষণ করলে চেনা যায় তার অখণ্ড মহিমাকে।

॥ মৃত্যুবোধ ॥

বেজেছে ছুটির গান, সারা হয়ে এল দিন/শেষ রাগিণীর বীণ/ভয় নিত্য জেগে আছে/আসুক ঘুমের রাতি/ওই তার বেলা হল শেষ/মরণের কূলে/দিগন্তে মেঘের জালে বিজড়িত দিনান্তের মোহ/সময় যে হল অবসান/সন্ধ্যাবেলায় এ কোন খেলায়/সেদিন আমি আসব না তো/ কল্পনার শেষ রঙে সমাপ্তির ছবি/ফুরাক বেলা জীর্ণ খেলা হারাক হেলা-ফেলার ভীড়ে/কার পদধ্বনি? একি দূর মৃত্যুসিন্ধু পারে?

॥ নিঃসঙ্গ বোধ ॥

শূন্যকক্ষ/শূন্যের অকূলে/ শূন্যতার সাজাই নানা সাজে/শূন্য দিল ভরে/শূন্য শাখে/শূন্যে গেল ভেসে/ শূন্য তোমার অঙ্গনে/ শূন্যতার সীমাশূন্য ভাবে/ সঙ্গ শূন্য/শূন্য প্রাণের পাত্র/ শূন্যতার উপহাস/শূন্যময় আঁধার প্রান্তর/শূন্য এ প্রাঙ্গণ/শূন্যতরী/নামহারা/ তৃপ্তিহীন / দীপ্তিহীন/ রূপনিঃস্ব/মূর্তিহীন ব্যর্থতা/ শ্রীহীন/ভিত্তিহীন ঘর/ গীতহীনা/বাসাহারা।

॥ শিল্পীর যন্ত্রণা ॥

অকৃতার্থ আশা/অসিদ্ধ সাধনা/অসম্পূর্ণ পরিচয়/ অগীত সংগীত/অপূর্ণের রেখা / অধরা স্বপ্ন/ অবেলা/অসমাপ্ত পরিচয়/ অমূর্ত আঁধার/আলোর কাঙালী/অতৃপ্ত আশার ধূলিস্তূপ/অপূর্ণের যত দুঃখ/অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস/ অসমাপ্ত সংগীতের ডালি/অবিশ্বাসী ধূলি/ অব্যক্তের অস্থির গুঞ্জন/ অসম্পূর্ণ নৈবেদ্য/ যত অসম্মান / অচেনার মরীচিকা/অসম্পূর্ণ লেখা।

এবং এই আকাশেরই ভাবগত আকর্ষণে যে শরৎ প্রসঙ্গের অবতারণা—শেফালি, শিশির, শুভ্রমেঘ, এরা একদিকে যেমন স্মৃতির প্রতীক, অন্যদিকে তেমনি বিরতি বা মৃত্যুসূচক সমাপ্তির মনোভাব থেকে উৎসারিত। শূন্যতার সঙ্গে দ্বন্দ্বের মহত্তম কাব্য-রূপায়ণ ঘটেছে 'তপোভঙ্গ' এবং 'সাবিত্রী'তে। আমরা সাধারণত এ দুটি কবিতাকে তাঁর কবি-প্রত্যয়ের ব্যাখ্যাতা হিসাবে গ্রহণ করে থাকি। সে কাজের যথার্থতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কবির তৎকালীন জীবন-সংক্রান্ত অনুভূতির পটেই এ সময়ের বিশিষ্ট কবি-প্রত্যয়ের শেষ তাৎপর্য।

তথাপি "পূরবী"র প্রধান সুর বেদনার। এমন কি 'পঁচিশে বৈশাখে'র জন্ম দিবসেও প্রভাত বর্ণনায় অরণ্যের ম্লান ছায়ার বিস্তার, বিষণ্ণ ভৈরবীর আলাপ। অবশ্যই একে অতিক্রম করে প্রাণের কেন্দ্রে প্রকৃতির হাত ধরে ফিরে আসতে চাওয়াকে তিনি বনবাণীর 'নীলমণি লতা' কবিতায় ধারণ করেছেন। 'নীলমণি লতা' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির একটি। এই কবিতায় কল্পনা সুশৃংখলতার সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্যকে সার্থকভাবে মিলিয়ে নিতে পেরেছে বলেই এখানে রঙের অনুষঙ্গে মানবিক সম্পর্কের স্মৃতি-জাগরণ এত সংহতভাবে প্রকাশিত হতে পেরেছে। চাঁপার সোনার বর্ণে কার কণ্ঠস্বর, করবীর রক্তিমতায় কার কঙ্কণ-ঝঙ্কার—এবং শেষপর্যন্ত নীলমণি লতা কী প্রাণময় বিস্ময়ের বাণীবহ। চরম নৈঃশব্দ্যকে ভেঙে নীলমণি মঞ্জরী যেন বিশ্বের আনন্দোক্তি। এর লাবণ্যে স্নাত ক্লান্ত নিঃসঙ্গ কবি-আত্মা যেন আর একবার পুনরুজ্জীবন প্রয়াসী। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও আসন্ন মৃত্যুর কম্পমান ছায়া তখন রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে স্পর্শ করছে। অসামান্য জীবনপ্রীতির উপর অনিবার্য মৃত্যুর যবনিকা নেমে আসতে চাইছে, আর অন্যদিকে স্বদেশ ও বিশ্বের পরিস্থিতিতে ক্ষমতামত্ত প্রবলের অত্যাচার ও অবিচারের কৃষ্ণবর্ণ ছায়া ঘন হয়ে উঠেছে। অন্তর ও বাহিরের এই দুই ব্যাপার কবির সমগ্র মানসলোককে এমনভাবে বিধৃত করেছে যে কৃষ্ণবর্ণ হয়ে উঠল পরিশেষ কাব্যে স্থায়ী বর্ণ-প্রসঙ্গ। "পূরবী"র নৈঃসঙ্গ্যের নীলিমা একবার 'নীলমণি লতা'য় পুনরুজ্জীবনের সন্ধান করেই ধীরে ধীরে কালো হয়ে উঠল "পরিশেষ" কাব্যগ্রন্থে। ব্যক্তিজীবনের মৃত্যুবোধ এবং বিশ্বজীবনে মূল্যবোধের ভাঙনের আকর্ষণে কৃষ্ণবর্ণ ও তদনুষঙ্গোৎসারিত প্রসঙ্গগুলি লক্ষণীয় :—

॥ কৃষ্ণবর্ণ সূচক প্রসঙ্গ ॥

কালো গগন/নিশীথিনীর মৌন যবনিকা/নিবিড় রাত/ধূসর প্রহর/নিশীথের নৈঃশব্দ্যের পরে/দিশা-হারা নিশা/রাত্রি দীপালোক-হারা/অন্ধকার পথ/আলোক যেথা নিবিয়া আসে শঙ্কাতুর প্রাণে/মসী কৃষ্ণ বিঘ্ন পুঞ্জ/দুর্যোগ/অমাবস্যার কারা/কপট রাত্রি ছায়ে/তিমির সিন্ধু/গোধূলি অন্ধকারে/ যবনিকা / অবহেলার রাত/ব্যর্থ রাত/রজনী ঝঞ্ঝাহত/যবনিকা অন্তরালে / অন্তিম তিমিরে/রাত্রির নিঃসকৃষ্ণ শিলা বেদীমূল / নির্জন অন্ধকারে/তিমির রন্ধ্র/অবসাদ/আঁধার।

॥ তদনুষঙ্গ-সূচক প্রসঙ্গ ॥

অনিদ্রা/বাসরঘরে নিবালে দীপ/ব্যর্থ আত্ম-বিড়ম্বনা/নিদ্রায় আবিল/পঙ্গু সৃষ্টি/অন্ধমূক দুঃখ/পুঞ্জীভূত অনেক বোঝা/কতবার পরাভব/পথরোধী পাষাণ-সঞ্চয়/বাদুড়ের মত কালো বর্ণ/আবর্জনার অচল পুঞ্জ/সংশয় মোহ/ভাষা-হীন দিন/বিষাইছে বায়ু/দুঃস্বপ্নের তলে/কুৎসিত ছলনা/নিঃস্বজনের দুঃস্বপনেব/রুদ্ধ পাষাণ ভিত্তি/প্রতারণার ছুরি/আপন হানা অন্ধ মানুষেরে/দুর্ভাবনার প্রচণ্ড পীড়নে/জড়তার পাষাণপ্রাচীর/অচল শিলার স্তূপ/জনহীন পথ সংশয় মোহ রহে তর্জনী তুলে/বোবা মাটি/পোকা ধরা পাতা/কদর্যের কদাঘাত/কীটের দংশন/অনির্দিষ্ট শঙ্কাগুলি নিদ্রাহীন পেঁচা/কাল মেঘ লতা/নৈরাশ্যের অলীক অত্যুক্তি/বিছুটির ঝাড়/দুষ্ট গ্রহ সেজে ভয় কালো চিহ্নে মুখভঙ্গি করে/আতঙ্কের জঙ্গল/ভীরু কল্পনার যত জটিল কুটিল চিহ্নগুলো।

অথচ অন্ধকারকে চিরসত্যের স্বীকৃতি দিতে কবি পারেন না। অন্ধকারের মধ্যেই অন্ধকার থেকে উত্তীর্ণ হবার প্রয়াসে "পরিশেষ"-এ সৃজিত হয়েছে জপমালার চিত্রকল্প। যে "কল্পনা"য় দীপাবলী রচয়িতাকে কবি "পরিশেষ"-এ রূপময় করেছেন কল্পনার সেই টান গভীরে গিয়ে দুঃসহ রাত্রির প্রহর গণনার অনুষঙ্গে জপমালা, মন্ত্রজপ, বা মালাগাঁথার চিত্রকল্প সৃজন করেছে। আত্মস্থ দৃঢ়তায় রাত্রিকে অতিক্রম করে যেতে হবে—এই কল্পনার সংহত আকারে (রাত্রিজপমালা—অঙ্গুলি—আলোক) একটি দৃঢ়বদ্ধ চিত্রকল্পমালার সৃষ্টি হয়েছে "পরিশেষ"-এ। যদিও এর ইঙ্গিত "কল্পনা"র 'দুঃসময়' কবিতায় পাওয়া গিয়েছে, তথাপি "পরিশেষ"-এ একে লাভ করা গেল আরো পরিণত রূপে। কবিকল্পনার এই বিশেষ রূপটি অনুধাবনীয় :—

(ক) যে বিরাট গূঢ় অনুভবে
রজনীর অঙ্গুলীতে অক্ষমালা ফিরিছে নীরবে
আলোক বন্দনা মন্ত্রজপে… ।

(খ) আমার রুদ্রের
মালা রুদ্রাক্ষের
অন্তিম গ্রন্থিতে এসে ঠেকে
রৌদ্রদগ্ধ দিনগুলি গেঁথে একে একে ।

(গ) পড়ে চন্দ্রালোক রেখা জননীর অঙ্গুলির মত ,
কৃষ্ণরাতে তারা যত
জপ করে ধ্যানমন্ত্র ; অস্তসূর্য রক্তিম উত্তরী
বুলাইয়া চলে যায় ।

(ঘ) ব্যর্থরাতের অশ্রু ফোঁটার মালা
আজ তোমার ঐ বক্ষে ঝলকিছে ।

(ঙ) সন্ধ্যাবেলা
মল্লিকার মালা ছিল গলে
গন্ধ তার ক্ষীণ হয়ে
বাতাসকে করুণ করেছে—
উৎসব শেষের যেন অবসন্ন অঙ্গুলির
বীণাগুঞ্জরণ ।

(চ) নির্জন অন্ধকারে
ফুটে ওঠে ছন্দে গাঁথা সুরে ভরা বাণী ।

(ছ) তারাময়ী রাতি
দেয় তার বরমাল্য গাঁথি ।

উদ্ধৃতিগুলি গ্রন্থের কবিতাগুলির স্থানানুক্রম হিসাবে গৃহীত। দেখা যাবে যে অন্ধকার>মালা>অঙ্গুলি>আলোক এই সূত্রে ধৃত প্রথম প্রধান চিত্রকল্পমালাটি কবিকল্পনার ক্রিয়ায় রাত্রি প্রসঙ্গে নানাভাবে কার্যকরী হয়েছে। তাই কখনও মালা গাঁথার কথা, কখনও বীণায় অঙ্গুলি সঞ্চরণ। অনুরূপভাবেই এই যুগে ব্যবহৃত 'খেলাঘর' 'রেলগাড়ী' প্রভৃতি রূপকের, প্রতীকের ব্যাখ্যা করা চলে। দূর ঘণ্টাধ্বনিও কবিচিত্তে সৃজন করেছে সেই আসন্ন বিশ্ববিচ্ছেদের ভবানুষঙ্গ ।

॥ চার ॥

সমুদয় শিল্পসৃষ্টির ন্যায় কবি-কল্পনাও যতক্ষণ না পূর্ণতার ভাব বহনে সক্ষম ততক্ষণ তার মুক্তি নেই। শ্রেষ্ঠ কবিকর্মের ইতিবৃত্তে এই সাক্ষ্যই বিদ্যমান। সেই কারণে কল্পনার অখণ্ড স্বরূপকেই আমরা খুঁজি সার্থকশিল্পে। এবং যখন চিত্রকল্পকে অনুধাবন করতে চাই তখনও সেই অখণ্ড স্বরূপেরই সন্ধান চলে কাব্যরসের তাগিদে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে "সোনার তরী" থেকে "ক্ষণিকা" কবিকল্পনার প্রস্তুতি, "বলাকা" থেকে "পরিশেষ"-এ সেই প্রস্তুতির দিব্য পরিণাম। "ক্ষণিকা"র পূর্বপর্যন্ত এবং "ক্ষণিকা"র পরেও রবীন্দ্রনাথ রূপকে কথা বলতে ভালোবাসতেন। "ক্ষণিকা"য় তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি এসেছে কবিকল্পনার মুক্তির ফলে। এই মুক্তি রবীন্দ্রনাথের কাছে বৃহত্তর সার্থকতার ফসল বয়ে এনেছিল "বলাকা-পূরবী"র কালে, তা আমরা পূর্বে বলেছি। কিন্তু "সোনার তরী" এবং "খেয়া"য় রবীন্দ্রনাথের রূপক কবিতাগুলির নিটোল পরিপূর্ণতা সদাসর্বদা স্মরণীয়। এই রূপকের দেহাধারে প্রত্যক্ষ জীবন যখন রক্তমাংস যোগায় নি তখনও কল্পনার স্বচ্ছন্দ আচরণে কেমন রসানন্দের উৎস সৃজিত হয়েছে তার প্রমাণ হিসাবে সদাই "শুভক্ষণ" ক', তাটি স্মরণীয়। "বলাকা"-"পরিশেষ" পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা জীবনের সমগ্রানুভূতিকে রূপান্বিত করতে চেয়েছে। কল্পনার ন্যায়কে অনুসরণ করে স্মৃতি, আবেগের সহযোগিতার সৃজন এইখানে কবির লক্ষ্য। কবির ভাবনায় এখানে মননের দীপালোক।

সম্ভবত সে কারণেই "বলাকা"-"পূরবী"তে রবীন্দ্রনাথের প্রবণতা প্রধাণত ছিল বড় কবিতার দিকে। কবিজীবনের প্রথম অধ্যায়ে প্রায় বড় কবিতাই অসংহতির দুভাগ্য বহন করেছে। 'মানস সুন্দরী', 'যেতে নাহি দিব' প্রভৃতি কবিতাগুলি তার নিদর্শন। অপেক্ষাকৃত ছোট কবিতায় রূপকের আধারেই কবিকল্পনা সংহত হয়েছে বেশী। কিন্তু "বলাকা"-"পুরবী"তে দীর্ঘ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সুসংহত। একমাত্র "পরিশেষ" কাব্যগ্রন্থের 'প্রশ্ন' কবিতা ব্যতীত ঘনবদ্ধ ছোট কবিতার নাম এ যুগে দুর্লভ। ভাবনার বিস্তৃত গভীরতার টানে কল্পনার শৃংখলা ক্লাসিক দৃঢ়তাকে অঙ্গীভূত করেছে। 'তপোভঙ্গ', 'সাবিত্রী', 'আহ্বান' কবিতার সৌন্দর্যে তারই সাক্ষ্য। এই তিনটি কবিতায় চিত্রকল্পের পশ্চাদ্‌বর্তী কবি-আত্মার উজ্জ্বল-উপস্থিতি চিত্রকল্পগুলির মধ্যে এনেছে অখণ্ডের ব্যঞ্জনা। "কল্পনা" কাব্য-গ্রন্থে যে ধ্বনি সম্পাদনের জন্য রবীন্দ্রনাথকে মনে হয়েছে

অধমর্ণ "বলাকা"-"পূরবী"তে তা হয়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের কবিকণ্ঠ। কল্পনাকে নিয়ন্ত্রিত করার যে কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে মহৎ কবির মর্যাদা লাভ সম্ভব নয়, সে অগ্নিপরীক্ষায় কবি এখানে উত্তীর্ণ। তার প্রমাণ হিসাবে এ যুগের চিত্রকল্পের একটি প্রধান ধর্মের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলে। এ যুগে যেমন ছোট কবিতার প্রধান্য নেই তেমনি একেবারে প্রত্যক্ষ রূপক কবিতারও আধিক্য নেই। কিন্তু রূপক কবিতার শিক্ষা এক হিসাবে এ যুগে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী হয়েছে। কাব্যের দেহাধারকে কাব্যের বিষয়পরিস্থিতির জলবায়ুতে পুষ্ট করে তোলার কবির দক্ষতা চিরস্মরণীয়। সেই দক্ষতায় এযুগের সুদীর্ঘ কবিতাগুলির বিস্তৃত চিত্রকল্পরাজি সুকল্পিত ও সুপ্রকাশিত হতে পেরেছে। প্রথম যুগের বড় কবিতাগুলির অসংহতির কারণ—চিত্রকল্পের দৈন্য। দুইভাবে এই দৈন্য কাব্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এক চিত্রকল্পের অভাব, নতুবা, অসংখ্য ছোট ছোট চিত্রকল্পের সমাবেশের প্রয়াস। বড় কবিতার পক্ষে এই দুইই ক্ষতিকর। "বলাকা"-"পূরবী"র কালে দীর্ঘ কবিতায় কবির রচিত বিস্তৃত ছবিগুলি কাব্যের আত্মার প্রকৃত ধারক। 'চঞ্চলা' কবিতায় অভিসারিকার চিত্রকল্প, 'তপোভঙ্গ' কবিতায় কালের রাখালের কল্পনা, 'সাবিত্রী' কবিতার শেষ দুই স্তবকে বিধৃত একটি চিত্র, 'আহ্বান' কবিতায় তিনটি স্তবক বিস্তৃত নিশাবসানের চিত্রকল্পকে তার প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা চলে। জাতির আবহমান কালের স্মৃতি-ধৃত অভিজ্ঞতা-গুলিকে কবি বিষয়নিষ্ঠের মতো অনুভব করেছেন এবং স্বীয় কাব্য-ধর্মে দীক্ষিত করেছেন এই সমস্ত ক্ষেত্রে। ফলে পূর্ণাঙ্গ কল্পনার অখণ্ড স্বরূপের সংস্পর্শে এসে আমাদের রসতৃপ্তিরও পূর্ণতা ঘটে। পূর্ণের জন্য পিপাসা মানবমনের স্বভাবসিদ্ধতা চরিতার্থ হয়।

কল্পনাশক্তির সাধর্ম্যে রবীন্দ্রনাথ যে কোনো মহৎ কবির আত্মীয়। নিয়ত অনুধ্যান এবং সতত প্রয়াসে তিনি একদিকে যেমন কল্পনাকে নিয়ে গিয়েছিলেন শুদ্ধ পরিণতিতে, তেমনি তাঁর অনন্য একমুখিতায় কল্পনার দিব্য আলোকে কাব্যের বিষয়ের আত্মাও কখনও হারিয়ে ফেলে নি জীবনের দেহাধার। তিনি যখন ঐতিহ্যকে ব্যবহার করেছেন তখনও তার রূপান্তরণে কল্পনার সেই শক্তিই সক্রিয় ছিল। তিনি ঐতিহ্যকে ব্যবহারের ভিতরে কবি-অহমিকার তৃপ্তি খোঁজেন নি। তিনি তার অন্তর্নির্যাসকে আত্মস্থ করেছিলেন জীবনব্যাখ্যার নিজস্ব সুবিস্তৃত পটে। কাব্যের উপলক্ষ্য এইভাবেই দীর্ঘ অন্বেষণে তাঁর

কাছে কাব্যের বিষয় হয়ে উঠেছিল। এবং কল্পনার এই দৃঢ় শৃংখলাকে তিনি কোথাও থেকে অনুকরণ করেন নি। এ বিষয় কেউ তাঁর প্রভাবক নন। নিজ ব্যক্তিজীবনের যন্ত্রণাময় দ্বন্দ্বের পথে অসাধারণ পথিক তা চলতে চলতেই আয়ত্ত করেছেন।

তাঁর আখ্যানজাতীয় কবিতাগুলিতেও—কথা-কাহিনীর পর্যায়ে এবং গদ্যছন্দের পর্যায়ে—এই কল্পনার দৃঢ় শৃংখলার উপস্থিতি। 'দেবতার গ্রাসের' বর্ণিত ঘটনার মধ্যে যে হীনতা তাকে প্রস্ফুট করার আকর্ষণেই বারবার সাপের চিত্রকল্প, মহৎকে হেয় করার চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছে। 'কর্ণ ও কুন্তি'তে আলোক ও অন্ধকারের, বা অবগুণ্ঠনের, বা জমাট তুষার বিগলিত হবার চিত্রকল্পে কেন্দ্রীয় ভাবের উপযুক্ত ছায়া। এই একই ভাবগৌরবে "পুনশ্চ"র 'বাঁশী' কবিতার চিত্রকল্পের মূল্য। 'শিশুতীর্থের'ও সার্থকতা।

"বলাকা" থেকে "পূরবী"-"পরিশেষ"-এ কবিকল্পনার পূর্ণ পরিণত অবস্থায় ধীরে ধীরে যে নানা টানাপোড়েন প্রভাব বিস্তার করছিল—কিছু তার ব্যক্তিগত কিছু তার বিশ্বগত—তার প্রমাণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল পরিশেষ-এর নানা ধরনের কবিতাগুলির মধ্যে। 'প্রশ্ন' যেমন বৃহত্তর জীবনের যন্ত্রণায় বলিষ্ঠ, 'আতঙ্ক' তেমনি ব্যক্তিগত শঙ্কায় পিঙ্গল। এই নানা টানাপোড়েন থেকে কবি পৌছেছেন "পুনশ্চ"র গদ্যছন্দের প্রবর্তনায়। হয়তো প্রচণ্ড দুর্ভাবনার দায় এড়ানোর জন্যই তাঁর এই শিল্পলীলা। কেননা অনুরূপভাবেই একদিন জন্মলাভ করেছিল "লিপিকা"। কিন্তু আশ্চর্য "লিপিকা" এবং "পুনশ্চ" উভয়ক্ষেত্রেই কবির দুভাবনার কোনো স্পর্শ নেই। ঐতিহাসিক কারণে এই শিল্প-নিরীক্ষা যত মুল্যবানই হোক রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্পচারিতা "পুনশ্চ"এ 'শেষসপ্তক'-এ স্তিমিত। প্রথম জীবনে নিজের ভাষার প্রেমে পড়েছিলেন কবি, শেষ জীবনে নিজের ছন্দের। পল্লবতা দুই ক্ষেত্রেই চিত্রলতার ক্ষতি করেছে। বিস্তৃত বিষয়ের স্থান সঙ্কুলানের তাগিদে এর জন্ম হলে কোপাইয়ের গৃহপালিত রূপে তার প্রতীক খুঁজতে হত না। অথচ লক্ষণীয় যে যেখানেই রবীন্দ্রনাথ এই নতুন পর্যাযে কল্পনার সাড়া পেয়েছেন সেখানেই গদ্যের ছন্দ অপেক্ষা শব্দের ধ্বনিকেই তিনি সম্বল করেছেন। 'শিশুতীর্থ', 'আফ্রিকা' তার প্রমাণ। সে কারণেই একেবারে শেষে যখন অন্তরের সুরে কথা কইতে হয়েছে—'জন্মদিন', 'আরোগ্য','শেষলেখা'য়—তখন তিনি আবার ফিরে গেছেন তাঁর নিজস্ব জগতে। অবশ্য এযুগের কাব্য প্রয়াস একেবারেই নিরলঙ্কার। এখানে আছে শুধু শান্ত

আত্মসমর্পণের আবেগ। বিশ্বের সমস্ত পরমকে বিশ্বাস করে চরমের জন্য প্রস্তুতি। যে কবিপুরুষ বাংলা সাহিত্যে টেকনিকের রাজা, জীবনকে খুঁজতে খুঁজতে মৃত্যুসিন্ধুর তীরে এসে তিনি সমস্ত অঙ্গাভরণ পরিহার করেছেন। রিক্ততাই তখন হল বাঙ্ময়। রাজা এতদিনে হলেন ঋষি।

বৎসর বৎসর চলে গেল।
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিম সাগর তীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়
কে তুমি ?
পেল না উত্তর॥

—এর যা কিছু মূল্য তা সেই অমেয় জীবনলীলার ভাবানুষঙ্গে।

আমরা বর্তমান প্রবন্ধে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে কেমনভাবে সমগ্র জীবনে অভিজ্ঞতার মূল্যবোধের প্রেরণায় কল্পনার দ্ব্যর্থহীন ভাষাকে তিনি সন্ধান করেছেন ও পেয়েছেন; কেমনভাবে এক এক যুগের কবি-কীর্তিতে কেন্দ্রীয় কল্পনার বিশিষ্ট আচরণ কবিকে পর্যায়ান্তরে উন্নীত করেছে। তাই আধুনিক বাংলা কাব্যেরও অক্লান্ত শিল্প-কর্মিষ্ঠ অংশে বিস্তৃত জীবনের গভীরতাকে কল্পনায় সংহত করার উত্তরাধিকার। চিত্রল-মুগ্ধতায় সে সুখী হবে হয়তো, কিন্তু বিস্তৃতির সংহতি ব্যতীত তার মুক্তি নেই। রবীন্দ্রনাথই এই দুরূহ কর্তব্যভার প্রথম বহন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রকরণগত অভিনবত্ব সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্য আজও রবীন্দ্র-কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে বিশ্বপটভূমিতে দুটি মূল্যবান দশক অতিক্রান্ত; আণবিক ও জীবাণু বোমাব আতঙ্কে সভ্যতাব সংকট ঘনীভূত, বৃহৎ শক্তিদের সমন্বয়ীকরণ প্রহসনে পবিণত। অন্যদিকে মানুষেব শুভবুদ্ধিব তাগিদে সহাবস্থান নীতির উদ্ভাবনা, অন্যাযেব প্রতিপক্ষরূপে মূক জনতাব জাগরণ, শান্তির সংগ্রামে যুদ্ধদানব সন্ত্রস্ত। এই কালান্তবেব সন্ধিদশা ববীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ কবে যান নি। এতদিনে তাই সত্যসন্ধানী মানবাত্মাব জিজ্ঞাসা, পাপ-পুণ্যের নবতব সমীক্ষা শিল্পে প্রত্যাশিত ছিল। সমাজ-শক্তি ও ব্যক্তি-চৈতন্যের প্রতিফলন উপন্যাসেই অনুকূল ক্ষেত্র লাভ কবে। কারণ উপন্যাসই বিশ শতকেব মহাকাব্য। বাংলা সাহিত্যেব আলোচনায বামমোহন থেকে রবীন্দ্র-নাথ পর্যন্ত গৌববময ঐতিহ্যেব স্বীকৃতি প্রায কিংবদন্তীতে দাড়িযে গেলেও বাঙালীব শতাব্দীব্যাপী মানসিক আ'লোড়ন-বিলোড়ন, বিবর্তমান চিৎপ্রকর্ষেব পবিচয বাংলা উপন্যাসে প্রায অনুপস্থিত। কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'ই এক্ষেত্রে একমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ভাবতীয মহাবিদ্রোহেব সদ্যনির্বাপিত চিতাধূম থেকে যে বহ্নিকণার বিস্তার, 'গোবা'র বিনয়—গোরা-আনন্দময়ী- সুচরিতার কাহিনী সেই প্রাণবহ্নির বিচিত্র বর্ণসৌষ্ঠবেব অভিব্যক্তি।

ইদানীংকালের চেতনাপ্রবাহমূলক গল্প, জটিল জীবনযাত্রার ভগ্ন অসম্পূর্ণ-ছবি, মনের গহনে নানা নিরীক্ষা রবীন্দ্রনাথের ল্যাবরেটরি-সঞ্জাত প্রেরণা নয, তার চেযে কালবিচারে প্রাগ্রসর। অবশ্য উপন্যাসের রাজসভায এখন বর্ণসাংকর্যও কৌলীন্যের মর্যাদা পাচ্ছে। সেদিকেও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস অগ্রনায়ক। কাব্য, উপন্যাস, কথকতা, চমৎকার অলংকারদীপ্ত বর্ণনাকে তিনি ব্রহ্মা-প্রজাপতিব মতো মিলিযেছেন।

কাব্যপ্রবাহ রবীন্দ্রনাথের সযত্ন প্রয়াসের সৃষ্টি। যেহেতু তাঁর শ্রেষ্ঠ সাধনার ফল কাব্য, তাই সেক্ষেত্রে ভাব, ভাষা, চিন্তা, কল্পনার অপূর্ব মূর্তি রচনায় যত অভিনিবেশ অনুশীলন করেছেন, উপন্যাসে তার মাত্রা অল্প পরিমাণেও ধারাবাহিক রক্ষিত হয় নি। অথচ, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, দেশপ্রেম মনুষ্যত্ববোধ প্রভৃতি সমস্যায় বারেবারে তাঁর চিত্ত আন্দোলিত হয়েছে, কারণ মূলত তিনি কবি সার্বভৌম হলেও অত্যন্ত প্রখর সদাজাগ্রত মানসিকতা ও বীক্ষণশীল হৃদয়ের অধিকারী—কখনো তাঁকে নিছক অন্তর্বৃত দেখা যায় নি। তাই সামাজিক রাষ্ট্রিক আন্তর্জাতিক বহু বিষয়েই কখনো তাঁর উপদেশ, কখনো বা বিক্ষুব্ধ ভাষণ শোনা গেছে। প্রবন্ধাদিতে এবং ভাষণে কবির সচল সচিন্ত্য সক্রিয় চিত্তশক্তির বেগ অনুভব করা যায়। তাঁর উপন্যাসগুলিও সেই প্রবর্তনার সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ নামক মানুষটির সামাজিক ব্যক্তিরূপ এই সব রচনায় আপনাকে অভিব্যক্ত করেছে। একদিকে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য-আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে ঔপনিষদিক দীক্ষায় কবি রবীন্দ্রনাথ সামাজিক সত্তার বাস্তব চেহারা ক্ষণে ক্ষণে হারিয়ে ফেলেছেন। শেকস্‌পীয়রীয় Vivacity রবীন্দ্রকাব্যে অনুপস্থিত, তার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় উপন্যাস ক্ষেত্রেই আলোচ্য। কলা-কৈবল্যবাদী রবীন্দ্রনাথ শিল্পের লক্ষ্য রূপে পরনির্বৃতি বা আনন্দতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। সাহিত্য কোনোদিন প্রয়োজনের দরখাস্ত হাতে নিয়ে পাঠকের কাছে ধরনা দেবে না। "গল্পের মধ্যে যাদের থিসিস পড়ার রোগ আছে, আমি বলব সাহিত্যের কমলবনে তারা মত্তহস্তী।" দিলীপকুমার রায়কে লিখিত এক পত্রে উপন্যাসের সমস্যামূলকর্তা সম্পর্কে তাঁর বিরূপ মন্তব্য সেই অপ্রয়োজনের আনন্দলোকের পক্ষেই ওকালতি। ('বিচিত্রা'-বৈশাখ ১৩২৬) কিন্তু আগ্রহী পাঠক রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে সমাজ-সমস্যার উচিত মর্যাদা দেখে আশান্বিত হবে ; তাঁর অভিমত কেন তাঁর সৃষ্টিকর্মে খণ্ডিত হল, সে প্রশ্ন অবান্তর।

বরং আকাঙ্ক্ষা ও শিল্পরূপের বৈপরীত্যেই লেখকের সত্য প্রকৃতি ধরা পড়ে।[১]

রবীন্দ্রনাথ বরাবর নাটক উপন্যাসকে কাব্যের পথে চালাতে চেয়েছিলেন ; অন্তত চেয়েছিলেন কবি-কল্পনার প্রচ্ছায়ে উপন্যাসের চরিত্র বেড়ে উঠুক, নাট্যসংঘাত ভাবমুখ্য হোক। নাটকের রূপক দ্যোতনা, প্রতীক-সংকেতের মতো উপন্যাসেও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা সংকলন, মনোবিশ্লেষণের ধারাবাহিক পথ ছেড়ে শুধু গতিচিহ্নের উপরে আলোকসম্পাত তাঁর 'চতুরঙ্গ' 'চার অধ্যায়' 'মালঞ্চ' প্রভৃতি দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসগুলিতে প্রস্ফুট। 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের

ক্ষেত্রে কবিকল্পনার অতিরেকী আত্মঘোষণার দৃষ্টান্ত। বহু কাজ, বক্তৃতা, কাব্য, নাটক, অভিনয়, শিক্ষকতা ইত্যাদির ফাঁকে ফাঁকে তিনি উপন্যাস লিখেছেন ; ছোটগল্প, কবিতা বা কাব্যনাট্যের মতো এক অধিবেশনে লেখার বস্তু উপন্যাস নয়। অথচ তাঁর সৃষ্টিকর্মব্যস্ত জীবনে ঔপন্যাসিকের অখণ্ড অবকাশ, ধীরে ধীরে ঘটনার পাকে পাকে চরিত্রকে জড়িয়ে ফেলা এবং পরে তার গ্রন্থিমোচন সম্ভব হয় নি। যৌবনে মনস্তত্ত্বপ্রধান, সমস্যামূলক উপন্যাসে অনাসক্তি জানালেও তাঁর ঔপন্যাসিক পরিণতি সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির বহুমুখী আত্মপ্রকাশে। 'চোখের বালি', 'গোরা', 'যোগাযোগ' এ-বিষয়ে রবীন্দ্র-উপন্যাসের সীমান্তনির্ণয়ী, বৃহত্তর অর্থে এগুলি বাংলা উপন্যাসেব ধাবাতেই ল্যাণ্ডমার্ক। সন্ততিধারা যেমন জনযিতারই অন্যতব পরিচয, পববর্তী বাংলা উপন্যাসের বহু রচনাতেও তেমনি রবীন্দ্রনাথ প্রচ্ছন্ন আছেন। একজন মহাকবি এতবড ঔপন্যাসিকের মননশীলতা, সম্ভাবনা নিয়ে জন্মেছিলেন দেখে 'শতবর্ষ পরে'র পাঠকসমাজ অবাক হবে। কিন্তু রবীন্দ্র-ঘনিষ্ঠকালের মানুয আমরা জানি, তিনি প্রাচীন এবং উনিশ শতকীয় জীবনবোধের আলোকে ঐতিহ্যের পটে ব্যক্তিকে দেখার নিরলস সাধনা করেছিলেন, তাই দেশকালের সঙ্গে ব্যক্তির বিচিত্র সংঘাত, আত্মিক সম্পর্ক এত সহজে অঙ্গীকার করতে পেরেছেন।

কার্ল মার্কস নাকি বলেছিলেন, মেযেদের প্রতি মনোভাবেই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ চেনা যায়। রবীন্দ্র-উপন্যাসের বিচাবে মার্কসেব এই মনোভাব মানদণ্ড হলে তাঁর ঔপন্যাসিক কৃতিত্ব অসাধারণ। 'গল্পগুচ্ছ'-এ নির্মম সাহিত্য নেহাত প্রাসঙ্গিক এবং সাময়িক। তবু 'নষ্টনীড'-এর সঙ্গে 'চোখেব বালির' আত্মিক সংযোগটি অচ্ছেদ্য। 'রাজর্ষি' 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' বঙ্কিমী রোমান্স কুহেলিকার আস্তরণ ভেদ করতে পাবে নি। 'কডি ও কোমল' থেকে যেমন তাঁর কাব্যভূসংস্থানে ডাঙ্গা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে অথচ তার পূর্বেও রবীন্দ্রনাথ কাব্যনাটক লিখেছেন ; তেমনি 'চোখের বালি' থেকেই ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথেব আত্মপ্রতিষ্ঠা। যদিও ভিক্টোরীয পর্বের ইংরেজী উপন্যাসের মতো মনস্তত্ত্ব উদ্ঘাটনে পত্র-মাধ্যমের ব্যবহার 'চোখের বালির' ত্রুটি, তবু ভিক্টোরীয যুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালী সাহিত্যিক এবং পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্রকে 'চোখের বালিতে'ই তিনি অতিক্রম করে গেছেন। ঘটনাব অতিপ্রাকৃত অলৌকিক বিস্তার, সন্ন্যাসীমোহ, মন্ত্রবল, ত্রিশূল প্রভৃতির দৈবনির্বন্ধ থেকে একেবারে প্রখর বাস্তবের দিবালোকে এসে পডি। এখানে সমাজশক্তি উগ্র নয়, মানবিক

মোহ দুর্বলতা হৃদয়াবেগ সব কিছুই ব্যক্তির বিশেষ প্রবণতাজাত। ঘটনাবর্তে ব্যক্তি অসহায় ক্রীড়নক নয়, মহেন্দ্র-বিনোদিনী আশা-বিহারীর চিত্ত-সংঘাতই প্রধান। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন "সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে, ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো"। "এ যুগের কারখানা-ঘরে" রবীন্দ্রনাথ প্রথম যে গল্প গড়ে তুললেন তার মধ্যে অনূঢ়, বিবাহিত ও বিধবা তিনটি নরনারী প্রেমের তীব্র আলোকে নিজেদের আন্তরসত্তার মুখোমুখি হয়েছেন। খেলাচ্ছলে অভিনয় দিয়ে যার সূচনা, গভীর জীবনজিজ্ঞাসার দাহনে তার পরিণতি। 'চোখের বালিতে' পুরুষের সমগ্র রূপ নেই, কিন্তু আশা-বিনোদিনী-রাজলক্ষ্মী-অন্নপূর্ণা মিলে নারীসত্তার বিচিত্র স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছে। উনিশ শতকের সমাজপ্রগতি বহুমুখী সংস্কার প্রয়াসে আত্মপ্রকাশ করলেও নারীমুক্তি-আন্দোলনই সবচেয়ে উল্লেখ্য। রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর-দ্বারকানাথ পর্যন্ত শিক্ষা-সমাজ-কর্ম সংস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাকামী। তারই সারস্বত ফলশ্রুতি বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথের নারী-প্রশস্তি এবং মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' তারই কাব্যগত স্বীকৃতির চূড়ান্ত সিদ্ধি। উপন্যাসে সেই নারীপ্রগতির দ্বিধান্বিত সমর্থন বঙ্কিমের উপন্যাসে। সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে ব্যক্তিমানসের দ্বন্দ্ব, অবশ্যম্ভাবী সংঘাত বঙ্কিমের উপন্যাসেই প্রথম চিত্রিত। সমাজপ্রবাহের প্রগতিচিন্তার চিহ্ন ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতো আচারবান নৈষ্ঠিক প্রাবন্ধিকের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়েও' সনাতন প্রত্যয়ের জাল ছিন্ন করেছে। 'বিষবৃক্ষ'-উত্তর উপন্যাসে বঙ্কিমের পশ্চাদ্‌গতি লক্ষণীয়, ক্রমশ তাঁর শিল্পীমানসের রক্ষণশীলতায় বিবেকী পাঠক ক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, পিতা-পিতৃব্যের জীবনে যে সংস্কারমুক্ত জীবনাদর্শের পরিচয় পেয়েছিলেন, তাতে কৈশোর বয়সেও রক্ষণ-শীলতা তাঁর মনে জড় গাড়তে পারে নি।

॥ এক ॥

"আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করিনি" : রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি নিছক সত্যভাষণ। তাই 'চোখের বালি' প্রথম পর্বের উপন্যাস হলেও নারীর ব্যক্তি-সত্তা, প্রেম ও বিধবা-বিবাহের সমস্যা প্রথামুক্ত দৃষ্টিতে অঙ্কিত হয়েছে।

জন্মসূত্রে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নব প্রতিষ্ঠিত সামন্তবর্গেরই সন্তান। তবু টলস্টয়ের মতো উদার মানবিক বোধ এবং গভীর ভালোবাসার ধর্মেই তিনি উদীয়মান বুর্জোয়া সমাজের অগ্রনায়ক হতে পেরেছেন। বলা বাহুল্য, এ বুর্জোয়া ভাবাদর্শ সাহিত্য-সংস্কৃতির উপরিতলেই বিচায। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে একান্নবর্তী পরিবারের (বিষবৃক্ষ) এবং পরিবারভঙ্গের (কৃষ্ণকান্তের উইল) ছবি এঁকেছেন। সেখানে নারীর প্রেম যোগবলে পাত্র বদলায়, প্রায়শ্চিত্তে অবৈধ প্রেমের গ্লানি-মুক্তি ঘটে, বিধবা ভালোবেসে অত্যাসক্ত হয়, ব্যাপিকা বোধে তার চরম অধঃপতন। বিনোদিনীর সন্ন্যাসদশা ভীরু লেখনীর আপতিক সমাধানমাত্র; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোনো নায়িকা স্বপ্নঘোরে মনশ্চক্ষে দেখে নি—সে রক্তসমুদ্রে সাঁতার দিচ্ছে এবং অস্থিকুম্ভীর তাকে গ্রাস করতে উদ্যত। কারণ রবীন্দ্রনাথের আমলে ব্যক্তির স্বতন্ত্র মূল্য অনেকখানি স্বীকৃত। তখন গোষ্ঠীচেতনার যূপকাষ্ঠে নীরব আত্মদানের মুহূর্ত বিগত। তাই বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে অথচ তাঁর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহ করে 'চোখের বালি'র আবিভাব। অবৈধ প্রেম, বিধবার প্রেম গৃহত্যাগ সব কিছুই এর অন্তর্গত। অথচ নারীর প্রতি যে শ্রদ্ধাসমুন্নত দৃষ্টি রবীন্দ্রকাব্যে বর্তমান, তার মহিমা উপন্যাসেও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এখানেই রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিমানসের গভীরে অবগাহন করেছেন। বিনোদিনী দরিদ্র, পিতৃহীনা কিন্তু সর্বগুণসম্পন্না নারী। যার জৈব ও মানবিক সব ধর্ম সমান সক্রিয়, স্বাভাবিক বিকাশক্ষেত্র না পেলে তার বিকারও স্বাভাবিক। সুতরাং সামাজিক বিচারে তখন আর তাকে 'গুণ' বলা চলে না; তবু সেই বাস্তব, সত্য, স্বাভাবিক। "কিন্তু শিখা একভাবে ঘরের প্রদীপরূপে জ্বলে, আর একভাবে ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয়।" বিনোদিনী উপন্যাসের প্রথমার্ধে মহেন্দ্র-আশার সংসারে আগুন ধরিয়েছে। মহেন্দ্র-বিহারী দুজনেই যার কুশলকামনায় অতন্দ্র, যার প্রেমে মহেন্দ্র অত্যন্ত মগ্ন, সে তো বিনোদিনীর কাছে নিতান্ত 'কচি খুকী, খেলার পুতুল'। আশাকে সে ভালোবাসে, কিন্তু নিজেকেও অবজ্ঞা করে না। জীবনপাত্র পূর্ণ করে নেবার সকল সাধ্য যোগ্যতা তার আছে। অথচ সংসার তাকে বঞ্চনা করেছে চরম। সে কর্মিনী, সুগৃহিণী, সেবা-সূচীনিপুণা, কিন্তু তার প্রকাশ্য পরিচয় 'বিপিনের বউ'। বিপিনের প্রতি বিন্দুমাত্র কটাক্ষ নেই উপন্যাসে। বরং যে গুণবান রূপবান বিত্তবান যোগ্য নবযুবকের দল সংসারে সুপুত্র নামে চলে, তাদের প্রতি ঔপন্যাসিকের তথা বিনোদিনীর বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। বিহারী এবং মহেন্দ্র উভয়েই তাকে সময়বিশেষে

'মর্ত্যবাসিনী দেবী' বলেছে। কিন্তু বিনোদিনী সে উচ্চাসনের নির্বাসন চায় নি। সে চিত্রাঙ্গদার মতো পুরুষের পাশে নারীর যোগ্য সম্মানটুকু চেয়েছে। সেইটুকু না পেয়েই শিখা ঈর্ষারূপে, প্রতিহিংসারূপে জ্বলে উঠেছে। বিহারী গুণী, বিবেচক, সংযমী পুরুষ। কিন্তু বন্ধু মহেন্দ্র ও একদা সম্ভাবিত স্ত্রী আশার ভালোমন্দ বিবেচনা ছাড়া তার ব্যক্তিত্বের কোনো বিকাশ ঘটে নি। পরোপকারী দায়িত্ববান এই বিহারীই বিনোদিনীর আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ। কিন্তু সে তাকে প্রথমে কোনো মূল্য দেয় নি, বরং সন্দেহের চোখে দেখেছে। তবু "বিহারী এটুকু বুঝিয়াছে, এ নারী জঙ্গলে ফেলিয়া রাখিবার নহে।" বারাসতের বাড়িতে বিনোদিনীর গুণমুগ্ধ সেবাতৃপ্ত বিহারী তার অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করে নি, 'পল্লীগ্রামের প্রচলিত আতিথ্যের' সঙ্গে পার্থক্যের মাধুর্যটুকু অবশ্যই তার ভালো লেগেছিল, কিন্তু তখনো তার চিত্তে প্রেমের অভিষেক হয় নি। আশা, মহেন্দ্র এবং তাদের দাম্পত্য জীবনের আলেখ্য বিষয়ে বিনোদিনীর কৌতূহল তার অবদমিত আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ। ব্যর্থ জীবনস্বপ্ন আবার সম্ভাবনাকে সত্য করে দেখে। "দুইচক্ষু মধ্যাহ্নের বালুকার মতো জ্বলিতে লাগিল, তাহার বিশ্বাস মরুভূমির বাতাসের মতো উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।"—তার কারণ মহেন্দ্রকে ঈর্ষা নয়, দাম্পত্যভোগে নিজেকে আশার স্থলাভিষিক্ত করবারও ইচ্ছে নয়; তার কারণ জীবনবঞ্চনার জ্বালা বিনোদিনীকে রুদ্ধবেদনায় হিংস্র করে তুলেছিল। রাজলক্ষ্মীর সংসারে একজন বিচক্ষণ নির্ভরযোগ্য পুরুষ বিহারী। মহেন্দ্রের মতো পুতুল বিনোদিনীর প্রার্থিত নয়। তবু সে যে মহেন্দ্রের সান্নিধ্যে এসে বিহারীর সামনেই ওডিকলোন-সেবার বাড়াবাড়ি দেখিয়েছে, তা নিছক অভিনয়, ছলনা। ছলনা শ্লাঘনীয় না হলেও এক্ষেত্রে মনস্তত্ত্বসম্মত। "বিহারী আশাকে শ্রদ্ধা করে এবং বিনোদিনীকে হালকা করিতে চায়, ইহা বিনোদিনীকে বিঁধিল।" তাকে উপলক্ষ করে আশার প্রতি একটি প্রীতিস্নিগ্ধ মনোভাব যে বিহারীর আচরণে স্পষ্ট, তা বিনোদিনীর দৃষ্টি এড়ায় নি। তাকে নিয়ে মহেন্দ্র-বিহারীর সম্পর্ক যখন তিক্ত হয়ে উঠল, সে আবার বারাসতে ফিরে যেতে চেয়েছে। যেখানে হৃদয় শুধু উদ্বেল হয়, সংসারের সনাতন ভারসাম্যের বাঁধন শ্লথ হয়ে আসে, অথচ যে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে হৃদয়ের এই ব্যাকুলতা সে তো বস্তুমুখী, তখন স্বেচ্ছা-নির্বাসনেও সান্ত্বনা আছে। কিন্তু দৈনিক সাক্ষাৎকারও প্রবল ইচ্ছায় যার দ্রুত বৃদ্ধি, তার সঙ্গে সে আগুন নিয়ে খেলা করতে চায় নি। বাড়ির সকলে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেও সে বিহারীরই মুখাপেক্ষী ছিল। (পৃঃ৭৫)

"এমন লক্ষ্মীকে কে ইচ্ছা করিয়া বিদায় করিবে।" এই চিত্তরঞ্জিনী বাক্য যদি বিহারীর মর্মের কথা হত, তাহলে বিনোদিনীর জীবন ব্যর্থ হত না। তার দ্বারা উপন্যাসে এত প্রবৃত্তির বহ্নুৎসবও ঘটত না। বিনোদিনী কেবল কুন্দনন্দিনী নয়, সে নির্দোষ রোহিণী এবং তদতিরিক্ত কিছু। কুন্দনন্দিনী একেবারে মূক, ভালোমানুষ; আশা সেই প্রকৃতিরই মেয়ে। সূর্যমুখীর মতো গৃহিণীপনায়, কর্তব্যে নিপুণা বিনোদিনী। রবীন্দ্রনাথ দুজনের সংস্থান বদলেছেন। তাই সমস্যা এত প্রকট। নগেন্দ্রনাথ ছিলেন যোগ্য পুরুষ; মহেন্দ্রের স্বার্থপর উচ্ছ্বাসপ্রবণ দুর্বল ব্যক্তিত্ব উপন্যাসের সমস্যাকে আরো জটিল করেছে। তাই দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ 'চোখের বালি' নারীর ব্যক্তিত্বে উদ্‌বর্তনের দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার' উপন্যাসও আলোচ্য। রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের অনুবর্তী শিষ্য ও বন্ধু, বঙ্কিমের পরামর্শেই বাংলা সাহিত্যরচনায় মনোযোগী হন। কিন্তু শরৎ ও সুধার দাম্পত্য প্রেমের সরল সুন্দর চিত্রাঙ্কনে তিনি বঙ্কিমের সমাজসংস্কার থেকে মুক্ত। রমেশচন্দ্রের মুক্ত সমাজমানস ঔপন্যাসিক সিদ্ধান্তেও বঙ্কিম থেকে আধুনিক। সমাজপ্রগতির ধারা রমেশচন্দ্র চিনেছিলেন, কিন্তু তত্ত্ববিদ্‌ প্রবন্ধকার তখন অন্য বড় কাজে ব্যস্ত, রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' সেই ধারার শ্রেষ্ঠ কলাসৃষ্টি। সুধাও বিনোদিনীর মতো 'বিষবৃক্ষ' পড়েছে, তবে তার প্রকৃতি কুন্দেরই মতো। রমেশচন্দ্র বিষ খাইয়ে সমস্যা সমাধানের উত্তরেই 'সংসার' লিখেছিলেন, এবং সানন্দে স্মরণীয় যে সেই উত্তর সম্পূর্ণ শিল্পসম্মত।

দমদমের চড়ুইভাতি মহেন্দ্রেরই আয়োজিত, কিন্তু এর কোনো সুফল সে পায় নি। আশার কাছেও এই দিন তাৎপর্যহীন। বিনোদিনীর জীবনে এই চড়ুইভাতি পরম মহার্ঘ। তার জীবনের 'বড়োদিন'। কারণ সেদিনই সে নিজের অতীত উন্মোচনের মধ্যে আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎ পেয়েছিল, এত দীর্ঘ বিহারীর সান্নিধ্যলাভের সুযোগও ইতঃপূর্বে পায় নি। দুজনের এই শুভদৃষ্টির লগ্ন। বিহারীও দেখল বিনোদিনীর মধ্যে 'আর-একটি মানুষ', বিনোদিনীর স্বামিপুত্রবতী মঙ্গলময়ী রূপ। "তাহার অন্তরে একটি পূজারতা নারী নিরজনে তপস্যা করিতেছে।" "প্রকৃত আপনাকে মানুষ আপনিও জানিতে পারে না"—এই কথা বিনোদিনীর হৃদয়ে বসন্তের বাঁশি বাজিয়েছে। তাই "সে যখন তরুবীথিকার মধ্যে আশাকে জড়াইয়া ধরিল, তাহার মধ্যে প্রণয়ের কৃত্রিমতা কিছুই ছিল না।" "আমার মনে হইতেছে আমি যেন

মরিয়া গেছি, যেন পরলোকে আসিয়াছি, এখানে যেন আমার সমস্তই মিলিতে পারে।”—এজন্যেই বিনোদিনীর যৌবনের খরদীপ্তি শান্ত সজল স্নিগ্ধ হয়েছিল। “এখানে যেন আমার সমস্তই মিলিতে পারে”—প্রসাধনকলাবতী নারীর কাছে এ যেন মহাপ্রকাশ, জীবন ব্যর্থ হয়ে যায় নি, প্রচুর বঞ্চনার শেষেও আরম্ভ আছে। হরলালের মুখের কথায় ‘সমস্ত’ প্রাপ্তির ঔচিত্য আছে জেনেই কৃতজ্ঞতাবশে তার জন্যে রোহিণী উইল চুরি করেছিল। আত্মবিকাশ, আত্মপ্রতিষ্ঠার এমন সহানুভূতিসম্মত স্বীকৃতি পেলে বঞ্চিত নারীর চিত্তে এ-হেন সূর্যোদয় স্বাভাবিক।

মহেন্দ্রের সংসারে ফিরে এসে বিনোদিনীর পুনর্মূষিকোভব। কিন্তু মন তো শামুক নয়, একবার শক্ত খোলার বাইরে এলে আর কূটস্থ হতে পারে না। চড়ুইভাতির ঘটনা যে-কোনো-একদিন নয়, বিনোদিনীব জীবন-ধারণাই সেদিন থেকে মহৎ পরিবর্তনের অভিমুখী, সেখানে ঈর্ষার চেয়ে বড়ো ইতিমূলক আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নসাধ। কিন্তু বিহাবী নিস্পৃহ, মহেন্দ্র ভাবোন্মাদ, রাজলক্ষ্মী স্বার্থপর। সুতরাং তাব স্বাভাবিক বিকাশপথ ব্যাহত হল।

মধুর অভিনয়ে মহেন্দ্রেব উপব স্ত্রীর চেযে বেশী অধিকার বিস্তার করল বিনোদিনী। মহেন্দ্র মনে মনে আশার প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী হচ্ছে ভেবেই নাইট-ডিউটির অজুহাতে সে মেসে উঠে গেছে। বাড়ি থেকে পালানো সহজ; কিন্তু নিজের কাছ থেকে পলায়নেব পথ নেই। তাই অধ্যয়ন কি হল, সে-তথ্য উহ্য। তার মনেব উদ্বেলতা যখন কিছুমাত্র কমে নি, তখনই পর পর তিনটি চিঠি। লেখিকা আশা, কিন্তু আশার চিঠির মাধ্যমে বিনোদিনীর আত্মনিবেদন মহেন্দ্রকে আরো উতলা করল। বিহারী না গেলেও মহেন্দ্র যে অচিরে বাড়ি ফিরত, এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ। নিজের শক্তির পরীক্ষায় তৃপ্ত হবার পরেই মানসিক অবসাদ। তাই আবার বিনোদিনী বারাসত যাবার প্রস্তাব করল। মহেন্দ্র ছাড়া অন্য একজন পুরুষের মনোভাব জানারও আকাঙ্ক্ষা ছিল। তার ‘পৈশাচিক ইন্দ্রজাল’ মহেন্দ্র-আশাব অবোধ্য। প্রকৃত আনন্দমুহূর্ত বিহারীর প্রশস্তিবাচনে: “তোমার উপর আমার গভীর ভক্তি জন্মিয়াছে বলিয়াই…।” কিন্তু “অসহায় বালিকাকে সংসারের নিষ্ঠুর আঘাত” থেকে রক্ষা করাই তার একমাত্র কাজ? সমাজের নিষ্ঠুরতা তার মতো কে উপলব্ধি করেছে? অবশ্য এর চেয়ে চরম ট্র্যাজেডি নিহিত তার অন্তর্দ্বন্দ্বে, “দগ্ধ হইতেই হউক বা দগ্ধ করিতেই হউক” সে মহেন্দ্রের জীবনে

জড়িয়ে গেছে। মহেন্দ্রের উচ্ছ্বাসের নদীতে পা ডুবিয়ে সে বিহারীর তটে উঠতে চেয়েছিল।

রাসবিহারীর বাড়ি গিয়েই বিনোদিনী আরো বুঝেছে, বিহারীর প্রতি তার ভালোবাসা কত গভীর, কত দুর্বার। সেই ঘর, পরিবেশ, প্রতিবেশী অথচ কত প্রভেদ। মন অত্যন্ত অপ্রকৃতিস্থ এবং মহেন্দ্র যখন মনের কোণেও নেই, তখনই সশরীরে তার আবির্ভাব। শেষ পর্যন্ত নিরুদ্দেশ যাত্রায় গৃহত্যাগ। কলকাতায় অল্পদিনেই শ্রান্তি অবসাদ নেমে এসেছে। বিহারীকে পাবার পথ এত পঙ্কিল নয়। পশ্চিম-যাত্রায়ও বিহারীর দর্শন মেলে নি। এই সমাজচ্যুত পলাতক পর্বে বিনোদিনীর প্রেমের তপস্যা, দুঃখের পরীক্ষা। প্রথম পর্বে যে প্রখর দীপ্তি, 'হিংসার সংহার মূর্তি' আমাদের সহানুভূতি খণ্ডিত করে, দ্বিতীয় পর্বে এই প্রেমের সাধনা তার সম্পূরক। কেবল প্রবৃত্তি বাসনাবহ্নি প্রধান হলে মহেন্দ্রকে সে প্রত্যাখ্যান করত না। এখানেই বাংলা সাহিত্যে বিধবা প্রেমিকা নারী বহুচার গ্লানি থেকে মুক্তি পেল। রোহিণীর গোবিন্দলালপ্রীতি হৃদয়ঘটিত, কিন্তু নিশাকর-কলঙ্ক বহিরারোপিত।

উপন্যাসের দুর্বলতা বিহারী চরিত্রায়নে। যে বিনোদিনীর নিভৃত তার অভাব উপন্যাসেরই শিল্পমান খর্ব করে—তার চিত্তে প্রেমের উদবোধন ঘটে নি। বিহারী বিনোদিনীর ভালোবাসা পেয়েছিল, কিন্তু সে ভালোবাসে নি। অর্থাৎ বিহারী বিনোদিনীর প্রেম পারস্পরিক নয়। তাই এলাহাবাদে মহেন্দ্র সন্নিধানে গিয়ে বিনোদিনীর ফুলশয্যা দেখে বিহারী বিনোদিনীকে ঘৃণা করেছে। বিহারীর বাসায় বিনোদিনীর আত্মদানের সেই মোহিনীচ্ছবি এতক্ষণ তার মনে গ্রথিত ছিল। কিন্তু "শয়নঘরে শুষ্ক ফুল এবং ছিন্ন মালা ছড়ানো" দেখে "মন নিমেষের মধ্যেই প্রবলবেগে বিমুখ হইয়া গেল।" এই বিমুখতা যেমন আকস্মিক, তেমনি পরমুহূর্তে প্রেম নিবেদন, প্রকাশ্যে মহেন্দ্রের সঙ্গে সংঘর্ষ, বিবাহোদ্যোগ (অথচ মহেন্দ্রের সঙ্গে বিরোধ আশঙ্কা করেই একদিন সে পশ্চিম প্রবাসী হয়েছিল) খুব গভীর মনোরমের পরিচয় দেয় না।

উপন্যাসের উপসংহারে সত্যিই বিনোদিনী দেবী। রবীন্দ্রনাথের যেন অভিপ্রেত, অবজ্ঞা, অস্বীকৃতি পেয়েই নারী বিপথচালিতা হয়, প্রেমের স্বীকৃতি-মাত্রেই সে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হতে জানে। বিহারী বিবাহে স্বীকৃত জেনেও বিনোদিনী সম্মতি দেয় নি। রবীন্দ্রনাথ সমাজপটে নারীর ব্যক্তি-

মানসের যে জটিল সংঘর্ষ ও মহত্তম বেদনা প্রকাশ করেছেন, পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে তার বহুমুখী প্রভাব লক্ষণীয়। তাহলেও 'চোখের বালি'র উপসংহার রবীন্দ্রনাথের দ্বিধাগ্রস্ত কলমেরই স্বাক্ষর। শৈবলিনীর উন্মত্ততা, কুন্দনন্দিনীর বিষপান, রোহিণীর মৃত্যুর চেয়ে বিনোদিনীর অন্তিমদশা অবশ্যই সুন্দর। তবু 'চরিত্রহীন'এর সতীশ-সাবিত্রী, উপেন্দ্র-কিরণময়ী, 'গৃহদাহ'এর মহিম-অচলা-সুরেশের সমস্যার মতো বিহারী-বিনোদিনী মিলনে কোনো অন্তরায় ছিল না। ব্রাহ্মসমাজ-হিন্দুসমাজে এর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াই হয়তো তাঁর মনের রাশ টেনে ধরেছিল। না হলে বাস্তবক্ষেত্রে এ সমস্যার সাহসিক সমাধানেই তাঁর ব্যক্তিগত রুচি ছিল।

'চরিত্রহীন'এর কিছু ঘটনা এখানে স্মরণীয়। সতীশ সাবিত্রীকে বিবাহ করতে চায়, সাবিত্রী সম্মত। কিন্তু সে যে মেসের ঝি এবং তাতে সতীশের মর্যাদা নষ্ট হবে! কিরণময়ী দিবাকরকে চায় নি, উপেন্দ্র অপ্রাপ্য বলেই তার প্রবৃত্তি প্রতিহিংসাময়ী হয়ে উঠল। কিরণময়ীর শেষদশা শৈবলিনীর মতো। এক বিনোদিনী-সত্তা দুই আধারে রক্ষিত হয়েছে; অবশ্য শরৎচন্দ্রে পরিবেশসংস্থান আরো সমাজ-বাস্তবঘনিষ্ঠ।

'নৌকাডুবি' রবীন্দ্রনাথের অসতর্ক মনের সৃষ্টি। নতুবা সংস্কারের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ঘোষণার পরে সংস্কারেরই এমন বৈজয়ন্তী উৎসব অসম্ভব। ঘটনাটিও একান্ত তুচ্ছ। বঙ্কিমচন্দ্র 'রজনী' উপন্যাসে যেমন অতিরিক্ত মাধুর্য সন্নিপাতে বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা লবঙ্গলতাকে ভুলিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথও অন্তর্দ্বন্দ্বের পথ ছেড়ে পরিস্থিতির আকস্মিকতায় এবং শান্ত মাধুর্যরস পরিস্ফুটনে উৎসাহী হয়েছেন। অবশ্য 'চোখের বালি'র কাব্যমণ্ডিত ভাষার তুলনায় 'নৌকাডুবি'র ভাষা ঔপন্যাসিক বিশ্লেষণের অধিক উপযোগী। রমেশের মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা উপন্যাস-রীতিসম্মত। তবু এর প্রধান আকর্ষণ হেমনলিনী চরিত্র এবং গোরা উপন্যাসের পূর্বাভাস।

'গোরা'র পরেশবাবু, পানুবাবু, সুচরিতা যেন অন্নদা, অক্ষয় হেমনলিনীরই সংস্করণভেদ। ব্রাহ্মসমাজ এবং তর্ক-প্রাধান্যও দুই উপন্যাসের সাদৃশ্যসূত্র। তবু 'গোরা' বাংলা সাহিত্যে একক। একটি শতাব্দীর বিদগ্ধ সমাজের উত্থান-পতন, ধর্ম-সমাজ-নীতি সংক্রান্ত আলোচনা, কোন্ ভারতবর্ষ ভারতবাসী-মাত্রেরই আরাধ্য তার সুদীর্ঘ বিশ্লেষণ বাংলা উপন্যাসের সম্ভাবনাকে প্রসারিত করেছে। সমাজের তথ্যগত পঙ্কিলতা শরৎচন্দ্রীয় নৈপুণ্যে অবশ্য বর্ণিত হয়

নি। বিনয়, পরেশবাবু যে সমাজের লোক, সেখানে পরনিন্দা দলাদলি অত নিম্নস্তরে যেতে পারে না। ঘটনাস্থলও গ্রাম্যসমাজ নয়, অন্ত্যউনিশ ও বিশের প্রথমার্ধের কলকাতা। অনেকের মতে গোরা-সুচরিতা বিনয়-ললিতার প্রেমের কাহিনীটুকুই এই গ্রন্থের আসল ঔপন্যাসিকতা। ব্রাহ্ম বনাম হিন্দু মতের বিতর্ক নিতান্ত তৎকালীন সমস্যায় কবির অংশগ্রহণ। 'ব্যাধি ও প্রতিকার' (১৩১৪ শ্রাবণ, প্রবাসী) প্রবন্ধ 'গোরা'র যথার্থ পটভূমি। 'গোরা'র রচনাকাল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শেষপর্ব। স্বাদেশিকতার ভাবোচ্ছ্বাস তখন যুক্তিবুদ্ধি মানসমঙ্গল পরিহার করে উত্তেজনামূলক অনুষ্ঠানে ব্রতী, ভারত ও হিন্দু জাতীয়তা যেন একার্থবাচক। রাষ্ট্রনৈতিক স্বরাজের চেয়ে কবির কাছে স্থায়ী মূল্য আত্মিক ভারতবর্ষের। "ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে সে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, সেই তপস্যা আজ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে, দাসভাবে নয়. জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিকভাবে, সাধকভাবে।" 'গোরা' উপন্যাসে এই আদর্শেরই শিল্পায়ন। পরেশবাবু হিন্দু থেকে ব্রাহ্ম হয়েছেন; তবু ব্রাহ্মসমাজের বাঁধনে তাঁর মন ছোট হয নি। উভয় সমাজের সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে তিনি মানুষের মূল্য ব্যক্তির আত্মজিজ্ঞাসা স্বীকার করেছেন। পরেশবাবু তার ভাবরূপ, শান্ত সমাহিত প্রকাশ, গৌরমোহনে সেই আদর্শই বিপরীত কোটি থেকে সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে এসে মিলেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে ব্রাহ্ম; অবশ্য আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম। বৃহত্তর হিন্দুসমাজের আকষণই তাঁর কাছে প্রবলতর ছিল, ব্রাহ্মসমাজের গোঁড়ামি কোনোদিন তাঁর দৃষ্টিকে সংকীর্ণ করে নি। অবশ্য 'গোরা'র সকলেই বিদ্বান, ধনাঢ্য এবং অভিজাত। সুচরিতা ও গোরা, ললিতা ও বিনয়ের মিলনে পরেশবাবুর অন্তরের আশীর্বাদ সত্ত্বেও যে উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা দেখা যায় তাঁর মতো স্থিতধী সমাহিত ব্যক্তির পক্ষে তা নিঃসন্দেহে গভীর চিত্ত-বিচলনের স্মারক। এখানে রবীন্দ্রমানসের দ্বন্দ্বই প্রতিফলিত। কিন্তু ঐশী উপলব্ধি যাঁর অধিগত, ব্রাহ্ম বা হিন্দুসমাজের কোনো সংস্কার যাঁর চিত্তকে বাঁধে নি, সবার ঊর্ধ্বে ব্যক্তির মূল্যবোধ, সত্যকে যিনি স্বীকার করেছেন, পৃথিবীর কোনো সমাজবিধানই তাঁকে পর্যুদস্ত করতে পারে না।

বিনয় অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে গোরাকে বলছে, "আজ আমি একলা দাঁড়ালুম। সমাজ বলে রাক্ষসের কাছে প্রতিদিন মানুষ বলি দিয়ে কোনমতে তাকে ঠাণ্ডা করে রাখতে হবে এবং যেমন করে হোক তারই শাসনপাশ

গলায় বেঁধে বেড়াতে হবে তাতে প্রাণ যাক আর থাক, এ আমি কোনমতেই স্বীকার করতে পারব না।" এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্বেদনা মিলেছে বলেই সুর এত করুণ মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে বিতর্ক, বিবেকানন্দের সঙ্গে আত্মিক ভারতবর্ষ অনুসন্ধান ও মতভেদ, মার্গারেট. ই. নোব্‌লের হিন্দুধর্মে দীক্ষা তাঁর অন্তরে গভীর বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল। উপন্যাসের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত বিনয়, গোরা, সুচরিতা, পরেশবাবুর মানস-সংকট লেখকেরই উদ্বিগ্ন ব্যক্তিমানসের প্রতিফলন। কোনো মতের মধ্যেই তিনি সমগ্র জীবনসত্য তথা আত্মিক ভারতবর্ষের অখণ্ড আভাস দেখেন নি। নানা চরিত্রের মাধ্যমে আপনাকেই যেন লেখক নানাখানা করে দেখেছেন। 'নৈবেদ্য', 'তপোবন', 'ব্যাধি ও প্রতিকার', 'ততঃ কিম্‌', 'বিজয়া-সম্মিলনী', 'রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি', 'ধর্মপ্রচার' প্রভৃতি প্রবন্ধাবলীর মধ্যে যে সমস্যা ক্রমাগত তাঁর চিত্তকে আলোড়িত করছিল, তার সমাধান না হলে রবীন্দ্রনাথের শিল্পীমানসের তৃপ্তি ছিল না। তাই পুত্রবিয়োগের পরেও যথা সময়ে 'গোরা'-র সুদীর্ঘ মাসিক কিস্তি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে এসে পৌঁছেছিল। উনিশ শো পাঁচ থেকে উনিশ শো ত্রিশ-বত্রিশ পর্যন্ত আন্তরপ্রবর্তনায় রবীন্দ্রনাথ যত প্রবন্ধ লিখেছেন, এমন আর কোনো পর্বে নয়। তাঁর সেই অভূতপূর্ব মানসিক আলোড়নের পরিচয় তৎকালীন দলাদলি, প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ, প্রতিবাদ-অনুষ্ঠানের মধ্যে অনুচ্চারিত রয়ে গেছে। প্রবন্ধগুলিতে যার আংশিক প্রকাশ, তারই জীবন্ত, প্রকাশমান, শিল্পায়ত অভিব্যক্তি 'গোরা'। যদি কোনো চরিত্রকে লেখকের আদর্শ বলে চিহ্নিত করতে হয়, তবে সে পরেশবাবু নয়, আনন্দময়ী। তাঁর স্থির সংযত স্বভাব, গভীর উদার বাৎসল্য সব সমস্যার সহজ সমাধানে পৌঁছেছে। ভারতবর্ষের যে ধ্যান-রূপ অনেক বক্তৃতার পরেও অস্পষ্ট, তারই মানবী মাতৃপ্রতিমা আনন্দময়ী। আনন্দময়ীই রবীন্দ্রনাথের ধ্যানলব্ধ ভারতবর্ষ। একদা যবনাচারী, অধুনা সাধনাশ্রমে মগ্ন, কৃষ্ণদয়াল, স্বার্থপর, ঘোর বৈষয়িক মহিম, ম্লেচ্ছপুত্র গোরা, ভালোমানুষ বিনয়, ব্রাহ্ম পরেশবাবু, সংকীর্ণ হরমোহিনী সকলকেই তিনি সহজে মিলিয়েছেন, সকলেই তাঁকে মেনেছে। উপন্যাসের কতকগুলি মানুষ যখন অধীত বিদ্যার জোরে বুদ্ধিমার্গে পথ হাঁটে, তখন বহু সমস্যার সমাধান হয় এবং বহু অমীমাংসিত থাকে। বুদ্ধি শেষ পর্যন্ত ঘোলাটে হয়ে বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, মনুষ্যত্বকে, সত্যকে আচ্ছন্ন করে। ধর্মের, সমাজের অথবা সম্প্রদায়ের গোঁড়ামি অজ্ঞাতসারে যুক্তির ছদ্মবেশ প'রে বসে।

আনন্দময়ীর বাৎসল্যের মধ্যে আশ্রয় পেয়েও গোরার সংস্কারমুক্তি ঘটে নি, বরং সে তাঁরই হাতের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে চলেছে। অর্থাৎ ভারতের হিন্দুধর্ম ব্রাহ্মণ্যগৌরব আচারনিষ্ঠা অক্ষুন্ন রাখতে ভারতবাসী দেশমাতাকেই অস্পৃশ্য করেছে। আনন্দময়ী রূপক নয়, অথচ 'গোরা' উপন্যাসের তত্ত্বসার এই মহীয়সী নারী, রূপকদ্যোতনার চরম সিদ্ধি। বাংলা উপন্যাসে আনন্দময়ী মনুষ্যত্ব-বোধের, আত্মিক অনুশীলনের অপূর্ব দৃষ্টান্ত। দুঃখ এই যে, এঁর সাদৃশ্য বাংলা উপন্যাসে আর অন্য চরিত্রে দেখা গেল না। অথচ হরমোহিনী, মহিম, বরদাসুন্দরী, পানুবাবু, এমনকি কৈলাসও বাংলা উপন্যাসের আসর জুড়ে বসেছে। ব্রাহ্মসমাজ বনাম হিন্দুসমাজের দ্বন্দ্বও অনেক বে-আব্রুভাবে রূপায়িত শরৎচন্দ্রের 'দত্তা', 'নববিধান', 'গৃহদাহে'। দয়াল আচার্য পরেশবাবুর ছায়ায় কল্পিত ; পানুবাবুরই নিকৃষ্ট সংস্করণ রাসবিহারী, বিলাসবিহারী (বোধ হয় বিলাস তবু ভালো) এবং বরদাসুন্দরী, পানুবাবু ইত্যাদির মিশ্ররূপে কেদারবাবু। অচলার মধ্যে সুচরিতার উপাদান অল্প নেই। তবে সে অন্য সামাজিক আবহে ঔপন্যাসিক সমস্যার অন্য দিক উদ্‌ঘাটন করেছে।

যে তর্ককণ্টকিত পথে কথার বেগে 'গোরা' উপন্যাসের তরুণ নরনারীদের পরিচয় তার বেগ বা লও ক্রমশ আবর্ত সৃষ্টি করছিল, স্রোত হয়ে অগ্রাভিমুখী হতে পারে নি। পরস্পর পরস্পরকে ধাক্কা দিয়েছে মাত্র। শেষে গোরা-বিনয়ের বন্ধুত্বচ্ছেদ আসন্ন, সুচরিতা-গোরার পরিণাম অনিশ্চিত এবং বিনয়-ললিতার বিবাহ গোপনকার্যের মতো দুঃখময় হয়ে উঠেছিল। বুদ্ধিমার্গে দৃঢ় ব্যক্তিবর্গ কেবলি সংঘর্ষ বাধায়, অথচ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিরই আত্মোপলব্ধির প্রকাশ। পরস্পরের সমান্তরালতা ছাড়াও বৃহত্তর মানবিক বোধে, ভালোবাসায়, মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্যে মেলবার জায়গা আছে। সেটি প্রতিষ্ঠিত হল আনন্দময়ীর নির্বন্ধে। সুতরাং আনন্দময়ী রবীন্দ্রনাথের নিছক আদর্শ-প্রক্ষেপ নয়, উপন্যাসেরই শিল্পগত প্রয়োজন সিদ্ধ করেছেন। সুচরিতা-গোরা এবং ললিতা-বিনয়ের মিলনেই সব শেষ নয়, নতুন করে আরম্ভ। ভারতবর্ষ রাষ্ট্র, দেশ, হিন্দুধর্মকে নিয়ে তাদের ব্যক্তিগত, আত্মিক জিজ্ঞাসা বিবাহের গার্হস্থ্যবন্ধনে চাপা পড়ল না, লেখক হৃদয়াবেগের সঙ্গে বুদ্ধির মিলনে মানব-ব্যক্তিত্বের চূড়ান্ত বিকাশ দেখেছেন।

সমাজ-প্রগতি ও স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার রূপায়ণে 'গোরা' বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্গত হলেও এর প্রকরণ ত্রুটিহীন নয়। সুচরিতা ছাড়া গোরার 'বিশ্বাদ,

সমস্তই বিস্বাদ', তার জন্যেই গৌরমোহন বুঝেছে, "নারীকে যতই আমরা দূর করিয়া ক্ষুদ্র করিয়া জানিয়াছি, আমাদের পৌরুষও ততই শীর্ণ হইয়া মরিয়াছে।" অথচ জেল-জীবনে বাহিরের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গোরার চিত্তে সেই সত্যবোধ কিরূপে জাগ্রত হল, উপন্যাসের মনোবিশ্লেষণে তার গুরুত্ব অসীম, অথচ তা উপন্যাসে বর্জিত। বিনয়-ললিতার প্রেমোন্মেষের ক্রম-পরিণতি সুন্দর বিশ্লেষিত, তারপরে বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে পরিচ্ছেদের দীর্ঘ টানাপোড়েন অবাস্তব, গল্পের গতিকেও শ্লথ করেছে। গোরার প্রতি সুচারিতার উন্মুখতা, আকর্ষণ-বিকর্ষণ সূক্ষ্ম আভাসইঙ্গিতে ব্যক্ত; তুলনায় গোরার মানসিক পরিবর্তন লেখকের বিবৃতি মাধ্যমে উপস্থাপিত, ঘটনাধারার অনিবার্য পরম্পরায় উদ্‌ঘাটিত হয় নি। কারামুক্তির পরে তার এই দ্বিজত্ব যদি সত্য হয়, তবে পূর্বের সেই তর্কোৎসাহ, শানিত প্রখর দৃষ্টান্ত স্তিমিত হল না কেন? বিনয়-ললিতার বিবাহবিরোধে তার পরোক্ষত নিজের চারপাশে বাঁধ দেবার চেষ্টা প্রবল হলেও তার যুক্তিতর্কের উগ্রতা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি। এই সব অংশের বাগ্‌বিস্তার উপন্যাসে 'জায়গা জুড়ে বসেছে'। আনন্দময়ী না থাকলে গোরার নিজের দিক থেকে বিবর্তন সম্ভব ছিল না। গোরাব জন্ম-রহস্য আকস্মিকভাবে উদ্‌ঘাটনেও তার প্রমাণ। এখানে গোরার মনে আনন্দময়ীর প্রভাবও তুচ্ছ, কৃষ্ণদয়ালের মৃত্যু আশঙ্কা এবং বক্তৃতাই কার্যকরী। এইটুকু গোরা চরিত্রাঙ্কনের ক্রটি। যে উপন্যাসে ব্যক্তির স্বাধীনচিত্ততা এত মর্যাদা পেল, তাতে সুধীর বা অবিনাশের এমন নিরবয়ব আস্তিত্ব পাঠকের ঔচিত্যবোধ ক্ষুণ্ণ করে। বিনয়-ললিতার শুভবিবাহে সুধীরের নীরব উপহারে এক মুহূর্তের জন্য তার অন্তরস্বরূপ জানা গেছে। বাকী অংশ ব্যর্থ। ঘটনা-শৈথিল্য, তর্ক-বাহুল্য 'গোরা'র লক্ষণীয় ক্রটি হলেও এর সামগ্রিক শিল্পসৌন্দর্যে, বিষয়ের বিশাল ব্যাপ্তিতে সব মানিয়ে গেছে। উপন্যাস পাঠের পরেও জীবনে নানা প্রশ্নে বিচলিত হয়ে মনে পড়ে: "রক্ষা পাবার জন্য একটা জাগতিক নিয়ম আছে—সেই স্বভাবের নিয়মকে যে পরিত্যাগ করে সকলেই তাকে স্বভাবতই পরিত্যাগ করে।…হিন্দুসমাজ এখনও যদি নিজের মধ্যে সংগ্রহ করবার শক্তি না জাগায়, ক্ষয়রোগকেই প্রশ্রয় দেয় তাহলে বাংলা উপন্যাসে ব্যক্তিচিন্তার উদ্‌বর্তন প্রসঙ্গে জন স্টুয়ার্ট মিলের রচনাবলীর প্রভাব অবশ্য আলোচ্য। তাঁর লিবার্টি-চিন্তা প্রথম বঙ্গদর্শনে ব্যাপক আলোচিত হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতেও তার উল্লেখ আছে। অবশ্য

'প্রচার' 'নবজীবন' পর্বে মিলের চেয়ে ভগবদ্গীতাই ছিল তাঁর প্রিয়, যে সাম্য গ্রন্থে লিবার্টি-চিন্তা সক্রিয়, তিনি তা প্রত্যাহার করেছিলেন। 'গোরা'য় বঙ্গদর্শন পাঠের কথা আছে। সেই যুগের ব্যক্তিস্বাধীনতা বোধ কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের তথা "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত অন্য উপন্যাসের চরিত্র বিশ্লেষণে প্রতিফলিত হয় নি। পরেশবাবু গোরা বিনয় ও সুচরিতার সংলাপে ব্যক্তি-স্বাধীনতার আন্তরিক এষণা প্রকাশ পেয়েছে। প্রাবন্ধিকের কলম থেকে সেইসব তত্ত্ব উৎক্ষিপ্ত হয়ে উপন্যাসে ছিট্‌কে পড়ে নি; অন্তর-প্রকাশের তাগিদেই চরিত্রের মনোভাব তত্ত্বের রূপ নিয়েছে, একাধিক ব্যক্তির দৃঢ়ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষেই অন্তঃসংঘাত অর্থাৎ বিতর্ক অনিবার্য হয়ে উঠেছে। বিবাহ, প্রেম ও নারীর স্বাধীনচিত্ততা প্রসঙ্গ সুচরিতা-ললিতার আশ্রয়ে লেখক স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি দিয়েছেন। অভিব্যক্তিব আন্তরিকতায় তর্কযুদ্ধে উপমা-সৈন্যের সমাবেশ হয়েছে প্রচুর। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শিক্ষায় সাহচর্যে বেড়ে-ওঠা ববীন্দ্রমানসে মিলের লিবার্টি-চিন্তা সহজেই আত্মীকৃত হযেছে।

'বাহিরের মানুষের এই অবাধ-সংস্রব তার পক্ষে একটা সাংঘাতিক আঘাত হয়ে দাঁড়াবে।' অনেক নিভৃত চিন্তার ফলে পরেশবাবু বুঝেছিলেন, অভিমন্যু-ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করতে জানত বেরতে জানতনা—'হিন্দু ঠিক তার উল্টো। তার সমাজে প্রবেশ করবার পথ একেবারে বন্ধ, বেরবার পথ শত সহস্র।'

"গোরা"র ঐতিহ্য বাংলা উপন্যাস গ্রহণ করলে গ্রাম্য দলাদলি, অন্ধ সমাজ-শক্তির সঙ্গে অসহায় ব্যক্তির বিরোধেই এতকাল অতিবাহিত হত না, আধুনিক মনস্তত্ত্বের নামে রতিবিকার রবীন্দ্রোত্তর কথাসাহিত্যে কল্লোলীয় প্রগতির ছাপে জনপ্রিয় হতে পারতো না। আরো বেদনার কথা, রবীন্দ্রনাথ নিজেই একবারমাত্র এই উত্তরাধিকার রক্ষা করতে চেয়েছেন—যোগাযোগে।

"যোগাযোগ" রচনাকাল ১৯২৯। এই উপন্যাসেই প্রথম সামন্তসমাজ বনাম সদ্যোত্থিত বণিকতন্ত্রের সংঘাত অঙ্কিত হল। বিষবৃক্ষের শ্রীশ বিলেতী প্লগুর ফেয়ারলি হৌসে কাজ করেন, নগেন্দ্রনাথ নিজে বৃহৎ ভূস্বামী পরিবারের প্রধান, কিন্তু নৌকাযোগে নব্য বাণিজ্যতন্ত্রের ফসল নিযমিত ঘরে তুলে আনেন। দুটি ভিন্ন সমাজবিন্যাসের কোন সংঘর্ষ সেখানে ফোটেনি। কারণ তীব্রসংঘর্ষ জেগেছিল আরও পরে। ঘোষাল ও চাটুজ্জ্যে দুটি বিবাদমান সামন্ত পরিবার। একটি ধ্বংস হয়ে কোন মতে আশ্রয় নিলে পাট গুদামের খাজাঞ্চি--খানায়, অন্যটি বিলীয়মান সামন্ততন্ত্রের শেষ আরতির শিখা জ্বালিয়ে রেখেছে

ক্ষীণভাবে। ঘোষাল পরিবারের ছেলে মধুসূদন সর্বদিকেই ভঙ্গ-কুলীন, কিন্তু কাঞ্চনকৌলীন্যে তার সমাদর রাজদ্বার পর্যন্ত বিস্তৃত। মধুসূদন অল্প লেখাপড়া করলেও নানা :কারবারে মুনফা লুটে এবং ইংরেজ সান্নিধ্যে থেকে 'মহারাজা' হয়েছেন। তিনি টাকার অঙ্কে মানুষ মাপেন, আপিস থেকে অন্দরমহল একই নিয়মতন্ত্রের বেড়াজালে বাঁধা, এমনকি নিজেও তার মধ্যে বদ্ধ।

বিপ্রদাস চাটুজ্জে পরিবারের শেষ প্রদীপ। আদর্শে পজিটিভিস্ট[৩], সাম্প্রদায়িক দেবতায় অবিশ্বাসী, অথচ একটি সহজ প্রসন্ন দেবভাব তাঁর স্বভাবের অন্তর্গত। কুমুদিনী তার বোন, যোগ্য উত্তরসাধিকা। তার অন্তরে শ্যামসুন্দরের যে ধ্যানমূর্তি প্রতিষ্ঠিত তাকেই সে স্বামীর মধ্যে আকাঙ্ক্ষা করে। রবীন্দ্রউপন্যাসে দ্বিতীয় পজিটিভিস্ট 'চতুরঙ্গের' 'জ্যাঠামশায়'। পজিটিভিস্টদের আদিগুরু অগস্ত কোঁতের মতে বিবাহ ত্রিবিধ—Civil, Religious এবং Chaste বিপ্রদাস কি chaste বিবাহের পক্ষপাতী? মধুসূদন-সহবাসে কুমুদিনীর প্রচণ্ড অসম্মতি দেখে সেই অনুমানই বলবৎ হয়। ননীবালার সঙ্গে শচীনের বিবাহ হয় civil মতে। অর্থাৎ দম্পতিব বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করার অধিকার রইল।

জ্যাঠামশায় চবিত্রটিও অপূর্ব। ভাগ্যচক্রে স্বামী হলেন মধুসূদন ঘোষাল, যাঁব বাড়ি, বজরা, তাঁবু আত্ম-মাহাত্ম্যের অহমিকা প্রকাশ করছে, মধুসূদন নাম হলেও ভক্তি, বিনয়, বিষয়-বুদ্ধির ঊর্ধ্বচারী কোনো ভাবুকতা তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। মধুসূদন বণিকতন্ত্রের (কম্প্রডোর বণিকগোষ্ঠীর?) প্রতিভূ। দুই পরিবার দুটি যুগের দুই মূল্যবোধের প্রতীক। পূর্বতন আক্রোশের প্রতিহিংসা নিল মধুসূদন বিপ্রদাসের বোন কুমুকে বিবাহ করে। এই বিবাহ সুখের হয় নি। অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের মিলন অচল। তবে উপন্যাস রূপক নয়, এবং মধুসূদন যেহেতু মানুষ, তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব, সুকুমার চিত্ত-প্রবণতা, এমনকি ভালবাসার সুরও উপন্যাসে পরিস্ফুট।

কুমুদিনী "যেন রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ড", "নাকটি নিখুঁত রেখায় যেন ফুলের পাপড়ি দিয়ে তৈরি। রঙ শাঁখের মত চিকণ গৌর।" অন্যত্র কুমুপ্রসঙ্গে লেখক বলেছেন, "কুমু স্বভাবতই মনের মধ্যে একলা। পর্বতবাসিনী উমার মতোই ও যেন এক কল্প-তপোবনে বাস করে, মানস সরোবরের কূলে।"[৪]

কুমুদিনীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রীতিপক্ষপাত স্পষ্ট। প্রকৃতির সঙ্গে তার নিবিড় সাহচর্য, সহজ আত্মীয় বাৎসল্য, শ্যামসুন্দর সেবা, ভজনগান, এস্রাজ

বাজানো, দাদার কাছে সংস্কৃতপাঠ তাকে ক্রমশ উপন্যাসের বাস্তবরাজ্যের বাইরে নিয়ে গেছে। 'তপতী' নাটকের সুমিত্রা যেমন নারীর স্বভাবধর্মে বিক্রমকে ভালোবাসে নি, সে অর্ধেক মানবী, অর্ধেক সূর্য-তাপসী, তেমনি কুমুদিনী বরাবর অর্ধস্পষ্ট, অধরা রহস্যময়ী। নারীব্যক্তিত্বের দুটি দিক, ভালোবাসা এবং কল্যাণবোধ তাঁর কল্পনায় ক্রমশ ভিন্ন সত্তা গ্রহণ করছিল। 'শেষের কবিতা', 'মালঞ্চ' দুই বোন সেই আদর্শ কল্পনার রূপায়ণ। কুমুদিনী দুয়ের মধ্য। একদিকে শ্যামসুন্দরে সমর্পিতপ্রাণা, মীরাবাঈয়ের মত তার অন্তর মন্দিরে গোপালের অধিষ্ঠান, "মেরে গিরিধর গোপাল ঔর নাহি কোহী"। অন্যদিকে স্বামীকে গোপালের প্রতিরূপ মনে করতে সে চায়, কিন্তু পারে না। এই নিয়ে নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব। নারী-পুরুষের ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ এখানে চূড়ান্ত পর্যায়ে আরূঢ়। কুমুদিনী ও মধুসূদনের দাম্পত্য জীবনে আত্মিক মিলনের সুর লাগে নি। তাই কুমুকে মধুসূদনের ভালোবাসা অপরাধের মতো বিঁধেচে। মনকে বাদ দিয়ে দেহের মিলনে মনও অশুচি হয়। তাই সহবাসের পরদিন সকালে কুমু ঠাকুরঘরে যায় নি।

দাদার দেওয়া নীলার আংটি নিয়েছে মধুসূদন। সাধারণত এক্ষেত্রে স্ত্রীর প্রবল অভিমান পর্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু চৌর্য অপরাধ দণ্ডবিধিসম্পন্ন নয়। অথচ কুমুর প্রশ্ন : "আজ থেকে কি আমার নিজের বলে কিছুই রইলো না?" সে ভেবেছে ইন্দুমতীর কথা—"গৃহিণীসচিবঃ সখীমিথঃ প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ, ফর্দের মধ্যে দাসীতো কোথাও নেই। সত্যবানের সাবিত্রী কি দাসী? কিংবা উত্তররামচরিতের সীতা?" সে বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী, প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজা মধুসূদন ঘোষালের অনুগামিনী সেবাদাসী মাত্র নয়, তার স্বতন্ত্র মন, স্বতন্ত্র ভালো-মন্দ লাগা আছে। একজনের আওতায় আর একজন কেন সব বিসর্জন দেবে। "এখন দাসী নিয়েই থাকুক। আমাকে পাবে না।" একটি কঠিন প্রশ্ন উচ্চারিত হল উপন্যাসে। নারীর স্ত্রীত্ব এবং ব্যক্তিত্ব সমার্থক নয়। 'গোরা' উপন্যাসে মিলনের পূর্বলগ্নে উভয়ের পারস্পরিক ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত; অর্থাৎ সেখানে দাম্পত্য মিলন নারীব্যক্তিত্বেরই স্বীকৃতি। যোগাযোগের সমস্যা সেদিক থেকে জটিলতর। "সম্পর্কের জোর" "ঘোষালদের ইষ্টদেবতা" কুমুর মন টানে নি। পজিটিভিস্ট দাদা বিপ্রদাসের কাছে সবচেয়ে বড় ব্যক্তিমর্যাদা, মনের কৌলীন্য। স্বামী শ্বশুর ননদ ভাজের সম্পর্ক বন্ধন নিতান্ত বহিরারোপিত,

আপতিক যোগাযোগ মাত্র। অধিকাংশ নর-নারী কেবল বিবাহের সংস্কার-বন্ধনে মেলে, নতুবা সন্তানের ভবিষ্যৎ পরিচয়ের সুনিশ্চয়তা রক্ষার জন্যে। তখন দম্পতির মধ্যে কেবল অভ্যাসের আবাসিক যোগ, একে অপরের সন্তানপালনের মাধ্যম। এইভাবে চলে বংশক্রম। বহুকালগত অভ্যাস বলেই এর গ্লানি মনকে দূষিত করে না। কুমুদিনীর মা নন্দরাণী তার প্রমাণ। তিনি স্বামীর কাছে ভালোবাসা, নিষ্ঠা পান নি ; তাঁর উপস্থিতিতেই স্বামী অন্যগামী, উচ্ছৃঙ্খলতার আনুষ্ঠানিক উদ্‌যাপন হয়েছে প্রতিবছর, অতঃপর ক্ষমাপ্রার্থনা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নন্দরাণী ভ্রমরের মতোই অভিমানভরে পিত্রালয়ে চলে গেলেন। সেই বিচ্ছেদেই স্বামীর মৃত্যু ঘটল। কিন্তু তটস্থের বিচারে নন্দরাণী তো ছিলেন মুকুন্দলালের গৃহে সেবাদাসী, নিত্যশয্যাসঙ্গিনী। এই পরিচয় নারীর আত্মব্যক্তিত্ব দলিত করে। বিপ্রদাস পিতা বলেই মুকুন্দলালকে মেনেছেন, শ্রদ্ধা করেন নি। মায়ের অপমান যেন বোনের জীবনে না পুনরাবৃত্ত হয়, সেই আদর্শে শিক্ষা পেয়েছে কুমু। তাই নবীনের স্ত্রীর মতো শ্বশুরবাড়ির ঐশ্বর্যে কোনো মোহ জন্মায় নি। এ-প্রসঙ্গে মোতির মা ও বিপ্রদাসের আলাপ উল্লেখযোগ্য।

> "পুরুষেরা ভেসে বেড়াতে পারে, মেয়েদের কোথাও স্থিতি চাই তো। স্থিতি কোথায় ? অসম্মানের মধ্যে ?···কুমুকে অশ্রদ্ধা অবজ্ঞা করে এমন যোগ্যতা কারো নেই, চক্রবর্তী সম্রাটেরও না।
>
> মন্ত্র পড়ে স্ত্রী যে কেনা হয়েই গেচে। সাতপাক যেদিন ঘোরা হ'লো সেদিন সে-যে দেহে মনে বাঁধা পড়লো তার তো আর পালাবার জো রইলো না। এ বাঁধন-যে মরণের বাড়া। মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছি তখন এ-জন্মের মতো মেয়ের ভাগ্য তো আর কিছুতে উজিয়ে ফেরানো যায় না।"

কিন্তু বিপ্রদাসের কাছে এ-যুক্তি অকাট্য নয়। যারা "কাপুরুষ পূজার পূজারিণী" তারা প্রথার দাসী, নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি তাদের হাতে নেই। তারা আত্মবিস্মৃত ' কুমুদিনী সে-গোত্রের নয়। নারীপ্রগতির শিক্ষা তার সহজ সংস্কারের মতো, দাদার স্নেহের উত্তরাধিকার। "অবিচারে কোনো মানুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার ক'রে নেওয়ার দ্বারা শুধু যে তারই অনিষ্ট তা নয়, তাতে করে সমাজের শ্রেষ্ঠতার আদর্শকেই খাটো করে।"—বিপ্রদাসের এই শিক্ষাই তাকে মধুসূদনের "মহারাণী" হতে দেয় নি। "আমি যে কুমু"—এই বোধ সর্বদা সক্রিয় ছিল।

'যোগাযোগ' উপসংহারে নর-নারীর সাংসারিক সীমাগত শান্তি-সামঞ্জস্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় স্পষ্ট। কুমুদিনী শান্তভাবে আত্মনিরীক্ষা করে দেখলে, মনে কোনো ছাপ পড়ে নি, শুধু নবীন, মোতির মা এবং হাবলুর জন্যে একটু দুঃখ হবে; কিন্তু তারা সব যেন বাইরের লোক। অর্থাৎ কুমুদিনী যখন প্রাক-বিবাহ পর্বের মতো আবার দাদা-বোনের স্বতন্ত্র জগতে ফিরে এল, তখনই কুমুর সন্তান-সম্ভাবনা তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন। সব সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবার পরে আবার যোগাযোগ, অত্যন্ত ক্ষীণ, "ব্যক্তিকতাহীন" সামাজিক। নারীব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধার চূড়ান্ত অর্ঘ্য দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ কুমুদিনী-চরিত্রে। "একরকমের সৌন্দর্য আছে তাকে মনে হয় যেন একটা দৈব আবির্ভাব", "কুমুর সৌন্দর্য সেই শ্রেণীর। ও যেন ভোরের শুকতারার মতো, রাত্রের জগৎ থেকে স্বতন্ত্র, প্রভাতের জগতের ওপারে।" তার শরীরী উপস্থিতি যেমন দৈব আবির্ভাব, তার আত্মস্বাতন্ত্র্যও তেমনি অনমনীয়। "এমন কিছু আছে, যা ছেলেব জন্যেও খোওয়ানো যায় না।" কণ্ঠস্বব শান্ত, অথচ বাংলা উপন্যাসের নায়িকাদের মধ্যে সব চেয়ে দৃঢ় বিদ্রোহিনী।

কিন্তু তত্ত্বের কথা বাদ দিলে 'যোগাযোগ'-এর শিল্পকৃতি ত্রুটিহীন নয়। কুমুদিনীর দীক্ষাগুরু ব্যক্তিত্ব পূজারী বিপ্রদাসের ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত দুর্বল। পুরুষের সক্রিয়তা, কর্মিষ্ঠ স্বভাব "ধীরোদাত্ত" গুণ মধুসূদনে অনেক স্পষ্ট। সামন্ত মুকুন্দলালের প্রতি লেখকের সহানুভূতি এবং মধুসূদনের প্রতি প্রকট অবজ্ঞা ঔপন্যাসিক শিল্পসঙ্গতি নষ্ট করেছে। মুকুন্দলালের "একমহলে দশকর্ম, আর-এক মহলে একাদশ অকর্ম" হলেও তার কর্তব্যবোধ, স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা নাকি আন্তরিক ছিল। রাসের মেলায় প্রমোদ-বিহারের মতো অনুতাপ-অনুশোচনা, স্ত্রীর কাছে মার্জনাভিক্ষাও বাৎসরিক বরাদ্দ অনুষ্ঠান। নন্দরাণী ক্ষোভে অভিমানে স্বামীকে ছেড়ে গেছেন বটে, কিন্তু ফিরে এসেই যেন ইচ্ছামৃত্যুর সাধনা করেছেন। অর্থাৎ বনেদী আভিজাত্যের গণ্ডীতে কিছু আতিশয্যদোষ থাকলেও সে চাঁদের কলঙ্ক। মধুসূদনের মতো হঠাৎ-বড়োলোক বেনের ঘর অচন্দ্রস্পশ্য। "পাটের বস্তা থেকে হাতী বের হয় না" ভেবে লেখকও গল্পের নেপথ্যে বিলক্ষণ হেসেছেন। একদিকে রেনেসাঁসের অনুপ্রেরণা, লিবার্টি চিন্তা, নারী-পুরুষের সমানাধিকার, "ইম্পারসোন্যাল" সতীধর্মে অনাস্থা, অন্যদিকে সামন্তসমাজের বনেদী আভিজাত্যের মোহ, অর্থ-মোক্ষের উর্ধ্বে দৃষ্টি, বাজে-খরচের উচ্ছৃঙ্খলতার

মধ্যেও বড ব্যক্তিত্বের ইঙ্গিত তাঁকে দ্বিধাগ্রস্ত করেছে। রবীন্দ্র-মানসের এই দ্বিধার ফলেই চরিত্রাঙ্কনে বিপর্যয় ঘটেছে। মধুসূদনের প্রায়-ক্লাউনসুলভ মুহূর্তগুলি হয়তো তাঁর উদ্দেশ্য প্রতিপাদনের সহায়ক, কিন্তু লেখকের বৈরূপ্য অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে। সে অয়েলপেন্টিং, ফুল, কুমু, হাবলুর স্নেহ কিছুই বোঝে না। কিন্তু সতর্ক পাঠকের চোখে পড়তে বাধ্য, মধুসূদনের ভ্রান্তিবোধের জন্য কুমুদিনীর দায়িত্ব প্রচুর। "নির্ব্যক্তিক সতীধর্ম" থেকে ব্যক্তিকতায় নারীর প্রতিষ্ঠা নন্দরাণী ও কুমুদিনীর মাধ্যমে প্রকাশিত। লেখক বিপ্রদাস-পক্ষীয়, কিন্তু কুমুর মৃদু প্রশ্নটির উত্তর মেলে নি। "বাবা কিন্তু মাকে খুব ভালোবাসতেন সে-কথা ভুলো না, দাদা। সেই ভালোবাসায় অনেক পাপের মার্জনা হয়।" অন্তত নন্দরাণী জীবন দিয়ে সেই সত্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। "আমি ওদের বড়ো বৌ, তার কি কোনো মানে আছে যদি আমি কুমু না হই?" এ প্রশ্ন যেন বিপ্রদাসের শেখানো বুলি। নইলে দাদার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারে সে স্বামীর প্রতি যথাকর্তব্য পালনে অক্ষমতার জন্য বেদনাবোধ করল কেন? "তোমরা অনেক জানো তাতেই তোমাদের মন ছাড়া পায়, আমরা অনেক মানি তাতেই আমাদের জীবনের শূন্য ভরে। তুমি যখন বুঝিয়ে দাও তখন বুঝতে পারি হয়তো আমার ভুল আছে। কিন্তু ভুল বুঝতে পারা, আর ভুল ছাড়তে পারা কি একই?" এই উক্তিরই বা অর্থ কি? শেষপর্যন্ত কুমুদিনী বিপ্রদাস চালিত, আত্মস্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত নয়।

বরং অভিভাবকত্বহীন প্রেক্ষিতে দুঃখের অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে সত্য পথ পেয়েছে বিমলা। বিমলাও নারীপ্রগতির বিশিষ্ট মূর্তি। কালবিচারে 'ঘরে-বাইরে' 'যোগাযোগে'র পূর্ববর্তী হলেও পরে আলোচনার হেতু: প্রথমত, বিমলার সমস্যা নতুন কিছু নয়, কেবল ঘটনা-সংস্থান নতুন এবং উপন্যাস হিসেবে 'যোগাযোগে'র সম্ভাবনা মহত্তর, দ্বিতীয়ত, স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে অভিমত 'ঘরে-বাইরে'র অনেকটা স্থান জুড়ে আছে, সুতরাং এটি অবিমিশ্র সাহিত্যকর্ম নয়। 'চার অধ্যায়', 'চতুরঙ্গে'র সঙ্গে এর সাধর্ম্য হেতু 'ঘরে-বাইরে' এগুলির সঙ্গেই আলোচ্য।

চরিত্রগুলির আত্মকথা 'ঘরে-বাইরে'র এক-একটি পরিচ্ছেদ। এই প্রকরণে আধুনিক ব্যক্তিচিন্তার সমর্থন আছে; যা ঘটে তাতে মুহূর্তের তাড়না প্রবল, কিন্তু তার পরবর্তী নিভৃতচিন্তায় সেই ঘটনার সমর্থন বা বিপক্ষতা দিয়েই প্রকৃত চারিত্র্য বিচার্য। যদিও সে-অংশ প্রায় সাধারণের অগোচর। ব্যক্তি-

স্বাতন্ত্র্যে দীপ্ত কয়েকটি নরনারীর যদি ডায়েরি রাখার অভ্যাস থাকে, কাহিনী সংশ্লিষ্ট মানুষগুলির পরিণাম সকলের ডায়েরির আলোকে উপন্যাসের চেয়ে চিত্তাকর্ষক হবে। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের আঙ্গিকে যেন এই ধারণার প্রতিষ্ঠা। বঙ্কিমচন্দ্রের "রজনী"তে এই রীতির প্রথম রূপায়ণ। এ-রীতির দুর্বলতাও যথেষ্ট। বঙ্কিমের রোমান্স-আশ্রয়ী রচনায় যা মানায়, ব্যক্তিস্বাধীনতার ঘোষক, আধুনিক মনস্তত্ত্বনির্ভর রবীন্দ্র-উপন্যাসে তা প্রত্যাশিত নয়। আবেগপ্রবণ, কবিত্বমণ্ডিত ভাষা, ঘটনাবিরলতা, বিশ্লেষণের বদলে বিবৃতি 'ঘরে-বাইরে'র অন্যতর ত্রুটি।

তিন

তবু নারীর আত্মবিকাশ যেন বিনোদিনী-হেমনলিনী-ললিতা-কুমুদিনীর পরে বিমলায় সার্থক পরিণতি পেয়েছে। নিখিলেশ মধুসূদনের বিপরীত, তাই নারী ব্যক্তিত্বের সমস্যা 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে আর এক ধাপ অগ্রসব। বিনয় ও গোরার মানসিক দ্বন্দ্ব এবং ললিতা-সুচরিতার আন্তরসত্য বিবাহেব পূর্বে জটিল সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়েছে। তাদের মিলনেই যেন সব বিরোধের অবসান। 'যোগাযোগে' স্বামিত্ব প্রভুত্ব, কিন্তু নিখিলেশের স্বামিত্ব স্ত্রীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে উদ্বুদ্ধ করে। নন্দরাণীব ব্যক্তিত্ব সামাজিক যূপকাষ্ঠে নির্জিত হতে দেখেই বিপ্রদাস কুমুদিনীকে বন্ধনমুক্তির যোগ্য করেছিলেন। পিতামহীব আমল থেকে নারী-ব্যক্তিত্বের অপমাননা পৌরুষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে বিবেচিত হতে দেখেই নিখিলেশ নারীমুক্তির পুবোধা। নিখিলেশের উক্তি: "চীন-দেশের মেয়েদের পা যেমন ছোট, যেমন বাঁকা। সমস্ত সমাজ যে চারিদিক থেকে আমাদের মেয়েদের মনকে চেপে ছোট করে বাঁকিয়ে রেখে দিয়েচে। ভাগ্য যে ওদের জীবনটাকে নিয়ে জুয়ো খেলেছে—দাম পডার উপরই সমস্ত নির্ভর, নিজের কোন্ অধিকার ওদের আছে।" মধুসূদনের মতো নিখিলেশও মহারাজ, কিন্তু তার মহারাজকীয় আভিজাত্য সুপ্রাচীন ঐতিহ্যনির্ভর, মধুসূদন বৈশ্যরাজ। বিপ্রদাসকে সহৃদয় প্রেমিক-স্বামীর স্থলাভিষিক্ত করে দেখলে নিখিলেশ-চরিত্রের ধারণা হয়। যখন পরিবারে "ভোগের সংসারে খুব অল্প স্ত্রীই যথার্থ স্ত্রীর সম্মান পেয়েচেন," সেই বংশের সেজ ছেলে নিখিলেশ হল একনিষ্ঠ স্বামী এবং স্ত্রী ব্যক্তিত্বের মুক্তি বিধায়ক।

এখানে আমাকে দিয়ে তোমার সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েচে,—তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়েচ তাও জান না।"—নিখিলেশ। "ওঁকে তুমি একবার পৃথিবীটা দেখিয়ে দাও—মানুষকে, মানুষের কর্মক্ষেত্রকে উনি একবার বড় জায়গা থেকে দেখে নিন।''—মাস্টার মশায়। দুয়ে মিলে লেখকের অভিমত ব্যক্ত করেছে। বিমলার নারীত্ব বিকাশে উচিত-অনুচিত আবর্ত সঞ্চারেই সন্দীপের ঔপন্যাসিক প্রয়োজনীয়তা। সক্রিয়তায় সে-ই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। সমালোচকের বিচারে নিখিলেশ নায়ক, সন্দীপ প্রতিনায়ক। কিন্তু সজীব ব্যক্তিচারিত্র্যে ঈর্ষায় আবেগে উদ্দীপনায় এমনকি লালসাযুক্ত নারীপ্রেমে সন্দীপের ফেনিলোচ্ছল জীবনসুরার মতো মাদকতাময় এবং বাস্তব। অন্নদাবাবু, পরেশবাবু নিখিলেশের মতো লেখকের আদর্শ-প্রাণিত হলেও নিখিলেশের চেয়ে তাঁরা অনেক বেশী স্বাভাবিক, অনেক সংগত। তাঁরা বয়সে বৃদ্ধ, বহু অভিজ্ঞতার স্তর পেরিয়ে এসেছেন, দুঃখের অভিঘাতে একটি অধ্যাত্ম সত্যের দীপালোকে আশ্রয় নেওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু নিখিলেশ তরুণ, বিষয় ও বিমলাকে রক্ষা করা সম্পূর্ণ তার দায়িত্ব। সন্দীপ যখন সখ্যের রন্ধ্র দিয়ে নিখিলেশের অন্তঃপুরে শান্তি নষ্ট করল, দেশপ্রেমের উজ্জ্বল রঙে বিমলার দৃষ্টি অন্ধ হল, তখন সে নীরব দ্রষ্টা। অথচ সে জানত, "সন্দীপের প্রকৃতির মধ্যে একটা লালসার স্থূলতা আছে। তার সেই মাংসবহুল আসক্তিই তাকে ধর্ম সম্বন্ধে মোহ রচনা করায় এবং দেশের কাজে দৌরাত্ম্যের দিকে তাড়না করে।" স্বদেশকে উপলক্ষ্য রেখে সন্দীপ-বিমলা ঘনিষ্ঠ হল, "আপনি'' থেকে আলাপ "তুমি''-তে পৌছল। তখন নিখিলেশ মনে মনে ভাবছে: "আমার মোহ ঘুচুক, আমার আবরণ কেটে যাক, আমার পৌরুষ অন্তঃপুরের স্বপ্নের জালে জড়িয়ে পড়ে থাকে না যেন! 'আমরা পুরুষ, মুক্তিই আমাদের সাধনা, আইডিয়ালের ডাক শুনে আমরা সামনের দিকে ছুটে চলে যাব, দৈত্যপুরীর দেয়াল ডিঙিয়ে বন্দিনী লক্ষ্মীকে আমাদের উদ্ধার করে আনতে হবে—যে মেয়ে তার নিপুণ হাতে আমাদের সেই অভিযানের জয়পতাকা তৈরি করে দিচ্ছে, সেই আমাদের সহধর্মিণী।'' এ যেন ভাবুকের কল্পনা-বিন্যাস, উপন্যাস-নায়কের অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই। বহু আত্মগ্লানি আত্মবিচারণার পরে বিমলার মন ফিরেছে সত্যের দিকে। সেজন্যে সন্দীপের কোনো কৃতিত্ব ছিল না। নিভৃত চিন্তার সময় বিমলার শিয়রে বসে নিখিলেশ মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে বটে; কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তার বেদনার অংশ নেয় নি। বিমলা

যেন আপন কক্ষপথ থেকে আপতিক কারণে ভ্রষ্ট হয়ে আবার স্বভাবের প্রবর্তনায় সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। বিমলার স্বাবলম্বী সমাধান নারীশক্তির উপরে লেখকের অবিচলিত আস্থার প্রমাণ। কিন্তু নিখিলেশ চরিত্র নেপথ্যচারী হয়ে উঠেছে। এইভাবে কবির অনবধানবশত একটি মহৎ উপন্যাসের সম্ভাবনা চিরতরে নষ্ট হল।

'ঘরে-বাইরে'-র একটি বৃহত্তর দিক এখনো অনালোচিত। এই প্রসঙ্গেই 'চার অধ্যায়ে'র সমস্যা বিচার্য। রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা, বিশ্ববোধ, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কিত মতামত প্রবন্ধাবলীতে একাধিকবার স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। পাঠকের বিবেক এবং সদিচ্ছা অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মেলে নি, তবু সেগুলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিমত রূপেই শ্রদ্ধেয়। কিন্তু তাদের ঔপন্যাসিক শিল্পায়ণে সমালোচকের বিচার-অঙ্কুশ উদ্যত হয়ে ওঠে। যিনি সাহিত্যে মতামত প্রকাশের বিরোধী যাঁর মতে সাহিত্যের নিজস্ব নিয়মেই সাহিত্য স্বপ্রকাশ, তাঁর রচনায় উগ্র মতের প্রাধান্য প্রত্যাশিত নয়। 'গোরা'য় তর্ক-প্রাধান্য, মতের সংঘাত বিশাল ঔপন্যাসিক ব্যাপ্তির পটে মানায়, 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে তত্ত্ব এবং মতের প্রবেশ বেশ প্রকট, 'চার অধ্যায়ে' এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতবাদ সূচ্যগ্রের মতো উগ্র। তাই 'ঘরে বাইরে'তে যেটুকু সজীব মানবতার স্পর্শ, গল্পের কারুণ্য, মাধুর্য আছে, তার আলংকারিক অতিশয়তা এবং আত্মকথার ত্রুটি বাদ দিলেও উপভোগ্য। কিন্তু "চতুরঙ্গে" লেখকই দ্রুতগতি বিবৃতির মাধ্যমে কাহিনীর উপসংহার করেছেন। গল্পকে স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুটে উঠতে দেন নি। চরিত্রের আভ্যন্তর উদ্বর্তন এবং সারস্বত বিচার (Poetic justic) রক্ষিত হয় নি। "মনের সংসারের সেই কারখানা ঘরে যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে," সেখান থেকে 'গোরা'-র উদ্ভব হলেও "ক্রমে ক্রমে দেখা দিয়েছে গোরা, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ"—ঐতিহাসিক বিচারে মান্য নয়।

কবি রবীন্দ্রনাথ যেমন জীবনের নানা পর্বে সৃষ্টিরহস্য, বিশ্বাত্মবোধ, জীবন-দেবতাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন কাব্যে, উপন্যাসেও শেষ পর্বে তেমনি আত্মগত প্রত্যয়ের বাহুল্য। কবিসুলভ অন্তরাবেগের চেয়ে প্রবীণ চিন্তাশীলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই লিপিবদ্ধ হল। কখনো চন্দ্রনাথ, কখনো অতীনের পরিচ্ছেদে গল্পের মধ্যে আত্মপ্রকাশ এবং উপমা-এপিগ্রাম প্রজ্জ্বলন্ত ভাষণ ঔপন্যাসিক মর্যাদা

নষ্ট করেছে। 'ন্যাশনালিজম্', 'বিশ্ববোধ', 'সমস্যা', 'হিন্দু-মুসলমান' প্রভৃতি প্রবন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত হয়েছে, 'চার অধ্যায়' 'ঘরে বাইরে'তে তারই বলিষ্ঠ রূপায়ণ। সুতরাং মতের যৌক্তিকতা এক্ষেত্রে উপন্যাস মূল্যায়ণে অবজ্ঞেয় নয়। ছিদ্রান্বেষী অপবাদের ভয়ে বা আন্তরিক রবীন্দ্র-প্রশস্তিহেতু এতাবৎকাল এই দুটি উপন্যাসের আলোচনায় প্রেম-কাহিনীকেই মূল্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 'গোরা' 'যোগাযোগে'র লেখকের কাছে সমাজপরিবেশ এত গৌণ, নিরালম্ব বায়ুভূত কোনোদিন ছিল না; এবং তা থাকা উচিতও নয়। সন্ত্রাসবাদ ও অসহযোগে রবীন্দ্রনাথের অনাস্থা সর্বজনবিদিত; কেননা সাহিত্যকর্মে তিনি কখনো আত্মগোপন করেন নি। কিন্তু ভাষণ মঞ্চে যা শোভা পায়, উপন্যাসে একদেশদর্শিতাহেতু তা-ই রসহানি ঘটায়। অগভীর রাষ্ট্রবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠকও জানেন সন্ত্রাসের পথে মুক্তি আসে না; রোমান্টিক অ্যাড্‌ভেঞ্চারে দেশ হয়ে পড়ে উপলক্ষ্য, তখন উত্তেজনা-উদ্দীপনাই প্রধান। কারণ "দেশ মৃণ্ময় নয়, দেশ চিন্ময়।" কিন্তু দেশের জন্য সমর্পিতপ্রাণ যে তরুণ হৃদয়গুলি সেদিন চরম ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিল, প্রাণ বিসর্জনে তিলমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে নি, তারা সকলেই নীতি-বর্জিত, চোর, চোরের অনুচর কিংবা নেতৃত্ব মোহগ্রস্ত ছিল, একথা সত্য নয়। তাহলে ক্ষুদিরাম, বাঘাযতীন সূর্য সেনদের আত্মত্যাগ দেশের পক্ষে আবর্জনা মুক্তির সামিল। অবশ্যই তা রবীন্দ্রনাথের মত নয়। তিনি দেখেছেন, "প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে"। তিনি দেখেছেন, "তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে"। কিন্তু সন্দীপ, ইন্দ্রনাথ, অতীন্দ্র, ছাড়াও যে সন্ত্রাসবাদের অন্যদিক ছিল, তা রবীন্দ্র-উপন্যাসে অনালোচিত।

বিমলার আত্মকথায় আছে—"দেশের নামে ত্যাগ যারা করবে তারা সাধক, কিন্তু দেশের নামে উপদ্রব যারা করবে তারা শত্রু; তারা স্বাধীনতার গোড়া কেটে স্বাধীনতার আগায় জল দিতে চায়।" এই উক্তির নেপথ্যে আছে নিখিলেশ, এবং তার অন্তরালে রবীন্দ্রনাথ। এখানে প্রতিবাদ্য কিছু নেই; কিন্তু একাধিকবার একটি বিবৃতিধর্মী উপন্যাসে যদি তীব্র রূপকে প্রকাশ পায় "সমস্ত দেশের ভৈরবীচক্রে লোক মদের পাত্র নিয়ে বসেছে," তখন লেখকের ঔপন্যাসিক নিরপেক্ষতা নষ্ট হয়। অন্তত সারস্বত বিচারের জন্যও কাহিনীর অন্যবিধ বিস্তার প্রয়োজন ছিল। নরেশ দাশগুপ্ত মায়াময়ী অতীন্দ্র,

কানাই গুপ্ত, ইন্দ্রনাথ কোনো চরিত্রেরই সামাজিক পারিবারিক চেহারা নেই। লেখক দেশজোড়া একটি মহানাটক থেকে বিচ্ছিন্ন চারটি দৃশ্য সংকলন করেছেন। স্বলিখিত একটি প্রস্তাবনাও আছে। তবু কানাই ইন্দ্রনাথ বা অতীন্দ্র-এলার বিদগ্ধ, বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপের আকর্ষণ ছাড়া গল্প জমে নি। তবে সন্ত্রাসবাদের নির্মমতা এবং আদর্শের অন্তঃসারহীনতার সবচেয়ে নির্মম পরিবেশন হয়েছে 'চার অধ্যায়ে'। এলা ও অতীনের মতো প্রাণবন্ত, সুশিক্ষিত কত আদর্শবাদী তরুণের দল দেশের স্থায়ী মহতুপকারে লাগত। অতীনের ভাষণ অমূল্যের দলবৃত্তান্ত উন্মোচনের মতো : "পড়েছি পতনের শেষ সীমায়। সেদিন আমাদের দল অনাথা বিধবার সর্বস্ব লুঠ করে এনেছে। মন্মথ ছিল বুড়ীর গ্রামসম্পর্কে চেনালোক—খবর দিয়ে পথ দেখিয়ে সেই এনেছে দলকে। ছদ্মবেশের মধ্যেও বিধবা তাকে চিনতে পেরে বলে উঠল, মনু, বাবা তুই এমন কাজ করতে পারলি ? তারপরে বুড়ীকে আর বাঁচতে দিলে না।"

বঙ্কিমের উপন্যাসেও ব্যক্তিগত মতামত আছে। ব্রাহ্ম সমাজ এবং বিধবা বিবাহ সম্পর্কে তাঁর মন অনুকূল ছিল না। সূর্যমুখীর মুখে লেখক বলেছেন, "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে নাকি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবা বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত তবে মূর্খ কে ?" দেবেন্দ্র ব্রাহ্ম, তার স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলন কেবল পরের মেয়েকে "বাহির করার অর্থবিশেষে।" কিন্তু বঙ্কিমের সারস্বত বিচার মতের উগ্রতা নমনীয় করেছে। প্রথমটি একটি নারীর উক্তি, সুতরাং পাত্রৌচিত্য রক্ষিত। দেবেন্দ্রের মতো অপদার্থ হিন্দু যুবক (দেবেন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত হলেও হিন্দুমতেই সে কায়স্থকন্যা কুন্দকে বিবাহ করে) তারাচরণও আছে। ব্রাহ্মদ্বেষী শরৎচন্দ্র কেবল রাসবিহারী বিলাসবিহারী আঁকেন নি, দয়াল আচার্যও আছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই স্বদেশীয় মতের ব্যাখ্যানে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে উপন্যাসের শিল্পরূপ ফোটাতে পারেন নি।

শেষ পর্বের 'চতুরঙ্গ', 'দুইবোন', 'মালঞ্চে' লেখক চরিত্রকে প্রায় বিদ্রোহী ভাবনার নির্যাস করে তুলেছেন। কেবল মানুষেরা এখানে কথা কয়, সে কথাও রবীন্দ্রনাথের মনের কারখানা ঘরে বিশেষ করে বানানো। কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ সহজ হয়েছেন, অতিমিতির দোষ বর্জন করে সরল কথ্যভাষার কাব্য-সম্ভাবনা বাড়িয়েছেন। তত্ত্বনির্মোক স্খলিত হয়েছে গভীর মানবিকতার টানে। কিন্তু মতের ব্যাসকূট ক্রমশ উপন্যাসে জড়িয়েছে। এইভাবে বাংলা

সাহিত্যের একটি মহত্তম ঔপন্যাসিক সম্ভাবনা অপূর্ণতায় বিনষ্ট হল। উত্তরাধিকারীদের জন্যে রইল সতর্কবাণী—উগ্রমতপ্রাধান্যে, সে মত সত্য হলেও, উপন্যাসশিল্পের মৃত্যু; এবং মূল্যবান নির্দেশ—উপন্যাস কল্পনার কাগজী ফুল নয়, কোনো হৃদয়াবেগ, জৈব-বৃত্তির তরল চাটুকারিতা উপন্যাসের অন্তঃপ্রেরণা নয়, দেশ-কালের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিমানসের গভীর আত্মিকসমস্যাই মহৎ উপন্যাসের প্রাণ।

১। বালজাক প্রসঙ্গে লুকাক্‌স্: 'It is precisoly this discrepancy between intention and performance, between Balzac the political thinker and Balzac the author of La Comedie Humaine that constitutes Balzac' historical greatness.'

২। শূর্পনখাপত্রের ভূমিকা 'পাঠকবর্গ সেই বাল্মীকিবর্ণিতা বিকটা শূর্পনখাকে স্মরণপথ হইতে দূরীকৃতা করিবেন' বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর কাব্যনায়িকাদের নাম এবং ঘটনাসংস্থান প্রাচীন পুরাণযুগের, কিন্তু তাদের মনোভাব সম্পূর্ণ একালীন। নারীজাগৃতি তখনো আন্দোলনে সীমাবদ্ধ, একালীন নায়িকাদের তার অভিব্যক্তি কীরূপ হবে, বঙ্কিমচন্দ্র-তারকনাথ প্রভৃতির রচনায় তার পরিচয় আছে। কিন্তু মধুসূদনের বীরাঙ্গনায় পরবর্তী ঔপন্যাসিক প্রবণতা বীজাকারে নিহিত।

৩। সেকালে বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, আচায কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, শোনা যায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পজিটিভিজমে বিশ্বাসী ছিলেন। অবশ্য কোঁতের শিষ্য হলেও মিল কোঁতের নির্মম সমালোচনা করেন। বাংলাদেশের বিদগ্ধমহলে উনিশশতকের শেষ ও বিশশতকের প্রথম পাদে যে মানবতাবোধের আইডিয়া তীব্র ছিল, তা অধিকাংশে কোঁতমিলের প্রভাব। কিন্তু বাংলা উপন্যাসে 'জ্যাঠামশায়', 'বিপ্রদাস' ছাড়া আর তৃতীয় পজিটিভিস্ট নেই। 'পুরাতন প্রসঙ্গ'—পৃ ৬৬ ৭০, ১৭৫—১৮০।

৪। লক্ষণীয় যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে প্রায়শঃ প্রবল ব্যক্তিত্ব প্রকাশ প্রায় প্রবল ভাবুকতার আশ্রয়ে। যেমন, গোরা, কুমুদিনী। সম্ভবত লেখকের আত্মপ্রক্ষেপ ঘটেছে এই সব অংশে। ......জীবনস্মৃতি দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

॥ এক ॥

উনিশ শতকে পৃথিবীতে চারজন বড়ো গল্পলেখক এসেছিলেন। গী-দ্য মোপাসাঁ, আন্তন চেকভ, এডগার অ্যালান-পো আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর এই চারজনেরই গল্পরচনার সূত্রপাত হয়েছিল একই কারণে—অর্থাৎ পত্র-পত্রিকার চাহিদা মেটাতে। মোপাসাঁ প্রধানভাবে ফুটে উঠেছিলেন 'গোলোয়া' (Gaulois) আর 'জিল-ব্লা' (Gil-Blas)-র পাতায়, চেকভ হাসির নক্‌সায় হাত পাকাচ্ছিলেন 'অস্‌কলকি' (Oskolki) আর 'বুদিলনিক' (Budilnik)-এর আশ্রয়ে, পো-কে শুরু করতে হয়েছিল 'স্যাটরডে কুরিয়াব' আর 'স্যাটারডে ভিজিটার'-এ, আর রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হয়েছিলেন 'হিতবাদী' পত্রিকায়—এবং 'সাধনাতে'।

১৮৩০ থেকে ১৮৯১—এই একষট্টি বছরের ভেতরে এই চারজনের পদক্ষেপ। এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পো, কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ। বয়েসে চেকভ রবীন্দ্রনাথের চাইতে এক বছরের বড়ো—মোপাসাঁ এগারো বছরের, পো বায়ান্ন বছরের। ঐতিহাসিক বৃত্তরেখার মধ্যে ধরলে প্রথম তিনজনকে প্রায় সামসময়িক বলা চলে। আরো বলা চলে, এই একষট্টি বছরের ভেতরেই আধুনিক ছোটগল্পের পরিপূর্ণ বিকাশ।

"Men and women are better than heroes and heroines"—এই ছিল উনিশ শতকের সাহিত্যপাঠকের মর্মবাণী। ফরাসী বিপ্লবে, চার্টিস্ট আন্দোলন আর চেল্‌সিয়ার রক্তপাতে, যন্ত্রশিল্পের ব্যাপকতায়, আভিজাত্যের অবক্ষয়ে, বুদ্ধিজীবীর ক্রোধ এবং হিউম্যানিজ্‌মে, দুঃখবাদী দর্শনের বিস্তারে আর ডারউইনের নির্মম জ্ঞানাঞ্জন শলাকায়—সব মিলে যেটি সামনে এসে দাঁড়াল তা বাস্তবতার দাবি, জীবন এবং জগৎকে স্পষ্ট প্রত্যক্ষভাবে জানবার আর আর জানাবার আকুলতা। স্বভাবতই ঊর্ধ্বারোহী কবিতা এই দাবি এবং

আকৃতিকে ফোটাবার পক্ষে উপযুক্ত পরিবাহ নয়—অতএব ঔপন্যাসিক হয়ে আসতে হল ফ্লোবের-স্তাঁধাল-জোলাকে। আর যে-সব জিজ্ঞাসা, যে সমস্ত জ্বালা, দৈনন্দিনতার যে-সব ছোটখাটো প্রেম-বেদনা-বৈচিত্র্য জীবনে খণ্ড খণ্ড হয়ে আসে, তারা আত্মপ্রকাশের আধার পেল ছোটগল্পে।

আধেয় ছিল যুগচেতনায়—আধার আনল পত্র-পত্রিকা। সপ্তাহে সপ্তাহে মাসে মাসে পাঠককে খুশী করবার মতো, তার মনের চাহিদা মেটাবার মতো সরস গল্পবস্তু পরিবেষণ করতে হবে। কিছুকাল আগেও এ-কাজ করত 'Essay' বা 'রচনা-সাহিত্য'—তার জায়গা দখল করল ছোটগল্প। দীর্ঘ-বিলম্বিত উপন্যাস নয়—সংক্ষিপ্ত রচনা চাই; পত্রিকার পাতায় স্থানাভাব, অতএব তিন-চার কলমের মধ্যে শেষ করতে হবে। এই সম্পাদকীয় শাসনে বাধ্য হয়ে লেখককে নির্বাচন করতে হল ছোট ঘটনা, সংক্ষিপ্ত ব্যাপ্তি, একটি ক্লাইম্যাক্স্ এবং শেষ পর্যন্ত একটি চমকপ্রদ বা নিশ্চিত গভীর পরিণাম। যুগচিন্তায় উদ্ধারিত এবং পত্রিকার শাসনে নিয়ন্ত্রিত হয়ে এইভাবেই উনিশ শতকে ছোটগল্প তার শিল্পরূপ পেল।

যে কারণে, যে মননে যে-কালপ্রভাবে মহাপৃথিবীতে ছোটগল্প এল, বাংলা দেশেও তারই স্বাভাবিক এবং ঐতিহাসিক অনুসৃতিতে প্রথম সার্থক আর আধুনিক ছোটগল্প লিখলেন রবীন্দ্রনাথ। সে গল্প দেখা দিল ১৮৯১ সালে—"সাপ্তাহিক হিতবাদী"র পাতায়।

পত্র-পত্রিকার চাহিদা না থাকলে এ-কালের ছোটগল্প আদৌ জন্ম নিত কিনা অথবা আরো কতদিন পরে জন্ম নিত, তার জবাব আদিগুরু এড্‌গার অ্যালান-পো-ই দিতে পারতেন। অন্তত বাংলা দেশে "হিতবাদী" পত্রিকা না এলে কবি-নাট্যকার-প্রাবন্ধিক-ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প লিখতেন কিনা এ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। প্রায় শৈশব থেকে যাঁর সাহিত্য-সাধনা শুরু—ত্রিশ বছর বয়েসে তিনি আরম্ভ করলেন গল্প লিখতে। "হিতবাদী"র তাগিদ না থাকলেও হয়তো কোনোদিন তাঁর গল্প আসত—হয়তো আরো কুড়ি-পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পরে; আর তার ফলে তাঁর অনেক আশ্চর্য, উজ্জ্বল, অসামান্য গল্প থেকে আমরা চিরদিনের মতো বঞ্চিত হতাম।

"হিতবাদী"পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, দার্শনিক পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, তার সাহিত্য-সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সাহিত্য-সম্পাদক তখন বোট ভাসিয়েছেন পদ্মার বুকে। নানা কারণেই মন অশান্ত। দেশের নরমপন্থী এবং চরমপন্থী—এই দুই রাজনৈতিক দলের সংঘাতে চিন্তা দ্বিধাগ্রস্ত। নাগরিক জীবন থেকে দূরে সরে এসে রোম্যান্টিক প্রকৃতি-সম্ভোগ আর সৌন্দর্যবিলাসের মধ্যে তাঁর দিন কাটছে। আর সেই প্রকৃতির পটভূমিতে যে সহজ সরল মানুষ নিজের ছোটখাটো সুখদুঃখ আনন্দ-বেদনা নিয়ে পদ্মার ঢেউয়ের মতো জাগছে, ভাঙছে, মিলিয়ে যাচ্ছে, তারাও এসে তাঁর সৃষ্টির ভেতরে বাসা নিয়েছে। দিগ্‌বিকীর্ণ ধু-ধু মাঠ, নদীর জল, "কাঁপনলাগা ঝাউয়ের শিরে" শুকতারা-সন্ধ্যাতারা—এদের নিয়ে তাঁর মন ভেসে চলেছে কল্পনার সোনার তরীতে; আর গ্রাম্য পোস্টমাস্টার, বেদে বাউল, শ্বশুরবাড়ি যাত্রিণী পাড়াগেঁয়ে ছোট মেয়েটি, কাঠের মাস্তুল গড়িয়ে গড়িয়ে খেলা-করা কতগুলি ছেলেমেয়ে—এরা তাঁর গল্পের উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

"হিতবাদী"তে রবীন্দ্রনাথ গল্প লিখেছিলেন মাত্র গুটি ছয়েক। 'দেনা-পাওনা' আর 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা'য় সমাজ-সমালোচনা, 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি'তে বাস্তবের সংঘাতে ভাববিলাসীর ট্র্যাজেডি, 'গিন্নী'তে একটি শৈশবস্মৃতির পটভূমিতে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের ব্যঞ্জনা আব 'পোস্টমাস্টার' জীবন এবং প্রকৃতির ঐকতান।

এই গূঢ়-গভীর গল্পগুলি পাঠকদের কেমন লেগেছিল কে জানে, কিন্তু "হিতবাদী"র কর্তৃপক্ষের মনঃপূত হয় নি। সাপ্তাহিক পত্রিকার পাতায় তাঁরা আরো তরল-রসের জোগান চেয়েছিলেন। সুতরাং "হিতবাদী"র পাতা থেকে গল্পলেখক রবীন্দ্রনাথকে বিদায় নিতে হল।

এরই মধ্যে "সাধনা" পত্রিকা দেখা দিল ঠাকুরবাড়ির নেতৃত্বে—সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। "হিতবাদী" থেকে গল্প-লেখক রবীন্দ্রনাথ চলে এলেন "সাধনার" পাতায়। তারপর "গল্প লিখি এক একটি করে।" ১৮৯১ থেকে ১৯০১, এই এগারো বৎসরের মধ্যে দুহাতে ছোটগল্প লিখলেন রবীন্দ্রনাথ। কঙ্কাল, অতিথি, ত্যাগ, একরাত্রি, কাবুলিওয়ালা, ছুটি, শাস্তি, সমাপ্তি, মেঘ ও রৌদ্র, বিচারক, নিশীথে, মানভঞ্জন, ক্ষুধিত পাষাণ, রাজটীকা, দুরাশা এবং নষ্টনীড় পর্যন্ত সেরা গল্পগুলো এই সময়ে লেখা হয়ে গেল।

এই সময়টিকে বলা যায় তাঁর গল্প-সাহিত্যের প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হল ১৯১৪ সালে—প্রথম চৌধুরীর "সবুজপত্রে"র আবির্ভাবে।

বাংলা সাহিত্যে এক ঝলক উদ্দাম মৌসুমী হাওয়ার আনন্দ নিয়ে এল "সবুজপত্র"। বক্তব্যে নতুন, বলার পদ্ধতিতে নতুন। বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, ইওরোপীয় চিন্তা-বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে সন্নদ্ধ, আধুনিকতায় দীপ্ত এই পত্রিকার পাতায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন "সবুজের অভিযান", চির-যৌবনের বাণী শোনালেন "ফাল্গুনী" নাটকে, লিখলেন অনেকগুলি খরধার প্রবন্ধ আর ঝড় জাগানো উপন্যাস "ঘরে বাইরে"। সেই সঙ্গে কয়েকটি ছোট গল্প—যাদের একটির নাম "স্ত্রীর পত্র।"

তারপর থেকে গল্পের ধারা অনিয়মিত। মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো লেখা। শেষ দীপ্তি পড়েছে ল্যাবোরেটরীর সোহিনীর ওপর—যেখানে দিনান্তিক আলোয় এই আশ্চর্য অসামান্য নারীটি প্রলোভনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জ্ঞানের সাধনায় তন্ময় হয়ে বসবে এমন একটি শক্তিমান সাধকের জন্য প্রতীক্ষা করে করে ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে।

॥ তিন ॥

"হিতবাদী", "সাধনা" এবং "সাধনার" পরে আরো কয়েকটি বৎসর—এই সময়টিই বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার প্রধান কাল। পূর্ণ যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বে পদক্ষেপ পর্যন্ত এই কালটুকুতে রবীন্দ্রনাথের মন গল্পের নেশায় আচ্ছন্ন। আর এর মধ্যেই বাংলা ছোটগল্প তাঁর হাতে ভাবে এবং রূপে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

প্রথম পর্যায়ের গল্পগুলোকে মোটামুটি এইভাবে ভাগ করা যেতে পারে :

(ক) সমাজ সমস্যা : দেনাপাওনা, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, বিচারক, সমস্যা পূরণ, অনধিকার প্রবেশ, ত্যাগ, মানভঞ্জন, নষ্টনীড় ইত্যাদি।

(খ) পারিবারিক : শাস্তি, দর্পহরণ, স্বর্ণমৃগ, কাবুলিওয়ালা, দানপ্রতিদান, মধ্যবর্তিনী, ব্যবধান, খাতা।

(গ) জীবন ও প্রকৃতি : পোস্টমাস্টার, অতিথি, সুভা, একরাত্রি, সমাপ্তি।

(ঘ) রোমান্স : মণিহারা, ক্ষুধিত পাষাণ, দুরাশা, দালিয়া, জয়পরাজয়।

(ঙ) রাজনীতি : মেঘ ও রৌদ্র, দুর্বুদ্ধি, রাজটীকা।

(চ) অন্যান্য : কঙ্কাল, প্রায়শ্চিত্ত, গুপ্তধন, নিশীথে, ডিটেকটিভ, গিন্নী ইত্যাদি।

এদের বিস্তৃত পরিচয় দেবার অবকাশ এখানে নেই। দুটি একটি বেছে নিয়ে গল্পলেখক রবীন্দ্রনাথের সফলতা অনুধাবন করা যাক।

সমাজ-সমস্যার দিক থেকে দেনা পাওনা বরপণ প্রথার হৃদয়হীনতার ছবি। রামকানাইয়ের নিবুর্দ্ধিতায় দেখানো হয়েছে সত্যনিষ্ঠ ধর্মভীরু মানুষ এ যুগে উপেক্ষিত এবং লাঞ্ছিত। বিচারক গল্পে অপরাধী বসেছে বিচারকের আসনে —তলস্তয়ের রিসারেকশনের একটি সুপরিচিত অংশকে মনে করিয়ে দেয়। ত্যাগ গল্পে প্রেমের শক্তিতে হেমন্ত শেষ পর্যন্ত সমাজের সমস্ত শাসনকে উপেক্ষা করতে পেরেছে—মানভঞ্জনের গিরিবালা গোপীনাথের অন্তঃপুর ভেঙে নিজের বিদ্রোহী শক্তিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

এই গল্পগুলোর মধ্যে নষ্টনীড়ই সব চাইতে উল্লেখ্য। বাংলা সাহিত্যের সংস্কার অনুযায়ী আয়তনে এটি ছোট উপন্যাস, চরিত্রধর্মে ছোটগল্প। তিনটি চরিত্রের আশ্রয়ে অনিবার্য নিপুণতায় গল্পটি অগ্রসর হয়েছে—অপরিসীম সংযমে একটি অতিরিক্ত শব্দকেও স্থান দেন নি লেখক। আদর্শ ছোটগল্পের তির্যকতা, সংকেতধর্মিতা এবং সুনিশ্চয়তায় নষ্টনীড় অসামান্য।

সব চেয়ে জ্বলন্ত নষ্টনীড়ের অগ্নিবর্ণ জিজ্ঞাসা। বাংলা সাহিত্যে এমন দুঃসাহসিক গল্প এর আগে আর লেখা হয় নি। সম্পর্কের বিধি-নিষেধকে ভেঙে দিয়ে যে প্রেম চারুর জীবনে এসে উপস্থিত হয়েছে অথচ যার পরিণতি কোথাও নেই—তা চেকভের "The Lady with the Dog"-কে মনে করিয়ে দেয়। একটা বিষণ্ণ বেদনার মধ্যে চেকভের গল্পটি শেষ হয়েছে, কিন্তু নষ্টনীড়ের সমাপ্তিতে চারু আর ভূপতির অসহ্য অগ্নিদহন ছাড়া আর কিছুই নেই। যেমন অসমসাহসী বক্তব্য—তেমনি অসামান্য সমাপ্তি। কোথাও মেলাবার চেষ্টা নেই, সমাধানহীন সমাধানের কোনো নিরর্থক নির্দেশ দেওয়ার প্রয়াস নেই—ছোটগল্পের উজ্জ্বলন্ত জিজ্ঞাসার উপরেই গল্পটিতে দাঁড়ি টেনে দেওয়া হয়েছে। বক্তব্যে এবং রীতিতে নষ্টনীড় বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত সমস্ত কোডের বাইরে—আধুনিক রবীন্দ্রনাথের হাতে এই গল্পটি আধুনিকতম। একমাত্র নষ্টনীড় লিখেই গল্পকার রূপে রবীন্দ্রনাথ স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন।

পারিবারিক গল্পগুলোর ভেতরে ফাঁসির মঞ্চে যাত্রিনী "শাস্তি"র অভিমানিনী নায়িকা চন্দরা রবীন্দ্রনাথের অকৃপণ মমতা দিয়ে গড়া। এই গল্পটি পড়ে "সাহিত্যে"র সম্পাদক সুরেশ সমাজপতির বিভ্রান্তি ঘটেছিল, গল্পটি লিখে রবীন্দ্রনাথ কাকে শাস্তি দিতে চেয়েছেন সেটি তাঁর বোধগম্য হয় নি। কিন্তু গল্পটি সমাজপতির কাছে যতই দুর্বোধ্য হোক— পদ্মার তীর থেকে তুলে-আনা গ্রাম্য কৃষক বধূর এই ছবিটিও বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচিত "মৌবীফুল" গল্পের সুশীলার ওপর চন্দরার ছায়া দুর্লক্ষ্য নয়।

কাবুলিওয়ালায় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বচেতনার বিম্বন। মানুষের স্বাভাবিক মমতাকে দেশ-জাতি-ধর্মের গণ্ডীর বাইরে ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।

পারিবারিক পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ দুটি গল্প বলা চলে মধ্যবর্তিনী এবং খাতাকে। নিঃসন্তান নিবারণ স্ত্রী-হরসুন্দরীর অনুরোধে একটি ছোট মেয়ে শৈলবালাকে বিয়ে করেছিল। শৈলবালা বেশি দিন রইল না—নিজের অসন্তোষ, অসুখ এবং অশান্তি দিয়ে সংসারটিকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে মৃত্যুর মধ্যে বিদায় নিল। স্বামী-স্ত্রী আবার পূর্বজীবনে ফিরে এল: "পূর্বে যেরূপ পাশাপাশি শয়ন করিত এখনও সেইরূপ পাশাপাশি শুইল, কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটি মৃত-বালিকা শুইয়া রইল, তাহাকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিল না।"

শেষের একটি মাত্র বাক্যে অতি সাধারণ গল্পটি অসাধারণ হয়ে উঠেছে। অবাঞ্ছিতভাবে যে এসেছিল, সে দুজনকে নিষ্কণ্টক করে দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাঝখানে যে ছায়াটি সে রেখে গেছে—সে কোনোদিন সরবে না, "There falls thy shadow Cynara—" দুজনের মনের ওপর ভারের মতো চেপে থাকবে। ছোটগল্প রচনার যে বিশেষ গুণটির জন্যে চেকভকে "The Master" বলা হয়ে থাকে, এই গল্পটি সেই উৎকর্ষে দীপ্ত।

আর একটি গল্প "খাতা"। "লিখিতে শিখিয়া অবধি উমা বিষম উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে।" এই ছোট মেয়েটির মনের কথার প্রতীক তার খাতাটি স্বামী প্যারীমোহন কেড়ে নিয়েছে—কিন্তু প্যারীমোহনের "সূক্ষ্মতত্ত্বকণ্টকিত বিবিধ প্রবন্ধ পূর্ণ" খাতাটিকে কেড়ে নিয়ে ধ্বংস করতে পারে—এমন "মানব-হিতৈষী" কেউ নেই—এইটিই রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘশ্বাস।

বিষয়বস্তু সামান্য, কিন্তু ব্যঞ্জনায় অসামান্য। কত সহজ উপকরণের আশ্রয়ে কতখানি গভীরে যাওয়া যেতে পারে, এই গল্পটি তার চমকপ্রদ

উদাহরণ। উমার তুচ্ছ লেখার খাতাটি কেড়ে নেওয়ার মধ্যে নিষ্ঠুরতা প্রকাশিত হয়েছে—তা যেন রক্ষণশীল বাঙালী পরিবারের একটা সর্বাঙ্গীণ পেষণকে ফুটিয়ে তুলেছে, উমার মতো লক্ষ লক্ষ মেয়ের চাপা-কান্না গল্পটির মধ্যে এসে ফেটে পড়েছে।

প্রকৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক চেতনা বিকশিত হয়ে উঠেছিল বিহারীলালের কাব্যপাঠের ফলে, ইংরেজী সাহিত্যের নিও-রোম্যান্টিক কবিদের আত্মীকরণের মাধ্যমে। পদ্মা—শিলাইদহ—সাজাদপুর, চর, ধান-ক্ষেত, বনঝাউ, আকাশ—এরা সকলে মিলে তাঁর গল্পে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করল। তারা মাত্র প্রেক্ষাপট হযেই রইল না, মাত্র অলংকরণের দায়িত্বই নিল না, এক-একটি সজীব চরিত্র হয়ে কোনো কোনো গল্পে পরিণামও নির্ধারণ করল। কখনো বা প্রকৃতি আর মানুষ এক হয়ে গেল—যেমন 'সুভা' গল্পের সুভা, 'ছুটি'র ফটিক। সুভা কথা বলতে পারে না, কিন্তু: "প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিযা দেয। যেন তাহার হইয়া কথা কয়। নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝিব গান, পাখির ডাক, তরুর মর্মর ধ্বনি, সমস্ত মিশিয়া চারিদিকের চলাফেবা—আন্দোলন—কম্পনের সহিত এক হইয়া, সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায়, বালিকার চিরনিস্তব্ধ হৃদয উপকূলের নিকটে আসিযা ভাঙিয়া পড়ে।" ওয়ার্ডস্‌ওযার্থেব 'রুথে'র সঙ্গে সুভার মিল লক্ষ্য করবাব মতো:

> "And she had made a pipe of straw,
> And music from that pipe could draw
> Like sounds of winds and floods ;
> Had built a bower upon the green,
> As if she from her birth had been
> An infant of the woods.
> Beneath her father's roof, alone
> She seemed to live ; her thoughts her own ;
> Herself her own delight—"

কিন্তু মানুষের ছলনা যেমন এই মেয়েটিকে ব্যর্থ করে দিল, তেমনিভাবেই প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্নসত্তা সুভাকে নিয়ে আসা হল জীবনের জটিলতার মধ্যে—যেখানে কেউ তাকে এতটুকুও বুঝতে পারল না, কেউ তার বেদনার মূল্য

দিল না। ফটিক চক্রবর্তীর কাহিনীও এই—'ডাকঘরের' অমলের পূর্ব-সংকেত এই চরিত্রটি শেষ পর্যন্ত মৃত্যু-মুক্তির পথ দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে পুনর্মিলিত হল।

পোস্টমাস্টারের জীবনে রতনের প্রেম এসেছিল প্রকৃতির প্রেমের মতোই; বসন্তের ফুলকে ধরে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা যেমন বৈশাখের দীর্ঘশ্বাসে হারিয়ে যায় —এই গল্পের পরিণামও ঠিক তাই। প্রকৃতির ধূসর উদাস বিষণ্ণতার মধ্যেই ছোট জীবননাট্যটুকুর সমাপ্তি ঘটেছে।

'অতিথি'র তারাপদ প্রকৃতির আহ্বানে মানুষের স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়েছে। সে-ও ক্ষণ-বসন্তের অতিথি, বাঁধা পড়তে না পড়তেই তার বিদায়। কাল-বৈশাখীর আঘাতে বসন্তের মুক্তি, তাই যখন "মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে—" তখন কাঁঠালিয়া গ্রাম আর তাকে ধরে রাখতে পারে নি।

এক রাত্রি'তে প্রকৃতির আর এক ভূমিকা। ব্যর্থ-বঞ্চিত সেকেণ্ড মাস্টারের জীবনে একটি রাত্রির প্রলয়-মুহূর্ত তাকে চিরকালের পাথেয় দিয়ে গেছে। ভাষায়, ভাবে, সংকেতে—এই গল্প উঁচুদরের লিরিক্ কবিতা।

মানস ধর্মে রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ রোম্যান্টিক—এই রোমান্স সব চেয়ে চড়া পর্দায় উঠেছে ক্ষুধিত পাষাণ, মহামায়া আর দুরাশায়। প্রথম গল্পটি সম্প্রতি চলচ্চিত্রায়িত হয়ে অর্থকরী সাফল্যের একটি রেকর্ড করেছে—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মর্যাদা রক্ষা করে নি। এটি ভৌতিক গল্প নয়—ভৌতিক গল্প একটিও তিনি রচনা করেন নি। অতি মাত্রার মানসিক স্পর্শাতুরতা এবং পরিবেশ-প্রভাবই "ক্ষুধিত পাষাণ", "মণিহারা" এবং "নিশীথে"-র সৃষ্টি উৎস। আরালী পর্বতের বিবিক্ত প্রেক্ষাভূমি, শ্বেতপাথরের জনহীন বিশাল প্রাসাদ এবং হিংস্র উন্মত্ত বিলাস-সম্ভোগের স্মৃতি, তুলাব মাশুল-কালেক্টারের মনে যে "বস্তু থেকে সত্যতর" মায়ার সৃষ্টি করেছে—সেইটিই এই গল্পের প্রধান ঐশ্বর্য। এই মায়া যাতে কিছুতেই না ভাঙে—সেইজন্য একটি বাস্তব-কাহিনীর রেখাবৃত্ত পড়বার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর মতোই গল্পটি লেখক শেষ করে দিয়েছেন— আরবের মরুভূমিতে ঘোড়া ছুটিয়ে নায়ককে "জাতিস্মর" করবার প্রয়োজন অনুভব করেন নি।

সমস্ত গল্পটি নিস্তব্ধ নিশিরাত্রের এক আশ্চর্য রাগিণী; তার সঙ্গে সহযোগিতা করেছে আরালী পর্বত, শুস্তার নীল-নির্মল জলে নেমে যাওয়া "পাথর বাঁধানো দেড়শত সোপান", "বনতুলসী, পুদিনা আর মৌরির জঙ্গল" থেকে ঘন গন্ধবহ

বাতাস, পাহাড়ের চূড়ায় নিঃসঙ্গ তারাটি—প্রত্যেকেই যেন এক একটি বাদ্যযন্ত্র। সর্বোপরি গল্পটির ভাষা। গান শেষ হয়—সুরের মায়া মিলিয়ে যায়, অথচ মনের ওপর থেকে মোহের আবরণ সরে যেতে চায় না—ক্ষুধিত পাষাণের এইটিই ফলশ্রুতি।

রোম্যান্টিকতার আর একদিক "মহামায়া"। রোমান্স-সৃষ্টির একটি প্রধান উপকরণ কালগত দূরত্ব রচনা করা—যার ফলে পাঠকের মন আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকে—তাকে সহজেই গল্পটির মধ্যে আকর্ষণ করে নেওয়া যায়। রাজীব এবং মহামায়ার এই বিচিত্র কাহিনীটি তাই সেই পটভূমিতেই কল্পিত হয়েছে—যেখানে কৌলীন্য এবং সহমরণ প্রথা তার নিষ্ঠুর নগ্নমূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

চিতা থেকে উঠে এসে মহামায়া মিলিত হল রাজীবের জীবনে। কিন্তু মহামায়ার মুখে কঠিন নিষেধের মতো এক অবগুণ্ঠন—যা প্রতি মুহূর্তে রাজীবের স্নায়ুকে ছিন্ন-দীর্ণ করে দিচ্ছে, অথচ যে অবগুণ্ঠন সরাবার কিছুমাত্র শক্তি বা সাহস তার নেই। এ যেন কিউপিড্ আর সাইকির পৌরাণিক গল্পের আর এক দিক। শেষ পর্যন্ত রাজীবের অসহ্য হয়ে উঠল, ঘুমন্ত মহামায়ার মুখের ওপর থেকে আবরণ দিল সরিয়ে—দেখল সেই অপূর্ব আগ্নেয় সৌন্দর্য আর নেই: "চিতানল শিখা তাহার নিষ্ঠুর লেলিহ রসনায় মহামায়ার বামগণ্ড হইতে কিয়দংশ সৌন্দর্য একেবারে লেহন করিয়া লইয়া আপনার ক্ষুধার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।"

মহামায়া জেগে উঠল। তারপর তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। "সেই ক্ষমাহীন চিরবিদায়ের নীরব ক্রোধানল রাজীবের সমস্ত ইহজীবনে একটি সুদীর্ঘ দগ্ধচিহ্ন রাখিয়া দিয়া গেল।"

মহামায়ার এই উজ্জ্বল-ভয়ঙ্কর অক্ষমার মধ্যে যে-পরিমাণে রোম্যান্টিক কল্পনা আছে, সে পরিমাণে বাস্তবতা নেই। রাজীব এবং মহামায়ার প্রেমের মধ্যে যদি কোনো সত্য থাকত, তাহ'লে এই অবগুণ্ঠন অনেক আগেই সরে যেত। বিশেষ করে রাজীবের মতো শান্ত ভীরু ব্যক্তিত্বটি রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় "ভালো মন্দ সুখ দুঃখ মিলায়ে সকলি" মহামায়াকে জীবনে স্বীকার করে নিত। কিন্তু মহামায়ার উগ্র আত্মসচেতনা—চিরকাল যে রাজীবের পুজো নিয়েছে সে কখনো তার করুণার কাছে নত হবে না, এই মনস্তত্ত্বই গল্পটিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং সম্ভাব্য জীবনধর্মের কাছ থেকে সরে গিয়ে পরিণামে বিশুদ্ধ রোম্যান্টিকতায় আশ্রিত হয়েছে।

"দুরাশা"ও এই রোম্যান্টিকতা-নির্ভর। ক্ষুধিত পাষাণের মতোই এটিও রবীন্দ্রনাথের একটি সেরা গল্প। সমারসেট মম এই গল্পের কোনো ইংরেজী অনুবাদ পড়ে "Red" লেখার প্রবুদ্ধ হয়েছিলেন কিনা বলা যায় না।

দুরাশাকেও সিপাহী-বিদ্রোহের পটভূমিতে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে রোমান্সের পরিমণ্ডলটি রচনা করা হয়েছে। তারপর কেশরলালের প্রত্যাখ্যান, নবাবকন্যার তপস্যা এবং শেষ পর্যন্ত নিদারুণ মোহভঙ্গের আঘাত গল্পটিকে ট্র্যাজিক পরিণতি দিয়েছে। কিন্তু এই ট্র্যাজেডী যতটা রোম্যান্টিকতা-সম্ভব, সে পরিণামে জীবনসিদ্ধ নয়। দীর্ঘ দিনের তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধন—তিলে তিলে আত্মনিগ্রহ—এই মেয়েটিকে স্বাভাবিক নিয়মেই ক্রমশ নির্মোহ এবং নিরাসক্ত করে আনত—প্রথম যৌবনের শ্রদ্ধামিশ্রিত অত্যুগ্র প্যাশান অনেক আগেই স্তিমিত হয়ে যেত, জীবনের শেষপর্বে "সেলাম বাবু সাহেব" বলে তাকে আর ভ্রম-সংশোধন করতে হত না।

সুতরাং গল্পটির ভিত্তিতে একটি রোম্যান্টিক্ আইডিয়াই বিদ্যমান—তারই ওপর কল্পনার ফুল ফুটিয়েছেন লেখক। কিন্তু এখানেও সেই "বস্তু হতে সত্যতর" মায়ারই রূপায়ণ—গল্পের উৎকর্ষও সেইখানেই।

রাজনৈতিক রূপে কয়েকটি গল্পকে চিহ্নিত করেছি বটে, কিন্তু ঠিক রাজনীতি-নির্ভর এদের বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশিক (ইংরেজী মতে কখনোই ন্যাশানালিস্ট্ নন—সে বস্তুটির তিনি চিরবিরোধী), এই স্বাদেশিকতার মূল ভারতীয় ভাব-সাধনার গভীরে নিহিত। "পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব তোমারই উত্তরীয়"—এ তাঁরই সংকল্পবাক্য; কিন্তু দেশের চলিত রাজনীতির কার্যক্রমের সঙ্গে বারেবারে তাঁর বিরোধ ঘটেছে। তাঁর বক্তব্য অনুসারে জীবন সমস্ত রাজনৈতিক আলোড়নের উর্ধ্বে—সেই জীবনের পূর্ণ মূল্য দিয়েই মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সম্ভব। এই কারণেই "এক রাত্রি"র নায়ককে "ভারত উদ্ধারের" ক্ষেত্রে কটাক্ষ করা হয়েছে; নিখিলেশ-বিমলার ভাবদ্বন্দ্ব হিউম্যানিজমের বিস্তৃতির মধ্যে মুক্তি পেয়েছে, বাংলা দেশের বিপ্লবী আন্দোলনকে সম্পূর্ণ অপব্যাখ্যা করে অতীন আর এলার ট্র্যাজেডী টেনে আনা হয়েছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্পূর্ণ চেনা যাবে "মেঘ ও রৌদ্র" গল্পে। অতি-বিস্তারের ফলে গল্পটির ভারসাম্য থাকেনি, বক্তব্য হয়েছে দ্বিধাগ্রস্ত এবং শিল্পগত "ইউনিটি"ও রক্ষিত হয় নি। প্রকৃতির বুকে মেঘ আর রৌদ্রের খেলার মতো

শশিভূষণ আর গিরিবালার মধ্যে যে সম্পর্কটি গড়ে উঠেছিল (ঠিক প্রেম বলা যায় কি ?), সেই আলো-ছায়ায় দোলাটুকুই যে জীবনের সব চাইতে বড়ো সঞ্চয়—সে কথা গল্পের নায়ক শশিভূষণ ভুলে গিয়েছিলেন। বাইরের ক্ষীণ-দৃষ্টির মতো তাঁর মনের দৃষ্টিও ছিল নিষ্প্রভ, তাই এক রাত্রির নায়কের মতোই এই সহজ প্রাপ্তিটুকুকে তুচ্ছ করে তিনিও ছুটেছিলেন কর্তব্যের দুঃসাধ্য সাধনায়। তারপর জেল থেকে যখন প্রায় অন্ধ হয়ে নিঃসঙ্গ রিক্ত শশিভূষণ বেরিয়ে এলেন, তখন বিধবা গিরিবালার শুভ্র-শুচি বেদনাটিই তাঁকে বরণ করে নিলে : "আমার সব সুখদুখ মন্থন ধন অন্তরে ফিরে এসো।"

এই গল্পে আমলাতান্ত্রিক ইংরেজের মদমত্ত বর্বরতাকে চূড়ান্ত ধিক্কারে জর্জরিত করা হয়েছে, দাসমনোবৃত্তির তাড়নায় মেরুদণ্ডহীন দেশবাসীও সেই মহৎ ক্রোধের আঘাত থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। কিন্তু গল্পের গতি সেদিকে অগ্রসর হয় নি। "ছিন্নপত্রে" এই গল্পটির জন্মলগ্ন সম্পর্কে তিনি লিখছেন : "আজ সকাল বেলায় তাই গিরিবালা নাম্নী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি ছোট অভিমানিনী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণা করা গেছে। সবে মাত্র পাঁচটি লাইন লিখেছি এবং সে পাঁচ লাইনে কেবল এই কথা বলেছি যে, কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজ বর্ষণ-অন্তে চঞ্চল মেঘ এবং চঞ্চল রৌদ্রের পরস্পর শিকার চলছে—হেনকালে পূর্বসঞ্চিত বিন্দু বিন্দু বারি-শীকরবর্ষী তরুতলে গ্রামপথে উক্ত গিরিবালার আসা উচিত ছিল, তা না হয়ে আমার বোটে আমলাবর্গের সমাগম হল।" এই "আমলাবর্গে"র আগমন যেমন লেখকের অবাঞ্ছিত, তেমনি শশিভূষণের জীবনে বহির্জগতের বৃহৎ কর্মের আহ্বান রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগে নি।

"মেঘ ও রৌদ্রে"র যে সমাধান টানা হয়েছে, তা পাঠকের মনকে কতখানি তৃপ্ত করবে বলা কঠিন। এই সিদ্ধান্ত কিন্তু সমগ্রভাবে রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিমিশ্র কথা-সাহিত্যের সর্বত্রই লক্ষণীয়। পরে এ সম্বন্ধে আরো কিছু আলোচনা করা যাবে।

"দুর্বুদ্ধি" দেশী আমলাতন্ত্রের হৃদয়হীনতা এবং নির্লজ্জ লোভের এক ভয়ঙ্কর কাহিনী। অসাধারণ বলিষ্ঠ এই গল্প—অপূর্ব বাস্তব। দারোগা এবং ডাক্তারের যে পাপচক্র এই গল্পে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে—শোষিত অবমানিত জনসাধারণের বেদনা যেভাবে এর মধ্যে উপস্থাপিত করা হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের আর কোনো ছোট গল্পে তা দেখা যায় নি। "মাঝে মাঝে গেছি আমি ও-পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে"—কিন্তু ভেতরে প্রবেশ না করতে পারার যে স্বীকারোক্তি আধুনিক

কালের কাছে তিনি উপস্থিত করেছিলেন তার মধ্যে যে সম্পূর্ণ সত্য নেই, এই গল্পই তার প্রমাণ দেবে। রবীন্দ্রনাথের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং প্রায় অপঠিত গল্পটি সত্যাশ্রয়ী সৎসাহসী রবীন্দ্রনাথকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

"রাজটীকা" গল্পটি কিছুটা কৌতুকভিত্তিক হয়েও স্বাদেশিকতায় অনুপ্রাণিত। ঠাকুরবাড়ির জাতীয়তাবাদের বিশিষ্ট মনোভঙ্গিটি এই গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে।

অন্যান্য বিচিত্র রসের গল্পগুলির মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় "নিশীথে" এবং "গিন্নী"। প্রথম গল্পটির প্রেত-প্রত্যয় হীনম্মন্যতার এবং অপরাধবোধের তীব্র মনস্তাত্ত্বিক সংঘর্ষে অপরূপ শিল্পবস্তুতে রূপায়িত হয়েছে। "গিন্নী" আরো সার্থক সৃষ্টি। আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে লেখা এই ছোটগল্পটি এ-যুগের পক্ষেও অসাধারণ আধুনিক। কী তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যে জীবনের কতখানি গভীরতাকে আভাসিত করা যায়—এই গল্প তার প্রমাণ। পড়তে পড়তে প্রসঙ্গত মোপাসাঁর "Miss" গল্পটি মনে আসে, কিন্তু "গিন্নী" তার চাইতে অনেক উঁচু দরের গল্প।

"সাধনা"র সঙ্গে সঙ্গেই ("ভারতী" এবং "বঙ্গদর্শনে"ও কয়েকটি ছিল) রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের গল্পগুলি শেষ হয়েছে। এদের মধ্যে বস্তু-বৈচিত্র্য এবং চরিত্র-বৈশিষ্ট্য যাই থাক—সামগ্রিকভাবে যেন প্রকৃতির একটি নিবিড় ছায়া—পদ্মার ওপর বিকীর্ণ একটি অবারিত আকাশের আলো—জলের কল্লোল আর জীবন-সম্ভোগের আনন্দ মিশে আছে। "নষ্টনীড়" এই পর্বের পক্ষে কিছুটা ব্যতিক্রম, কিন্তু মোটের ওপর পদ্মাবিহারী একটি মুক্ত মনের রসোল্লাসে এরা সঞ্জীবিত। দীর্ঘকাল পরে একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"অল্প বয়সে বাংলা দেশের পল্লী প্রকৃতির সঙ্গে যখন আমার চোখে চোখে পরিচয় হয়েছিল তখন প্রতিদিন আমার মনে যে আনন্দধারা উদ্বারিত হয়েছিল তাই সহজে প্রবাহিত হয়েছিল ঐ নিরলংকৃত সরল গল্পগুলির ভিতর দিয়ে। আমার নিজের বিশ্বাস এই আনন্দবিস্মিত দৃষ্টির ভিতর দিয়ে বাংলা দেশকে দেখা আমাদের সাহিত্যে আর কোথাও নেই। বাংলা পল্লীর সেই অন্তরঙ্গ আতিথ্য থেকে সরে এসেছি তাই সাহিত্যের সেই শ্যামলছায়া-শীতল নিভৃত বীথিকার ভিতর দিয়ে আমার বর্তমান মোটরচলা কলম আর কোনোদিন চলতেই পারবে না।" (রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প, প্রমথনাথ বিশী, সংযোজন)।

॥ চার ॥

"সবুজপত্র" রবীন্দ্রনাথের গল্প-সাহিত্যে দ্বিতীয় অধ্যায় যোজনা করল। "পল্লীর আতিথ্য" থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর "মোটর চলা কলম" শহরের পথ ধরল। প্রথম যুগের গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথকে বলা যায় গ্রামীণ—এই পর্বে তিনি নাগরিক। এই নগর পর্যায় শুরু হল "কৃষ্ণ নাগরিক" প্রমথ চৌধুরীর "সবুজপত্রে"। "হালদার গোষ্ঠী", "হৈমন্তী", "স্ত্রীর পত্র", "পয়লা নম্বর" প্রমুখ দশটি গল্প তিনি লিখলেন "সবুজপত্রে"র পাতায়।

"হালদার গোষ্ঠী" রবীন্দ্রনাথের একটি মহৎ গল্প। এই গল্পের নায়ক বনোয়ারীলালের মধ্যে একটি চিরকালীন সমস্যার ছাযাভাস ঘটেছে। শিল্পীর আইডিয়ালিস্ট সত্তার সঙ্গে পাবিপার্শ্বিক বাস্তব জগতের স্থূল লোকযাত্রা আব স্বার্থপরতাব যে সংঘাত বাধে—এই গল্প তারই তিবক আখ্যান। পৃথিবীর বহু স্মরণীয় মানুষের জীবন, সাহিত্য এবং শিল্পকর্ম এই দ্বন্দ্বের ইতিহাস—এর মধ্যে রোমান্টিক বেদনাব চবম আকৃতি।

শক্তি, সত্য, ও সৌন্দর্যবোধেব সম্পূর্ণ প্রকাশ বনোযারির চরিত্রে। তাই রক্ষণশীল বৈষয়িক হালদারগোষ্ঠীর সঙ্গে তার কোথাও মনের মিল ঘটল না—কোনোদিন সে বুঝতে পারল না "সম্পূর্ণরূপে এ বাড়ির বড়োবাবু হওয়াই তাহার উচিত ছিল।" যে কিরণেব ওপর নিজের কল্প-বাসনা আরোপ করে বনোযারি সমস্ত দুঃখ-লজ্জা অপমানকে সহ্য করত, শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করা গেল: "সেই তন্বী তো এখন তন্বী নাই, কখন মোটা হইয়াছে সে তাহা লক্ষ্য করে নাই। এতদিনে হালদার গোষ্ঠীব বড়ো বউয়ের উপযুক্ত চেহারা তাহার ভরিয়া উঠিয়াছে। আর কেন, এখন অমরুশতকের কবিতাগুলাও বনোয়ারির অন্য সমস্ত সম্পত্তির সঙ্গে বিসর্জন দেওয়াই ভালো।" অতএব "সেই রাত্রেই বনোয়ারির আর দেখা নাই।"

সৌন্দর্যবোধ আর শিল্পীমননের সঙ্গে সাংসারিক স্থূলতার এই বিরোধই পূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে "যোগাযোগ" উপাখ্যানে। হালদার গোষ্ঠী তারই একদিক। "প্রবাসী"র পাতায় প্রকাশিত "চিত্রকর" গল্পটির সংক্ষিপ্ত আয়তনে এবং স্পষ্ট রেখায় এই কথাটিকে আরো ভালো করে বোঝা যাবে।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সৌন্দর্যচেতনা আর শৈল্পিক শুচিতার প্রতীক হল নারী। এই নারীই "নন্দিনী" হয়ে রাজাকে ত্রাণ করবার জন্যে আবির্ভূত

হয়েছে “রক্তকরবী”তে। শিল্প ও সুষমার অপমৃত্যু বাঙালী মেয়ের ব্যর্থ বিড়ম্বিত জীবনের মধ্যে তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে বারবার। তাই বনোয়ারির বেদনা আর একভাবে প্রতীকিত হয়েছে “হৈমন্তী”তে।

“দেনা-পাওনা”র নিরুপমার আর এই গল্পের হৈমন্তীর মৃত্যুর মধ্যে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যও গড়ে উঠেছে যুগ-প্রভাবেই। দেনা-পাওনা অনাড়ম্বর সামাজিক গল্প—হৈমন্তী সৌন্দর্য আর সংসারের ভাবগত দ্বন্দ্বের ওপরে আশ্রিত। শিক্ষাব্রতী বাপের প্রভাবে যে “নির্মল সত্যে এবং উদার আলোকে তাহার প্রকৃতি এমন ঋজু শুভ্র ও সবল হইয়া উঠিয়াছে” তা থেকে স্বার্থকুৎসিত সংসারে “হৈম যে কিরূপ নিরতিশয় ও নিষ্ঠুর-রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে”—এই বেদনায়, সুন্দরের সকরুণ অপঘাতে গল্পটি শেষ হয়েছে।

কিন্তু “সবুজপত্রে”র আশ্রয়ে রবীন্দ্রনাথের যুগসজাগ মন এইখান থেকে একটা নতুন মোড নিয়েছে। হেন্‌রিক ইবসেন আর বার্নার্ড শর নাটক, “ফরসাইট্‌ সাগার” আইরিন, ইংল্যাণ্ডের সাফ্রেজিস্ট আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া—নারীর অধিকার, তার মর্যাদা, তার মুক্তি সম্পর্কে ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলছে। “পলাতকা”র মঞ্জুলিকা বেরিয়েছে পারিবারিক শাসনের বাঁধ ভেঙে—রবীন্দ্রনাথের গল্পেও নারীশক্তি উদ্‌বুদ্ধ হয়েছে।

এই উদ্বোধনের মেঘ-ডম্বর পাওয়া গেল “স্ত্রীর পত্রে।”

গল্পের চাইতেও বক্তব্য এতে প্রধান—আক্রমণের মধ্যে কোথাও কোনো আবরণ নেই, কোনো-কোনো অংশ স্পষ্টতই প্রবন্ধধর্মী। হৈমন্তীর অবক্ষয় মেজো বউ স্বীকার করে নি। বিন্দুর বিডম্বিত জীবনের চরম দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়ে তার আত্মদর্শন হয়েছে: “আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়ে মানুষের পরিচয়টা যে কী তা আমি পেয়েছি।”

অতএব “সাতাশ-নম্বর মাখন বডালের গলি” থেকে মেজো বউয়ের মুক্তি—মাথার ওপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জের ছায়ায়—প্রসারিত নীল সমুদ্রের সামনে।

সাধারণ রক্ষণশীল বাঙালী পরিবার এবং তার রীতি-পদ্ধতির তীক্ষ্ণতম সমালোচনা আছে এই গল্পে। সমাপ্তিতে কবি রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি—আকাশ আর সমুদ্রের একটা অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌ট্‌ মুক্তিব্যঞ্জনা, ফলে গল্পটির উজ্জ্বল রিয়ালিজ্‌মের ওপর ভাবালুতার খানিকটা কুয়াশা ছডিয়ে পডেছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও মেজ বউয়ের এই পত্র-কাহিনী বাংলা দেশে তখন প্রচণ্ড দোলা জাগিয়ে দিয়েছিল। প্রতিবাদ করেছিলেন ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আর বিপিনচন্দ্র পাল—"সবুজপত্রে"র প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রায় "নারায়ণ" পত্রিকায়। কিন্তু সে প্রতিবাদে মেজো বউয়ের জ্বলন্ত অভিযোগ মিথ্যে হয়ে যায় নি।

মেজো বউয়ের বক্তব্যে নারীর মর্যাদাবোধ এবং জাগরণ যতটা তত্ত্ব হয়ে দেখা দিয়েছে, সে পরিমাণ শিল্প হয়ে আসে নি, যদিও বিন্দুর আনুষঙ্গিক কাহিনীটি অপূর্ব। "অপরিচিতা" গল্পে কল্যাণীর শক্তিময়তা অনেকখানি নিজের মধ্যে টেনে নিয়েছেন তার বাবা শম্ভুনাথ সেন। শেষের দিকে ট্রেনের কামরায় কল্যাণীর আত্মপ্রকাশের মহিমাটি কিছু পরিমাণে চলতি বাংলা গল্পের অনুবর্তন। এই গল্পে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য "মামাগ্রস্ত" নায়কের পৌরুষের বিকাশ—যা হৈমন্তীতে মাত্র ব্যর্থ বেদনায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে।

নারীর অন্তরবেদনা এবং পুরুষেব আচ্ছন্ন বুদ্ধিতে তার অবমাননার স্বরূপ সব চাইতে সার্থক হয়ে দেখা দিযেছে "পয়লা নম্বরের" অনিলায়। "স্ত্রীর পত্রে"র রচনায় ববীন্দ্রনাথের নাগরিক চাতুর্য এবং বাগ্‌-বৈদগ্ধ্যের পরিচয় মেলে, এখানে সে নৈপুণ্য রীতিমতো চমকপ্রদ। উইটের দীপ্তিতে ঘন ঘন বিদ্যুৎ ঝলকিত, তির্যকতার এমন গূঢ় এবং মন্তব্যে এর ক্ষুরধার স্মার্ট গল্প বাংলা-সাহিত্যে "চা‸ ইয়াবী কথা" ছাড়া আর লেখা হয় নি। দুই নম্বরের বাসিন্দা গ্রন্থকীট অদ্বৈতচবণ বিদ্যা ও বুদ্ধিচর্চার উগ্র আধুনিকতার কেন্দ্রে মধ্যমণি হয়ে বসে আছে, তার চারদিকে জড়ো হযেছে দ্বৈতাদ্বৈত সম্প্রদায়ের ভক্তবৃন্দ। এই অদ্বৈতচরণের স্ত্রী অনিলা। স্বামী এবং তাঁব শিষ্যবর্গের জন্য মাছের কচুরি, ছানার পায়েস, আমডার চাট্‌নি সময়ে অসময়ে কবে দেওয়া ছাড়া তার আর কোনো ভূমিকাই নেই। অদ্বৈতচরণের জীবনে সে নিতান্তই প্রয়োজন এবং স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ। অন্যদিকে পয়লা নম্বর বাড়িতে এসেছে জমিদার সিতাংশুমৌলি যে পরিপূর্ণ উদ্দাম যৌবনের প্রতীক। বলিষ্ঠ পৌরুষের ছন্দে ঘোড়ায় চড়ে, ব্রুহাম হাঁকায়—টেনিস খেলে—নানারকম বাদ্যযন্ত্রে তার সমান অধিকার। স্থবির অদ্বৈতচরণ অনিলাকে উপেক্ষা করেছে আব উদ্দাম সিতাংশুমৌলি তাকে ডাক পাঠিয়েছে যৌবনেব পূজার অর্ঘ্য সাজিয়ে।

শেষপর্যন্ত অদ্বৈতচরণ অনিলাকে হারিয়েছে—সিংতাশুমৌলিও তাকে পায় নি। একখানি নীল কাগজ ছিঁড়ে সে দুজনকে একই চিঠি লিখেছে: "আমি চললুম, আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো না। করলেও খোঁজ পাবে না।" বিন্দুর মৃত্যু মেজো বউকে মুক্তি দিয়েছিল, অনিলা ছুটি পেয়েছে ছোট

ভাই সরোজের আত্মহত্যায়। তার নীল কাগজের চিঠিটি অসীম নীল আকাশ আর নীল সমুদ্রের প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নয়।

অদ্বৈতচরণ অনিলাকে কেন হারাল—তার কারণ সুস্পষ্ট। কিন্তু কেন সে সিতাংশুমৌলির কাছেও ধরা দিল না? সিতাংশুমৌলি তার নারীত্বকে মূল্য দিয়েছিল বলেই তার চিঠি ছিঁড়েও ছিঁড়তে পারে নি অনিলা; তবু সিতাংশুমৌলিও তাকে সম্পূর্ণ করে দেখতে পায় নি। অদ্বৈত তাকে আংশিক দেখেছে সাংসারিকতার সীমায়—সিতাংশুমৌলিও তাকে খণ্ডিত করে দেখেছে ভাবুক রোম্যান্টিকের মতো—তার পূর্ণ মহিমা কারো কাছেই প্রকাশিত হয় নি। চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে বলেছিলেন, "দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী"—অনিলারও ঠিক সেইটিই মর্মকথা।

এই বক্তব্য ঠিক নতুন নয়—চিত্রাঙ্গদায় আছে, "তপতী"তেও আছে। কিন্তু নতুনত্ব আছে গল্পটির গঠনে—অনিলার আশ্চর্য সংক্ষিপ্ত বিদায়ের মধ্যে, নীল চিঠির সাংকেতিকতায়। "নষ্টনীড়ে"র সঙ্গেও এই গল্পের কিছুটা সাদৃশ্য অনুভব করা যায়—অদ্বৈতচরণ অনেকখানি ভূপতি, সিতাংশুমৌলি কিছু পরিমাণে অমল। কিন্তু হৈমন্তী আর দেনাপাওনার ক্ষেত্রে যেমন দেখেছি—এখানেও ঠিক একইভাবে পারিবারিক কাহিনী যুগ-প্রভাবের ফলে ব্যক্তি-সাপেক্ষতা পার হয়ে বিস্তৃততর সামাজিক ব্যঞ্জনায় ব্যাপ্ত হয়েছে।

॥ পাঁচ ॥

রাজনৈতিক ঘূর্ণিচক্রের মধ্যে পড়ে মানুষ যতটা মাতে—ততটা সত্যাশ্রিত হয় না, রবীন্দ্রনাথের এই সুস্পষ্ট অভিযোগ ধরা পড়েছে "ঘরে বাইরে"তে, "চার অধ্যায়ে"। এই অভিযোগ প্রমাণের জন্য সন্দীপকে তিনি যেভাবে চিত্রিত করেছেন এবং অতীন আর এলার কাহিনীকে যেভাবে তুলে ধরেছেন তাতে ঠিক সুবিচার হয়েছে বলা যায় না, কিন্তু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবটি কী তা-ও এ থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবং "মেঘ ও রৌদ্র" থেকে বোঝা যায় জীবনের ছোট সুখ, ছোট বেদনার মধ্যেই মানুষের পরম প্রাপ্তিটি লুকিয়ে আছে—বাইরের ঝড়-ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে দুঃসহ কর্তব্য সাধনে তার চরম চরিতার্থতাটির সন্ধান মিলবে না। ব্যক্তিক উৎকর্ষ সাধন, জাতীয় চরিত্র রচনা করা এবং জীবনাসক্তিতে সুধাস্নিগ্ধ হয়ে সংগঠন

মূলক কর্মপথে এগিয়ে যাওয়া—রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং বিবিধ কথা' সাহিত্য থেকে এই নির্যাসটুকুই আহরণ করা যায়। বলা অনাবশ্যক, এই সংস্কারবাদিতার সঙ্গে সকলে একমত হবেন না।

নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে, বক্তব্যমুখ্য এবং শিল্পকলায় দুর্বল অন্তত দুটি গল্পে রাজনৈতিক কর্মপ্রণালীর তীব্র সমালোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। "প্রবাসী"র পাতায় প্রকাশিত এই গল্প দুটি হল যথাক্রমে "নামঞ্জুর গল্প" এবং "সংস্কার।" প্রথম গল্পটির নামকরণের মধ্যেই ব্যঙ্গটি নিহিত : রাজনৈতিক মাতলামির যুগে তাঁর গল্পটি পাঠকদের কাছে মঞ্জুরি পাবে না। একজন প্রাক্তন আদর্শনিষ্ঠ বিপ্লববাদীর চোখ দিয়ে অসহযোগ আন্দোলন এবং বিদেশীবর্জনের একটি অধ্যায়কে তিনি দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন। এই গল্পে এক সঙ্গে দুটি জিনিসকে তিনি আক্রমণ করেছেন : অসংযত রাজনৈতিক মত্ততা একদিকে মানবিক স্নেহমমতার সত্যকে উপেক্ষা করছে ; অন্যদিকে অমিয়ার হীন জন্ম-কাহিনী শোনবার সঙ্গে সঙ্গে "স্বদেশলক্ষ্মী" সম্পর্কে মোহমুক্ত অনিলের ঊর্ধ্বশ্বাসে কুমিল্লায় পলায়ন থেকে দেখানো হয়েছে—বাইরে যতই দুঃসাহসিকতার আচ্ছাদন থাক—ভেতরে ভেতরে আমরা কুসংস্কারের শৃঙ্খলে পাকে পাকে জড়ানো। বাক্-চাতুর্য এই আক্রমণকে তীক্ষ্ণতর করে তুলেছে।

"সংস্কার" গল্পে দ্বিতায় বক্তব্যটিকে অত্যন্ত স্থূলভাবে আনা হয়েছে শখের দেশসেবিকা কলিকার মধ্য দিয়ে, তত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক নয়নমোহনও লেখকের ক্রুদ্ধ ব্যঙ্গ থেকে নিস্তার পান নি। অসহযোগ বা অস্পৃশ্যতা-বর্জন আন্দোলনের সার্থকতা সম্বন্ধে মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্তু এই দুটি গল্পের সাহায্যে তা যে ভাবে typify করা হয়েছে তাতে নিরপেক্ষ মন খুশী হবে না। এই সব আন্দোলনের প্রতিভূ হিসাবে মাত্র অনিল আর কলিকার মতো চরিত্রই যদি রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়ে—তাহলে সেটাকে বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য বলতে হবে ; সেই সঙ্গে এ-কথাও বলতে হবে সিতাংশুমৌলি এবং অদ্বৈতচরণ যেমন খণ্ডিতভাবে অনিলাকে দেখেছিল, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিও এইসব ক্ষেত্রে তেমনি আংশিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে।

"আগে আত্মার স্বাধীনতা আনো—তারপরই দেশের স্বাধীনতা আসবে" —এটা নিঃসন্দেহেই দামী কথা। এই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ যে নিজস্ব গঠন-মূলকতার আশ্রয় নিয়েছিলেন—তাতে তাঁর সম্পূর্ণ অধিকারও আছে। ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই বিভিন্ন মানুষের কাছে একই জিনিস বিভিন্ন

তাৎপর্য নিয়ে দেখা দেবে—তাও ঠিক। কিন্তু একটি সামগ্রিক সত্যের ভাষ্য করবার সময় লেখক যদি এমন প্রতীক বেছে নেন যা অংশত এবং বৈকল্পিক, তাহলে সঙ্গতভাবেই অনুযোগের কারণ ঘটে।

॥ ছয় ॥

গল্পকার রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার শেষ রশ্মি পড়েছে "তিনসঙ্গী"র তিনটি গল্পে। প্রথম গল্প "রবিবার" একটি মনোরম প্রেমকাহিনী, দ্বিতীয়টি আরণ্যক জৈবতার মতো অন্ধ-আকর্ষণ থেকে অচিরার পুনরুদ্বোধন এবং নবীনমাধবের অনিচ্ছালব্ধ মুক্তি ("শেষ কথা") এবং তৃতীয়টিতে সোহিনী নামে এক জ্যোতির্ময়ীর প্রলোভনের অগ্নিচক্র রচনা করে নন্দকিশোরের বিজ্ঞানযজ্ঞের ঋত্বিককে বিফল সন্ধান ("ল্যাবরেটরি")। এই গল্প তিনটি বিচ্ছিন্নভাবে রচিত হয়েও একটি মর্মগত ঐক্যসূত্রে বাঁধা আছে এবং "চতুরঙ্গ" পর্যায়ী একটি সামগ্রিক উপন্যাসের মতো স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণযোগ্য। তাই "তিনসঙ্গী"র আলোচনা এখানে করব না।

১২৯৮ থেকে ১৩৪০ পর্যন্ত—অর্থাৎ মোটামুটি বেয়াল্লিশ বছরের গণ্ডীরেখার ভেতরে রবীন্দ্রনাথের গল্প-সাধনার একটি সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা করা গেল। তাঁর সমস্ত গল্পের আলোচনা বা উল্লেখও এখানে সম্ভব করা হয় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি মহান প্রতিভার ব্যাপকতা এ থেকে অনুমান করা যাবে এবং বলা যাবে, একমাত্র গল্পলেখক হিসেবেই রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার অধিকারী হতে পারতেন। যখন সর্বপ্রথম তিনি গল্প লেখা আরম্ভ করেন—তখন তাঁর সামনে আধুনিক ছোটগল্পের কোনো আদর্শ উপস্থিত ছিল কিনা বলা কঠিন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রধান ত্রয়ী : পো, মোপাসাঁ এবং চেকভের শেষের দুজন প্রায় তাঁর সমকালীন, প্রথম জনের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। মোপাসাঁ এবং চেকভের অনেক গল্প তাঁর প্রথম গল্পের আগে রচিত হয়েছিল—কিন্তু এই দুটি লেখক বাংলা দেশে তখনও পঠনীয় ছিলেন না। মোপাসাঁ এবং ফরাসী সাহিত্যকে সম্ভবত পরিচিত করিয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরী—চেকভ দীর্ঘকাল এদেশে অজ্ঞাতই ছিলেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে নিজের হাতে পথ কাটতে হয়েছে, নিজস্ব প্রতিভায় গল্পের রূপ এবং রীতি আবিষ্কার করতে হয়েছে—নানা পরীক্ষা,

নানা অনুশীলনের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পকে রূপে রসে প্রতিষ্ঠা দিতে হয়েছে। মাত্র বাংলা সাহিত্যেই নয়—নিজের গল্পকে আন্তর্জাতিক মানে সমুন্নত করেছেন তিনি এবং নিরপেক্ষ সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ এই ত্রয়ীর তালিকায় চতুর্থ সংযোজন।

কালের সঙ্গে পদক্ষেপ এবং বারেবারে নবতম আন্দোলনের অধিনায়কত্ব গ্রহণ—এই চিরসজাগ প্রগতিশীলতাই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সৃষ্টিগর্ভ এবং সমুজ্জ্বল করে রেখেছে। তাঁর ছোটগল্পও কালের সহগামী—যুগচেতনার শীর্ষে থেকে রীতি ও বক্তব্যে বারেবারে নবীনায়িত হয়েছে। 'ঘাটের কথা', 'দেনা পাওনা' দিয়ে সূত্রপাত—'ক্ষুধিত পাষাণ' থেকে 'হালদার গোষ্ঠী'তে পদক্ষেপ এবং সেখান থেকে 'ল্যাবরেটরিতে' উত্তরণ—এই বৈপ্লবিক বিবর্তনের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব আমাদের কাছে সম্পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হয়। আর, এক কথায় বলা যায়ঃ বেয়াল্লিশ বছরের সীমার মধ্যে আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই লভ্য।

"ভারতী" পত্রিকার আশ্রয়ে উত্তরকালীন আধুনিকতা এবং সেই আধুনিকতা-সম্ভব ছোটগল্পকে রবীন্দ্রনাথই প্রেরণা দিয়েছিলেন। সেই ঋণের স্বীকৃতি দিয়েছেন প্রভাত মুখোপাধ্যায়, দিয়েছেন চারু বন্দ্যোপাধ্যায়; তারপরে যখন "কল্লোল" এল, তখন তার আধুনিকতম গল্প "ভারতী"র কাছ থেকেও অনেকখানি ঋণ গ্রহণ করল—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের পরোক্ষ প্রভাব "কল্লোল"ও এড়াতে পারল না।

কিন্তু সে আলাদা প্রবন্ধ।

চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

বিষ্ণু দে

॥ এক ॥

আজকাল বোধহয় পশ্চিম ইওরোপে ও আমেরিকাতেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিত্রকর হিসাবে গণ্য। অন্তত নিউ ইঅর্কের মর্ডান আর্টের মিউসিঅমেও রবীন্দ্রনাথের ছবির কদর হচ্ছে। অবশ্য এখনও কোনো আধুনিক শিল্পালোচনার বা ইতিহাসের বইয়ে রবীন্দ্রনাথ বা যামিনী রায় অনুপস্থিত। বিলাতের ডাকসাইটে শিল্পতাত্ত্বিক সর হর্বাট রীড এখনও আধুনিক শিল্প নাড়াচাড়া করতে গিয়ে পূর্বভূখণ্ডের কথা ভাবতে পারেন না। এমনকি মারিতঁ্যার মতো প্রাজ্ঞ মনীষীর লেখাতেও—যেমন Creative Intuition-এ ভারতের প্রাচীন নন্দনতত্ত্বের স্বীকৃতি থাকলেও তাঁর পববর্তী আলোচনার মানচিত্রে ভারত নেই।

তাই কোনো গৌণ সমালোচকও আমাদের শিল্পীদের আলোচনা করলে খুশি লাগে, কৃতজ্ঞ বোধ করি, কারণ এখনও আমাদের মুখ স্বাধীন হলেও মন তাকিয়ে আছে ইংলিশ চ্যানেল ও আটলান্টিকের দিকে। উইলিঅম আর্চরের ইণ্ডিয়া ও মডর্ন আর্ট নামক পুস্তকটি প্রথমেই এ কারণে অভিনন্দনযোগ্য, যদিও বইটি অজস্র খুচরো ভুলে এবং বড রকম বিভ্রান্তিতেও কণ্টকিত। এ বিষয়ে বিশ্বভারতী কোঅর্টরলি বুকলেটে বিস্তর আলোচনা হয়েছে, কাজেই তার আর দরকার নেই। সাধারণ অনেক ভারত-বিশেষজ্ঞের মতো আর্চরেরও মুস্কিল হচ্ছে যে তিনি এদেশের মানুষকে জানেন না, তাদের ভাষা সাহিত্য সবই তাঁর কাছে বাহ্য। রবীন্দ্রনাথকে শুধুমাত্র লেখক হিসাবেও তিনি জানেন না—আমরাই বা কজন সত্যিই জানি তাঁর দীর্ঘজীবনের ক্লান্তিহীন বহুধা অন্বেষণ ও কীর্তি অর্জনের সমগ্র সাক্ষ্য ?

কিন্তু ইংরেজীতে বই লিখতে গেলেও জানা উচিত কয়েকটা প্রাথমিক স্থূল তথ্য। সেকালে এই জ্ঞানের অভাবে দেখা গেছে ইএটসের অধৈর্য বা

পাউণ্ডের মুরুব্বিয়ানা। আর্চর সাহেবের ধারণা যে পশ্চিম ইওরোপ নামক সব-পেয়েছির-দেশে রবীন্দ্রনাথ যেন প্রথম যান নোবেল প্রাইজ গ্রহণ করতে। তেমনি তাঁর ধারণা যে ১৯২৬-এ রবীন্দ্রনাথ ইওরোপে গিয়ে ক্লে ও পিকাসো নামক তখন প্রায় অর্বাচীন দুই আধুনিক শিল্পীর কাছে পাঠ নিলেন। আর্চর নিয়েজে মিউসিঅম-মার্কা মনের বশবর্তী, তাই ঠিকবেঠিক তারিখ-টারিখ বিষয়ে সর্বদাই উদার, যেমন নামাবলীর মতো চালু সাধারণ গায়ের কাপড়কে তিনি চিত্রকর্ম হিসাবে তারিখ দাগান—১৮৮৬!

ঐতিহাসিকপনার এই তাগিদে আর্চর বল্লেন যে রবীন্দ্রনাথ নাকি ৬৭ বছরে ছবি আঁকা শুরু করলেন, কারণ তখন তিনি লেখকহিসাবে একেবারে নিঃশেষ, শোচনীয় ধ্বংসাবশেষ মাত্র এবং দেশের লোক তখন তাঁকে আর লেখক হিসাবে পোঁছে না, তাই আহত অহমিকায় তিনি প্রতিষ্ঠা খুঁজলেন ছবি এঁকে। বাঙালী পাঠককে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির শীর্ষে ঐ তেরো বছরের রচনার প্রাচুর্য, বৈচিত্র্য ও শক্তিমত্তা বিষয়ে স্মরণ করাতে হবে না নিশ্চয়ই। তেমনি এ ভদ্রলোকের নিশ্চিতি—যা সম্পূর্ণ কল্পনানির্ভর, রবীন্দ্রনাথের ২৫০০ ছবির পূর্বাপর ক্রমপঞ্জী বিষয়ে।

অবশ্য শুধু এই আহত সাহিত্যিক অহমিকার ব্যাখ্যা দিয়েই ইংরেজ সমালোচক ক্ষান্ত নন। ইংরেজের পক্ষেই যা সম্ভব, সেই সরল রোমাঞ্চে আর্চর সাহেব অবচেতনেব তিমিরে রিসার্চ করতেও ভয় পান নি এবং সেকালের সেই দুরন্ত ফ্রয়েডী ভূত লিবিডোকে-ও টানাটানি করেছেন অযথা। রবীন্দ্রচিত্রে অবচেতনের প্রেরণা বিষয়ে নিশ্চয়ই সাধারণভাবে মন্তব্য করা যায়, তার বেশী কিছু করতে গেলেই এমন চোরাপথে মজতে হয় যেখানে দেবদূতেরাও পা ফেলতে ভয় পান। তাই রবীন্দ্রনাথের যে সব চিত্রে শুধু চিত্রগত ছন্দের দাবি আর তার বিস্ময়কর রেখারঙের দ্বারা রাবীন্দ্রিক সমাধানের দিকে নজর দিলেই চিত্রব্যাখ্যা সহজ হয়, সেখানে রাবীন্দ্রিক অবচেতনে তিনি লিঙ্গ ও যোনির সন্ধান করেছেন। অবশ্য আর্চরের এই মনোলোল্য গত কয়েকশো বছরের বিকারের ফলে ইওরোপে, বিশেষ করে ইংলণ্ডে খুবই প্রচলিত। নরনারীর প্রেম [redacted]কৃতিক ক্ষেত্রেও প্রজননাবেগের রূপায়ণ—ভারতবর্ষের ঐতিহ্যে যা আজ দূষিত হওয়া সত্ত্বেও গ্রাম্যজনবোধ্য, প্রকৃতি বা নরনারীর প্রেম যে পশ্চিমে লজ্জাকর ব্যাপার, পাপকর্মেরই নামান্তর, সেখানে বুদ্ধিজীবীর পক্ষে আধুনিকতার বা স্বাধীন মননের প্রয়াসে বিপরীত স্থূলতা স্বাভাবিক। তাই

আবার আর্চরের মনে হয় শান্তিনিকেতনের সাঁওতাল মেয়েরাও নাকি রবীন্দ্রনাথের বৃদ্ধ বয়সের কল্পনার অবাধ মুক্তিতে একটি মুখ্য প্রেরণা।

আসলে গোটা দেশের জীবন বিষয়ে মৌলিক অজ্ঞতাই এরকম পাণ্ডিত্যের একটা কারণ। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তাঁর বিরাট রচনাবলী এবং বিরাট জীবনের সঙ্গে অপরিচয়ও এইসব ভ্রান্তির একটা নিমিত্ত বটে।

একদা অধ্যাপক হলডেন বলেছিলেন যে তিনি অবশ্য বাংলায় রবীন্দ্রনাথের কীর্তিবিষয়ে আমরা কি ভাবি তা জানেন। ইংরেজী অনুবাদে রবীন্দ্ররচনাবলী তিনি মন দিয়েই পড়েছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে মহাকবি সেটা তাঁর পক্ষে বোঝা শক্ত হত, যদি না তিনি রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলী দেখবার সুযোগ পেতেন। রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখবার পরে তিনি কল্পনা করতে পারেন যে নিজ ভাষায় এই কবি, যাঁর হাত থেকে এইসব ছবি বেরিয়েছে, মহৎ কবি বলে বিবেচিত হতে পারেন।

সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর অনুবাদভাগ্য ভালো হয় নি। এবং যাঁরা বাংলার ভূমিতে রবীন্দ্রকীর্তির মাহাত্ম্য জানেন না, তাদের পক্ষে রবীন্দ্র-চিত্রাবলী রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রথম ও প্রত্যক্ষ পরিচায়ক হিসাবে তাই সার্থক। রবীন্দ্রনাথের চিত্রসাধনা তাঁর শিল্পীর ব্যক্তিস্বরূপে এবং তাঁর বহুধাপ্রকাশে সম্পূর্ণতা এনেছিল। এই ব্যক্তিস্বরূপ স্বকীয় কর্মক্ষেত্রে বিরাট এবং কীর্তিতে বীরগৌরবান্বিত, যদিচ তার প্রকৃতি বোঝা শক্ত তাঁর স্বদেশের ও স্বজাতির পৌর্বাপর্য বিচার ছাড়া। অবশ্য তাঁর বিস্তারের মহাসাগরকে রূপ-নির্ণয়ে বলতে হয় প্রশান্তই। একথা স্বাজাত্যাভিমানেও না মেনে লাভ নেই যে রবীন্দ্ররচনাবলীতে একটি সবল মার্জিত মনের পরিচয়টাই মুখ্য, সে মনে ঝঞ্ঝার চেয়ে শান্তির মর্যাদাই বেশী। কিন্তু এই ঝঞ্ঝার চেয়ে শান্তির টান, তাঁর পরবর্তীদের যাই হোক, তাঁর কাছে মোটেই একটা অগভীর অভ্যাস ছিল না। এই অমৃতের বিশ্বাস ছিল তাঁর সমগ্র স্বভাবের গভীরে, এই বিশ্বাস তাঁর কাছে একান্ত সত্য ছিল, এতেই ছিল তাঁর জীবনদর্শনের আর নিত্যসচেষ্ট মানসের মহিমা। এবং এ বিশ্বাস তাঁকেও অর্জন করতে ও বজায় রাখতে হয়েছিল অশান্তির মধ্যে, একক চেষ্টার মধ্যে দিয়ে।

তাঁর বিশ্বাস বা ধ্যানধারণার, বা যা তিনি তাঁর জীবনের ভিত্তিতে নিজেই গড়েছিলেন তাঁর সেই ব্যক্তিস্বরূপের বিশ্লেষণ ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন নেই।

তাঁর সরকারী জীবনীকার আমাদের দু-চার কথা যা বলেছেন তাতেই তাঁর পটভূমি খানিকটা আলোকিত : যেমন আমরা প্রভাতবাবুর জীবনীতে জানতে পারি যে তরুণ কবি ইওরোপে মানবমনের স্বাধীন উল্লাসে যখন সমধিক মুগ্ধ হলেন, তাঁর ঋষি-প্রতিম পিতৃদেব তখন তাঁকে বাড়ি ফিরে আসতে বলেন। রবীন্দ্রনাথকে যে হঠাৎ বিবাহে বদ্ধ হতে হয়, সেও প্রভাতবাবু বলেন, তাঁর গুরুজনের উদ্বিগ্ন নির্বন্ধে। কী চিরজাগ্রত মর্যাদায় এবং সম্পূর্ণ কর্তব্য-বোধের আবেগে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে জীবনের সব দাবিদাওয়া পালন করে যান, তাও আমাদের সবার জানা। কনিষ্ঠ পুত্রের উপর মহর্ষির প্রভাব খুবই গভীর ছিল, এই আধ্যাত্মিক সৌকুমার্যে এবং শালীনতায় বা নীতিনিষ্ঠায়। এবং এই ধর্মনীতিপরায়ণ অসামান্য পিতা যে তাঁর পুত্রের বালকবয়সেই রবির নন্দনপ্রতিভা বুঝেছিলেন এবং সেইভাবে এই পুত্রের প্রতি বিশেষ একটা অনুমোদন দিয়ে এসেছিলেন সে বিষয়ে ভাবলেও অবাক লাগে।

অবশ্য যে 'কানো ভালো জিনিসের মতোই এই সৌকুমার্য ও শালীনতারও একটা সীমাবদ্ধ দিক ছিল। রম্যাঁ রলাঁর পাঠকদের একটি গল্প এ প্রসঙ্গে মনে থাকতে পারে : একদা মহর্ষি দর্শনেচ্ছু রামকৃষ্ণকে বাড়ির উৎসবে নিমন্ত্রণ করেন এবং তারপরে মনে করেন যে সুসজ্জিত বাবু-সাহেব অতিথিদের মধ্যে সেই গ্রাম্যবেশ সরল ধর্মসাধককে হংসোমধ্যে বকের মতো লাগবে এবং নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করেন।

রলাঁর এই গল্পটিতে আভিজাত্যের যে বাধাবিপত্তি দেখা যায়, তার থেকে রবীন্দ্রনাথও মুক্তি পান নি। ভিলিএর দ'লিল আদাঁর মতো রবীন্দ্রনাথকে কখনো অত্যুক্তি করতে হয় নি যে . জীবনযাত্রা ওটা আমাদের চাকরবাকররাই করবে। কিন্তু আভিজাত্য যে-দেশে দুর্লভ ও প্রায়ই পঙ্গু, সে-দেশে প্রকৃত অভিজাত হওয়ার সঙ্কোচ-বাধা তাঁকেও ভুগতে হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে মহর্ষির আত্মজীবনীতে অভিজাত ধনিকের ভগবদ্‌ভক্ত অচেতনতার উদাহরণ শুধুমাত্র উল্লেখ করলেই হবে, যেমন তাঁর উত্তরভারতে নৌবিহার বা সিমলা থেকে পলায়নকাহিনী অথবা রাজনারায়ণকে ফেলে ডুবু-ডুবু নৌকা থেকে বড় নৌকায় আশ্রয়গ্রহণ ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রখর আত্মসচেতনতার জন্য নিশ্চয়ই এইসব বিচ্যুতি বিষয়ে সশ্রদ্ধ সতর্কতার সীমার মধ্যে দিয়ে আত্মবিকাশ করেন। অবশ্যই এই বাধার মধ্যে দিয়ে গিয়েই তিনি অনেক কিছু অর্জনও করেছিলেন, মহৎ শিল্পীমাত্রেই যেমন স্বকীয় সীমার বা নির্দিষ্টতার সদ্ব্যবহার করে থাকেন।

সম্ভবত তাঁর সৃষ্টিময় কল্পনার চিরবিশ্রামহীন প্রাণশক্তিও এই স্থূল ভাঙাচোরা আমাদের ইংরেজী যুগের জীবনের সাধারণ থেকে আত্মসম্বরণেই তার বিরোধী জোর পেয়েছিল। তাই তিনি সারাজীবন ধরে বারবার সীমার বাইরে যাবার চেষ্টা করেছেন। এবার ফিরাও মোরে, এই আবেদন বসুন্ধরাকে এবং বাস্তব জীবনকে তিনি বারবার জানিয়েছেন কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে নানাভাবে। এবং তাঁর বিশাল কর্মক্ষেত্রের অন্তত দুটি বিভাগে তিনি তাঁর মহৎ কিন্তু নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারের গণ্ডী থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেন। যখন জীবনাভিজ্ঞতায় তিনি নিজে সম্পূর্ণতা পেলেন পরিণত বয়সের প্রশান্তির এবং দীর্ঘ কৃতিত্বের সাবলীলতায়, তখনই তার অসামান্য গীতি-প্রতিভায় এল দৃশ্য স্পৃশ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই বহির্বিশ্বেব আর মানবিক প্রেমের সৌন্দর্যেব মধ্যে সহজ আত্মদানের বিহ্বল মুক্ত সৌন্দর্যবোধ।

তাঁর গানের এই পরিণতি বা রূপান্তরের রহস্য ঠিক প্রশান্তির মধ্যে স্মৃতিধৃত আবেগের ব্যাপার নয়, এখানে আমরা যেন পাই এই স্থূল মর্ত্যলোকে আমাদের বিপদসঙ্কুল জীবনযাত্রার দুঃখসুখ আনন্দবেদনাই, স্মৃতির নির্বিকার পূজার মধ্যে দিয়ে গ্রহণীয রূপে। তাই কি চেহারায চিবসুশ্রী রবীন্দ্রনাথ পবিণত বযসেই হয়ে উঠলেন আশ্চর্য সুন্দব পুরুষ? সে সৌন্দর্ব তো এক অসামান্য কবিমনের অসামান্য বিকাশেব ঐশ্বর্যরূপই।

॥ দুই ॥

বহুকাল আগে এক আর্টস্কুল-অধ্যক্ষ বলেন যে রবীন্দ্রনাথ তো একটা দেশলাই-বাক্স আঁকতে পারেন না, তাঁকে কি করে চিত্রকর বলা যায়? কথাটা হযতো আকাডেমিক দিক দিয়ে একেবারে উদ্ভট নয়; বিশেষত যখন এদেশে বহু নবীন শিল্পী, যাকে বলে আবস্ট্রাক্ট আর্ট, তার স্বাধীন বিন্যাসে মেতে যান, যদিও ঐ আবস্ট্রাক্ট আর্ট ইওরোপের বুর্জোয়া রেনেসান্সেরই আবশ্যিক প্রতিক্রিয়া বা পরবর্তী ধাপ। সেজানের বিষয়েও এবম্বিধ কথা শোনা যেত, কারণ, ধ্রুপদী ইতালীয় বা ওলন্দাজ ওস্তাদের মতো তুলি ব্যবহার এবং রঙের মসৃণ প্রযোগ সেজানের কাজে দুষ্প্রাপ্য। গোগ্যাঁ ও দুওনিয়ে রুসোকেও শখের চিত্রকর বলা যায়। অথচ কাব্য বা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কেন জানি না আমরা দেশলাই-বাক্স বর্ণনার ক্ষমতা দাবি করি না,—একেবারে করি না বললে ঠিক হবে না,

অন্তত ঠিক ছবি-আঁকার মতো করি না। সে যাই হোক আরেকজন আর্টস্কুল-অধ্যক্ষ এ আপত্তির জবাব দেন। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল আগেই ড্রয়িং চর্চা করতেন। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রেও জানা যায় যে ছবি আঁকার শখ তাঁর দীর্ঘকালের, হয়তো নিজের অন্তরস্থ দ্বিধায় এবং সেকালের ওরিএণ্টাল আর্টের চালু শিল্পতত্ত্বের চাপে তাঁর সাহস হয় নি সাহিত্যের একনিষ্ঠ নিশ্চিত সাধনার সঙ্গে সঙ্গে আবার চিত্রেও আত্মপ্রকাশের। রবীন্দ্রসদনের ক্ষিতীশ রায়ের সৌজন্যে ইন্দিরা দেবীর ধাঁধার খাতায় তাঁর ছবি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কালিপেন্সিলের ব্যবহারে নিশ্চয়তা যেমন তাঁর সাক্ষাৎ রেখার টানে, তেমনি পশ্চাদ্‌ঘনতা আঁকার ক্ষমতায় একটি ছবি অবনীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথদের আঁকা চিত্রশোভিত এ প্রাচীন খাতাতে অনন্য।

কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের চিত্রলোকে আবির্ভাবের ব্যাখ্যায় বলেন যে তাঁর চিত্রের জন্ম রচনাখসড়ার কাটাকুটিতে, তাঁর লিপিরেখার প্রতি মনোযোগে, সার্থকতার বা শ্রীছন্দের সন্ধানে। সম্ভবত এও বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের বিংশশতাব্দী বয়স্ক হওয়ার আগে নিয়মিত ছবি আঁকেন নি, কারণ ততদিন তাঁর দুঃসাহসী প্রেরণা একালের আবহাওয়ার সমর্থনের অপেক্ষায় গুণ্ঠিত ছিল। তিনি একালের শিল্পী তাই তাঁকে তেষট্টি বছর অবধি একালের প্রতীক্ষা করতে হল এবং তারপরে তাঁর ছবি আঁকা চলল বার্ধ্যক্যের শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ানন্দে আবিষ্কারের নবীন প্রাবল্যে। রবীন্দ্রচিত্রাবলী রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কীর্তির এবং আমাদের শিল্পেতিহাসের বিচারে উভয়তই গভীর মনোযোগের বিষয়।

লেওনার্দো বোধহয় কাব্যের তুলনায় চিত্র যে আরো সন্তোষজনক শিল্প সে কথা ঠিকই বলেছিলেন, কারণ, "প্রকৃতির অফুরন্ত রচনাবলী অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণভাবে ও প্রচুরভাবে বুঝতে গেলে মানবমনের বাতায়ন অর্থাৎ চোখের মাধ্যমই প্রধান এবং কান হচ্ছে দ্বিতীয়, যার মর্যাদা আসে চোখে যা দৃশ্য তারই ধ্বনি শুনতে পেরে।" রবীন্দ্রনাথ মনে হয় ধ্বনি আগেই শুনতে পেয়েছিলেন, তিনি যে গায়ক ও সঙ্গীতকার ছোটবেলা থেকেই ছিলেন, সেই সাধনাই তাঁর শ্রবণের সহায় হয়েছিল। প্রকৃতির রচনা তিনি দেখেন শোনেন ভালোবাসেন, সেই সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি এল তাঁর কথায় ও সুরে একাত্ম হাজার

গানে। গানের এই সম্ভ্রান্ত অভ্যাস ছন্দের সাধনায় ও কর্তৃত্ব অর্জনে তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেছিল। বর্তমান লেখকের মনে আছে, এ কথায় তিনি খুশী হয়ে সায় দিয়েছিলেন। তাছাড়া, দাভিঞ্চির মত সত্ত্বেও বলতেই হবে যে তাঁর দীর্ঘ এবং বিচিত্র কাব্যের অভিজ্ঞতায়, পদ্যে ও গদ্যে তাঁর সেই শক্তি আয়ত্তে এসেছিল, যাতে মানুষ তার নিজের বোধ্য বিশ্বকে কাব্যের নির্বিশেষ নবসৃষ্টিতে, নব ধারণায় পুনসংগঠিত করিতে পারে। এমনকি তাঁব কাব্যের বীজবপনে এই ধাবণামূলক বুদ্ধিমূলক অভ্যাসেব জন্যই বোধহয় রবীন্দ্রকাব্যের জগৎ একদিকে সীমাযিত হয়েছিল, অন্যদিকে ইন্দ্রিয়াধিক সাহায্য পেলেও; শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত সামাজিক ইতিহাসেব প্রভাবে নয।

লেওনার্দো কাব্যের কথা সঠিক মনে না রেখেই বলেছিলেন: মানবদেহের প্রতিপ্রকাশের ব্যাপারে কবিব কর্ম এবং চিত্রকরের কর্মে সেই তফাত, যে প্রভেদ খণ্ডিত এবং অখণ্ড শরীরের মধ্যে।—তিনি কবিকে সঙ্গীতকাবের সঙ্গে তুলনা করেন: কিন্তু কবি বহুস্বরের স্বরবদ্ধ বিন্যাসে অক্ষম কাবণ বহু কথা একসঙ্গে বলার ক্ষমতা তাঁর নেই, চিত্রকর যা করতে পাবে তাব ষডঙ্গ সুষমায়, যাতে সমগ্রের অংশগুলি একই সঙ্গে সক্রিয এবং একই সময়ে সমগ্রে ও অংশে দৃশ্য হযে ওঠে। ইত্যাকাব কারণে কবিব স্থান চিত্রকবেব অনেক নিচে গোচর বস্তুর প্রতিপ্রকাশে এবং সঙ্গীতকারের অনেক নিচে অগোচব বস্তুর ক্ষেত্রে।

প্রক্রিয়াগুলি যে ভিন্ন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ প্রতিটি শিল্পেই তার বিশিষ্ট কর্মকাণ্ডবশত বিশিষ্ট সুবিধা ও অসুবিধা আছে। যা চোখেব শিল্প তাতে যেমন কানের কাজ হয না, তেমনি যা মনের শিল্প তাতে যদি কেউ নিছক চোখের শিল্পেব কাজ করতে যায় বা দাবি কবে তাহলে তা তো ব্যর্থ হবেই। মানুষের অভিজ্ঞতার অনেক কিছু তাই চিত্রেব আযত্তে নেই তার কর্মপ্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যেব জন্যই। "দিভিনা কমেদিযা", "কিং লিআর" বা "অডিসি" কাব্যেই সম্ভব, লেওনার্দোর হাতে নয়। এবং কাব্যেও মালার্মের পর থেকে বস্তুব এক সংহত রূপের দিকে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। লেওনার্দোর পরের জ্ঞানে এও জানা কথা যে চিত্রকরের চোখও মানবদেহের খণ্ডিত রূপই একবারে দেখতে পায়, চোখের নিয়মই তাই; সমগ্রের অংশগুলি শিল্পীরই সংযোজনা, একরকম গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক। এমনকি দুই চোখ এক দেখে না। তবু লেওনার্দোর বক্তব্যে একটা অর্ধসত্য আছে এবং রবীন্দ্রনাথ যদি শুধু কবি হতেন, তাহলে তাঁর গান ও ছবির ঐশ্বর্য থেকে আমরা বঞ্চিত হতুম এবং তাঁর শিল্পী

সত্তাও তুলনায় অসম্পূর্ণ থাকত। গান ও ছবির মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তিস্বরূপে তাঁর কাব্যের কীর্তি ও সীমা মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু ঐ কাব্যের কীর্তি ছাড়া কি ঐ মুক্তির কথার অর্থ হয়?

পৃথিবীতে আরো দু-চারজন মহাকবি ছবি এঁকেছেন, যেমন গয়টে বা হুগো এবং চিত্রশাস্ত্রে আলোক ও বর্ণতত্ত্বে গয়টের দান স্মরণীয়। পিকাসোর কবিতাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ইংরেজীতে ব্লেক আছেন একাধারে কবি ও চিত্রকর। কুমারস্বামী রবীন্দ্র-ব্লেক তুলনা করেছিলেন কিন্তু ঠিক মর্মে প্রবেশ করেন নি। ব্লেকের ছবি ও কবিতা একে অন্যের রূপান্তর মাত্র, রবীন্দ্রনাথের ছবিও তাঁর সাহিত্য রচনাবলীর সম্পূরক।

আবার, যদি রবীন্দ্রনাথ চিত্রকলায় এমেট্যর বা শখের কর্মী (কবিতাতেও কি তিনি তাই নন? কোনো কবিতার স্কুলে তো তিনি পাশ করেন নি!) তবু তিনি এলক্রেড ওআলিস্ বা রামজোডের সঙ্গে তুলনীয় নন; কারণ তাঁর চিত্রকলার ভিতে ছিল একটি বিদগ্ধ সভ্যতার সজ্ঞান উত্তরাধিকারী বিশ্বজ্ঞ এক ভারতীয়ের ষাটবছর ব্যাপী শিল্পসংস্কৃতির একনিষ্ঠ চর্চা। তবে এই দৃশ্য বিশ্বের আক্রম এবং সে বিশ্বকে রূপ দেবার নবাবিষ্কৃত ক্ষমতায় তাঁর উল্লাস প্রচণ্ড এবং ছবি আঁকা ব্যাপারট। পরিণত বয়সে আমাদের শুভ্রকেশ কবিকর্তার কাছে শিশুর মতোই একটা উত্তেজনার অভিযান হয়ে উঠেছিল। শ্রীযুক্ত যামিনী রায় যখন তাঁর ছবির প্রশংসা করেন তাই তখন তিনি অত খুশী হন :

"আমার সৌভাগ্য এই বিদায় নেবার পূর্বেই নানা সংশয় এবং অবজ্ঞার ভিতরে আমি তোমাদের এই স্বীকৃতি লাভ করে যেতে পারলুম। এর চেয়ে পুরস্কার এই আবৃত দৃষ্টির দেশে আর কিছু হতে পারে না।"

আর এক চিঠিতে তিনি লেখেন :

"ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারে আমাদের জীবনের উপলব্ধি। এই জন্যে তার একটি অহেতুক আনন্দ আছে। চোখে দেখি— সে যে কেবল সুন্দর দেখি ব'লে—খুশী হই তা নয়। দৃষ্টির ওপরে দেখার ধারা আমাদের চেতনাকে উদ্রেক করে রাখে। ছেলেবেলায় নির্জনঘরে বন্দী হয়ে থাকতুম—কেবল খড়খড়ির ভিতর থেকে নানা কিছু চোখে পড়ত, তার উৎসুক্য মনকে জাগিয়ে রাখত।

"এই হল ছবির জগৎ। যে দেখায় মনটাকে টানে না, যা একঘেয়ে, যার বিশেষ রূপের বৈচিত্র্য নেই তার মধ্যে যেন মন নির্বাসিত হয়ে থাকে।

সে আপন পুরো খোরাক পায় না। ছবির তত্ত্ব এর থেকেই বুঝব। দেখবার জিনিস সে আমাদের দেয়—না দেখে থাকতে পারিনে; তাতে খুশী হই। মানুষ আদিকাল থেকে এই দেখবার উপহার নিজেকে দিয়ে এসেছে—নানা রকম ছাপ পড়েছে মনে। যে রূপের রেখা এড়াবার জো নেই, যা মনকে অধিকার করে নেয় কোনো একটা বিশেষত্ববশত—তা সুন্দর হোক বা না হোক মানুষ তাকে আদর করে নেয়, তাতে তার চারিদিকের দৃষ্টির ক্ষেত্রকে পরিপূর্ণ করতে থাকে। আমরা দেখতে চাই, দেখতে ভালোবাসি। সেই উৎসাহে সৃষ্টিলোকে নানা দেখবার জিনিস জেগে উঠছে। সে কোন তত্ত্ব কথার বাহন হয়, তার মধ্যে জীবনযাত্রার প্রয়োজন বা ভালোমন্দ বিচারের কোনো উদ্যোগ নেই। আমি আছি—আমি নিশ্চিত আছি এই কথাটা সে আমাদের কাছে বহন করে আনে। তাতে আমি আছি—এই অনুভূতিকেও কোনো একটা বিশেষভাবে চেতিয়ে তোলে। ছবি কি—এই প্রশ্নের উত্তর এই যে—সে একটি নিশ্চিত প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের সাক্ষী। তার ঘোষণা যতই স্পষ্ট হয়, ততই সে হয় একান্ত, ততই সে হয় ভালো। তার ভালোমন্দের আর কোনোরকম যাচাই হতে পরে না। আর যা কিছু সে অবান্তর—অর্থাৎ যদি সে কোনো নৈতিক বাণী আনে, তা উপরি দান। তখন বিশ্বদৃশ্যে গানের সুর লাগত কানে, ভাবের রস আসত মনে। কিন্তু যখন ছবি আঁকায় আমার মন টানল, তখন দৃষ্টির মহাযাত্রার মধ্যে মন স্থান পেল। গাছপালা জীবজন্তু সকলই আপন আপন রূপ নিয়ে চারিদিকে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে লাগল। তখন রেখায় রঙে সৃষ্টি করতে লাগল যা প্রকাশ হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যার দরকার নেই। এই দৃষ্টির জগতে একান্ত দ্রষ্টারূপে আপন চিত্রকরের সত্তা আবিষ্কার করল। এই যে নিছক দেখবার জগৎ ও দেখবার আনন্দ, এর মর্মকথা বুঝবেন তিনি যিনি যথার্থ চিত্রশিল্পী। অন্যেরা এর থেকে নানা বাজে অর্থ খুঁজতে গিয়ে অনর্থের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে। কিছুদিন পূর্বে কয়েকজন কবি এবং ভাবুক এসেছিলেন, আমার কাছে ছবির কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি বলবার চেষ্টা করেছিলুম; কিন্তু তাঁরা এর ঠিক উত্তর স্পষ্ট করে কানে তুলেছিলেন ব'লে আমার বোধ হয় নি। সেইজন্যে, ছবি সম্বন্ধে আমার বলবার কথা আমি আজ তোমার কাছে বললুম—তুমি গুণী, তুমি এর মর্ম বুঝবে। পৃথিবীর অধিকাংশ

লোক ভালো করে দেখে না—দেখতে পারে না। তারা অন্যমনস্ক হয়ে আপনার নানাকাজে ঘোরাফেরা করে। তাদের প্রত্যক্ষ দেখাবার আনন্দ দেবার জন্যই জগতে এই চিত্রকরদের আহ্বান। চিত্রকর গান করে না, ধর্মকথা বলে না; চিত্রকরের চিত্র বলে "অয়ম্ অহম্ ভো"—এই যে আমি এই।"

যখন তিনি আগের পঁচাত্তর বছরকে পিছনে ফেলে আবার এক নতুন আরোগ্যের কালান্তরে চলেছেন, ভাঙা ছন্দে অনিশ্চিত নতুন ভাষায়, সেই শেষ বয়সের কবিতার একটিতে দেখি :

"এই মোর জীবনের মহাদেশে
কত প্রান্তরের শেষে,
কত প্লাবনের স্রোতে
এলেম ভ্রমণ করি শিশুকাল হতে—
কোথাও রহস্যঘন অরণ্যের ছায়াময় ভাষা,
কোথাও পাণ্ডুর শুষ্ক মরুর নৈরাশা,
কোথাও বা যৌবনের কুসুম প্রগলভ বনপথ,
কোথাও বা ধ্যানমগ্ন প্রাচীন পর্বত
মেঘপুঞ্জে স্তব্ধ যার দুর্বোধ কী বাণী,
কাব্যের ভাণ্ডারে আনি
স্মৃতিলেখা ছন্দে রাখিয়াছি ঢাকি,
আজ দেখি অনেক রয়েছে বাকি।
সুকুমারী লেখনীর লজ্জা ভয়
যা পরুষ, যা নিষ্ঠুর, উৎকট যা, করেনি সঞ্চয়
আপনার চিত্রশালে;
তার সঙ্গীতের তালে
ছন্দোভঙ্গ হল তাই।
সংকোচে সে কেন বোঝে নাই।
সৃষ্টিরঙ্গভূমি তলে
রূপ-বিরূপের নৃত্য একসঙ্গে নিত্যকাল চলে,
সে দ্বন্দ্বের করতালঘাতে
উদ্দাম চরণপাতে

সুন্দরের ভঙ্গি যত অকুণ্ঠিত শক্তিরূপ ধরে,
বাণীর সম্মোহবন্ধ ছিন্ন করে অবজ্ঞার ভরে।
তাই আজ বেদমন্ত্রে, হে বজ্রী, তোমার করি স্তব—
তব মন্ত্ররব
করুক ঐশ্বর্যদান,
রৌদ্রী রাগিনীর দীক্ষা নিয়ে যাক মোর শেষগান,
আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
রূঢ় পৌরুষের ছন্দে
জাগুক হুংকার
বাণী বিলাসীর কানে ব্যাপ্ত হোক ভর্ৎসনা তোমার ॥"

বস্তুত, অন্য শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর ছন্দ অনেক ভালো আত্ম-উপলব্ধি করেছিল, কথা বা কাব্য-সাহিত্যের অভ্যস্ত শুচিবায়ু তাঁকে "চণ্ডালিকা"য় ব্যাহত করতে পারে নি, চিত্রকলায় প্রাচীরসীমা টানতে পারে নি। ১৯৩০-এ তিনি লণ্ডনে বলেছিলেন : "আমার মনে হল যে সমস্ত বিশ্বই জীবনের ও সৃষ্টির ঐক্যের মধ্যে দিয়ে দেখা যায়। কবির বা শিল্পীর সেইসব সৃষ্টিরই স্থায়িত্বের অধিকার আছে, যা সামঞ্জস্যে সঙ্গত, কারণ পারস্পরিক সম্বন্ধ যোজনই সৃষ্টির নিয়ম। আমি মাঝে মাঝে ভাবি জিরাফের লম্বা গলাটার কি সার্থকতা। যখন ঐ গলাটার জন্যে অতিরিক্ত দাবিটা উঠল, নিশ্চয়ই সারা শরীর বিড়ম্বিত হল এবং যতদিন না-প্রক্রিয়াটা শেষ হল ততদিন নিশ্চয়ই সেটা খাপ খায় নি, তাই সমস্ত শরীরটাকে সচেষ্ট হতে হল আগন্তুককে যথোপযুক্তভাবে বরণ করবার প্রস্তুতিতে। এরকম ব্যাপার বিশ্ব ব্যেপে চলেছে।"

চিত্রে রবীন্দ্রনাথ সব বস্তুর চরম ইসথেটিক বা সংবেদন-উপযোগ উপলব্ধি করেছিলেন, যদিও সে তুলনায় কাব্যে তাঁর সৌন্দর্যের মান ছিল গোঁড়া ধরনের। সাহিত্যে তিনি বারবার এবং বিস্ময়করভাবে প্রবল চেষ্টা করলেও সমগ্র বিচারে বলতে হয়, সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর তত্ত্বে ও প্রয়োগে সুন্দরকে চিনেছিলেন তন্বু, পেলব, মার্জিত, আধ্যাত্মিক, একটু অভিজাতমন্য, একটু টেনিসনীয় ভাবে। সজনে ডাঁটার বিষয়ে আপত্তি তিনি কাব্যে তুলেছিলেন, কিন্তু চিত্রে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে, "উট কিম্ভূত জানোয়ার, কিন্তু মরুভূমিতে নিজ পারিপার্শ্বিকে, উটও সম্পূর্ণতা পায়।" কবিতার চেয়ে ছবিতে বস্তুর নিজ পারিপার্শ্বিক দেখা ও রচনা করা আরো সহজ; যদিও অবশ্য রিল্‌কে

অথবা পাস্তেরনাকের মতো আধুনিকদের কবিতাতেও সে প্রেরণাসঙ্কর চেষ্টা দেখা যায়।

॥ তিন ॥

রবীন্দ্রনাথের দু হাজার না হোক বেশ কিছু ছবি যেই দেখেছে সেই অভিভূত হয়েছে এক মহাপুরুষের বিশ্বরূপদর্শনের স্বকীয়তায় ও বৈচিত্র্যে। এ এক আশ্চর্য নির্ভীক বিশ্ব, এক প্রবল ব্যক্তিস্বরূপের নিবিড় ঐশ্বর্যে বিস্ময়কর ও বিস্মিত জগৎ। এ জগতে বস্তুর প্রকাশ বহুরূপে অন্তহীন, কখনো বা বস্তুর সুকুমার পেলবপ্রায় মেয়েলী লালিত্য, কখনো বা সরল বস্তু, সন্ত্রাসের বা দুঃস্বপ্নের বিশ্বের বস্তু বা সূক্ষ্ম কল্পলাল বস্তু। মনের এ চিত্রলোকে নানা মেজাজ, গতির ও স্তব্ধতার আনন্দের ভাব, তীব্র অভীপ্সা, কঠিন উপহাস, তীক্ষ্ণ ঠাট্টা, স্নিগ্ধ মমতা। এবং প্রায় সর্বদা হাত অভ্রান্ত টানে নিশ্চিত। বেগবান রেখার সৌন্দর্য যেমন দুঃসাহসিক তেমনি অনিবার্য, যদিচ প্রেরণা অনেক সময়েই পরীক্ষামূলক; এমনকি স্থির পাহাড়ের বা শান্ত মুনিমূর্তির ছবিতেও মনে হয় প্রচণ্ড বেগ যেন তলে তলে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এবং অধিকাংশ ছবিতে রঙের ব্যবহার যেমন ব্যঞ্জনাঢ্য তেমনি নব নব উন্মেষশালী। রবীন্দ্রনাথ অস্থির কলম তুলি বা আঙুল প্রযোগ করতেন সমান ও পূর্ণ স্বাধীনতায়, নানা কালিতে এবং নানা জাতের রঙে। মনে আছে একদিন তিনি গল্প করতে করতে ছবি আঁকছিলেন, চেয়ারটিতে তিনি এবং বাইরের লোকটি সিল্কঢাকা বিছানায় সঙ্কুচিতভাবে বসে। রং ফুরিয়ে গেল, কিন্তু ছবির তাগিদ নয়; চামড়ার কাজের একশিশি রং এনে ছবি শেষ করলেন। দরকার হলে ফুল চটকে তিনি ছবির রঙে ব্যবহার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের আঁকার পদ্ধতিও নানান, কখনো তিনি সরাসরি আঁকতেন একেবারে চূড়ান্তভাবে, কখনো বা অন্বেষী রেখাপাতে-পাতে। তাঁর ছবি দেখলেই এবং বিশেষ করে, আঁকতে দেখলে বোঝা যেত যে সাহিত্য ও সঙ্গীতের দীর্ঘ অভ্যাসে ও সিদ্ধিতে ছন্দের ও রূপের বোধ তাঁর কাছে প্রাথমিক হয়ে গিয়েছিল, স্নায়ুর মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল।

বলা বাহুল্য, অভ্রান্ত চোখ ও হাতেরও দুর্বল মুহূর্ত আসে, মাঝে মাঝে ধ্যানের আর নির্মাণের মধ্যে অভিন্নতা কেটে যায়। তখন বিন্যাসরীতিতে বা

ছবির মেজাজে খণ্ডিতভাব আসে। কিন্তু সেরকম কাজ গৌণ ও সংখ্যায় নগণ্য। ভালো ছবিগুলিতে, এবং সংখ্যায় তা বহু, দর্শকের চোখ খুশিতে ঘুরে বেড়ায় রেখার সঙ্গে সঙ্গে বা মুগ্ধ হয়ে খুঁজে বেড়ায় রঙের বর্ণালি বা নানা দীপ্তি। এসব ছবিতে বোঝা যায় কিভাবে রবীন্দ্রনাথ পাশ কাটিয়ে গেছেন একপক্ষে মৃত আকাডেমিক বাস্তববাদের, যাতে প্রকৃতির পুনঃরূপায়ণ নেই, আছে শুধু প্রতিরূপ; এবং অন্যপক্ষে প্রাচ্যবাদী অধ্যাত্মবিলাসীদের নীরক্ত কল্পবিলাস। অবশ্য ভারতশিল্পের তথাকথিত প্রাচ্যধর্মী রেনেসান্সে রবীন্দ্রনাথেরও দান ছিল, অন্তত পরোক্ষে। এই ধারাই ছড়াল কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে, লক্ষ্মৌ প্রয়াগ লাহোর মাদ্রাজ, সারা ভারতে। কিন্তু ফলেন পরিচীয়তে, পরে এই জীবনবিমুখ ভারতবাদী শিল্পের শিল্পমন্যতা এবং চিত্রগত দুর্বলতার বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদ তাঁর নিজেরই চিত্রাবলী।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের চিত্রলোক ভারতীয় মানুষের ও শিল্পীরই জগৎ—যদিও রবীন্দ্রনাথের ভারতীয়তায় সেই জীবনবিরোধী পরোক্ষতত্ত্বের চর্চা নেই, যে চর্চা আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামীর মতো পণ্ডিত ব্যক্তি প্রচলিত করেন, বিশেষত তাঁর মরমিয়া বস্টনবাসী যুগে। পেশাদার ভারততাত্ত্বিকরা আজকাল এই ভারত-ব্যাখ্যা জনপ্রিয় করে তুলেছেন। কিন্তু স্টেলা ক্রামরিশ বা অর্ধেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিপত্তি সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের সত্তায় এই অলৌকিকতা নেই, তাঁর শিল্পদৃষ্টি এই রৌদ্রদীপ্ত গরম দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্প, ভারতীয় ভাস্করের দৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম। এ দৃষ্টি প্রত্যক্ষ বিশ্বের সব বস্তুই গ্রাহ্য মনে করে, এমনকি বস্তুর স্বপ্নসম্ভাব্য রূপও এই শিল্প বাদ দেয় নি তা সে মানবিক জান্তব উদ্ভিদ যে কোনো জগতের বস্তু হোক না কেন, সবই শিল্পরূপে প্রকাশ পেয়েছে এবং এই রূপায়ণ একটা সভ্য জীবনের প্রতি মুক্তকল্প অথচ নিয়মানুগ মনোভাবে স্বচ্ছ।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য আধুনিক মানুষ ছিলেন, ভারতীয় কিন্তু আধুনিক জগতের ভারতীয়। যে 'মিথ' বা পুরাণে সেকালের ভাস্করের কাজ করবার সহজ সুবিধা ছিল, সে 'মিথ' আজ মৃত বা মুমূর্ষু এবং রবীন্দ্রনাথ চিত্রলোকে জীবনধর্মী বর্তমান ছেড়ে পুণ্য অতীতে যাবার কথা ভাবেন নি। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যের যে সুবিধা তিনি পান, ইওরোপের বুর্জোয়া ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী আধুনিক শিল্পীরা তা পান নি। ভারতবর্ষে রিয়ালিস্‌ম্‌ সুররেয়ালিস্‌ম্‌ প্রভৃতির সমস্যা অবান্তর। আমাদের কৈলাসভাবনায় বাস্তব কখনো রীতির বিন্যাসে আসতে

ভয় পায় নি, আমাদের রিয়ালিসম্ ও আবস্ট্রাক্ট রূপ অঙ্গাঙ্গী। প্রতীক আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নিত্যসঙ্গী এবং সাক্ষাৎ জীবনের প্রেম হাতে হাত দিয়ে চলেছে শাস্ত্রীয় অনুশাসনের সঙ্গে দ্বন্দ্বময় বিস্তৃত আততিতে ও শিথিল বন্ধনে।

এই ভারতীয় ভূমিতে যামিনী রায় এবং রবীন্দ্রনাথই প্রথম আধুনিক শিল্পীর মানস আনলেন। পিকাসোর চেয়ে বরং মোদিল্লিআনি বা অন্যপক্ষে এমিল নল্‌ডে বা মাক্স এর্নশট রবীন্দ্র-মানসে আত্মীয় পেতেন যদিও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে টিউটনী উদ্দামতা বা উত্তরে রাত্রির দুঃস্বপ্নের বিলাস কিছুমাত্র নেই। ক্লে-র চারু অথচ ভয়াল কল্পক্রীডার খামখেয়ালিপনাও রবীন্দ্রনাথের চিত্রে অনুপস্থিত। প্রসঙ্গত, ক্লে-র জরনাল্ পড়লে হয়তো রবীন্দ্রচিত্রের স্বরূপ বুঝতে সুবিধা হবে। রবীন্দ্রনাথও ক্লে-র মতো রেখার অভিযানে উৎসুক হয়ে থাকতেন : একটা ভৌগোলিক প্ল্যানের ভিত্তিতে গভীবতর অন্তর্দৃষ্টির দেশে একটা অভিযান প্রস্তুত করা যাক। মৃত বিন্দুটিকে নাড়া দিতে হবে গতির প্রথম ক্রিয়া দ্বাব' (রেখা)। একটু পরে নিশ্বাস নেবার জন্য থামো (ভাঙা রেখা, বারবার ছেদ দিয়ে স্পষ্টবাক্)। আরেকবার ফিরে তাকাও ইতিমধ্যে কতটা এলে (প্রতি-গতি)। মনে মনে বিবেচনা করো এখান থেকে ওখান পর্যন্ত ঐ রাস্তাটা (' থার একটা গোছা)। একটা নদী আমাদের বাধা হল ; আমরা নৌকা নিলুম (তরঙ্গায়িত গতি)। একটু দূরে একটা সাঁকো রয়েছে (বঙ্কিম রেখার সমষ্টি)।

চিত্রলিপি ২-এর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথও বলেছেন :

"Desultory lines obstruct the freedom of our vision with the inertia of their irrelevance"। রবীন্দ্রনাথের অনেক ছবিতে দেখা যায় কেমন করে তিনি উদ্দেশ্যহীন রেখার অপ্রাসঙ্গিক জাড্য দূর ক'রে দৃষ্টিকে মুক্তি দেন। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই কিভাবে রেখাগুলি মুক্ত হল এবং তারপর তাদের সচ্ছল জীবনযাত্রা করতে লাগল ; রঙের বিন্যাস তন্ময় হয়ে দেখি, অনচ্ছ গাঢ় বা ভাস্বর আলোকময়, তুলিতে আহত বা কলমে টানা বা আঙুলে ঘষা ; কখনো তুলির আঘাত ?.রল কখনো ক্রমিক আক্রমণ। রেখার মুক্তি রবীন্দ্রনাথের ছবিতে জর্মানদের মতোই উল্লেখযোগ্য ; কিন্তু জর্মানদেব যা নেই, রবীন্দ্রনাথের বহু ছবিতে বর্ণপরম্পরায় স্থানবোধের গভীরতা ও টোন বা রঙের আভার বিন্যাসে কবিত্ব স্পষ্ট দেখা যায়।

ছাপাছবিতে এই বর্ণচ্ছটার স্বরবিন্যাস বোঝা শক্ত তবুও পৃথ্বীশ নিয়োগী ও

পুলিন সেনের যত্নে চিত্রলিপিতে খানিকটা রঙের আভাস এসেছে। অবশ্য খুব ভালো ছাপাতেও রঙের লিপ্তপ্রলিপ্ত অতিসূক্ষ্ম আভার খেলা আনা শক্ত, যেমন রবীন্দ্রনাথের মস্কোতে আঁকা ছবিটিতে নীল ও কালো এবং বেগুনীর যে বর্ণিকাভঙ্গ আছে (ইন্দো-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের উদ্যোগ সত্ত্বেও) তা ছাপাতে ঠিক আসে নি। রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো ছবিতে, যেমন এই সোভিয়েত-বিষয়ক চিত্রটিতে রঙের খোল বা জমি ছাপায় সবটা না খুললেও ছবির গঠনটি ছাপাতেও গৌণ হয় না। আবার কোনো কোনো ছবিতে রংই মুখ্য। সেটা নির্ভর করে বৃদ্ধ কবির জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে, ভিন্ন ভিন্ন বস্তু যেভাবে ভিন্ন ভিন্ন মেজাজ নিয়ে প্রতিভাত হয়েছে তার উপরে, কখনো একক, কখনো একাধিকের সংযোজনায়, সবসময়েই ছন্দের অমোঘ কিন্তু স্বাধীন ন্যায়নিষ্ঠায়, রেখানির্ভর বা বর্ণময় বা দুইই একত্রে।

রবীন্দ্রচিত্রাবলীর বৈচিত্র্যের জন্যেই তার সরাসরি ভাগ করা শক্ত। ক্রমবিকাশের দিক থেকে হয়তো একটা ভাগ সম্ভব: বিশ দশকের ছবিগুলি প্রায় লিপির বিপদআপদের ভিত্তিতে রচিত নক্সা বা প্যাটার্ন, কাটাকুটি থেকে সেগুলির আরম্ভ, পরিণতি নিছক শিল্পরচনার মজায়। কিন্তু এখানেও সরাসরি কিছু বলা হঠকারিতা, "পূরবী"র পাণ্ডুলিপিতে যেমন কাটাকুটির চিত্ররূপায়ণও আছে, বিজয়ার সঙ্গে স্পানিশ-বাংলা চর্চার নমুনার সঙ্গে, তেমনি আবার সম্পূর্ণ চিত্রও বর্তমান। পরের ছবিগুলি শুদ্ধ চিত্রময়। তার কিছু সাক্ষাৎ জীবনানুগ, কিছু আলেখ্য, নানান লোকের, নিজের এবং ঐতিহাসিক মানুষেরও, যেমন দান্তের। আরেক ভাগে দেখা যায় ফুল পাখি জীবজন্তু সব চলন্ত বা স্থির প্রাকৃত রূপের সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের রূপের দিকে ঝোঁক, কিছুতে পাওয়া যায় রূপের অপ্রাকৃত বিন্যাসের দিকে মনোযোগ।

নানা দেশের নানা যুগের জীবনের বা শিল্পের স্মৃতি জেগে ওঠে এই সব ছবি দেখে। এবং একটি বিশেষ ধরনের দীর্ঘায়িত মেয়ের মুখ স্মৃতির নানা বিন্যাসে বারবার দেখা যায়। আবার কিছু ছবিতে যে সব আকার বা রূপ দেখা যায়, তা জলেস্থলে কেউ দেখে নি, সে সব রূপ কবির অফুরন্ত কল্পনার স্বয়ম্বশ সৃষ্টি। রঙের সাহসী লেপে বা রেখায় বিস্তৃত বা রঙের পর্দায় আভার বিন্যাসে জহরতের মতো বা মোজেকের মতো জ্বলজ্বলে দেয়ালির মতো প্রদীপ্ত অনেক সময়েই এসব ছবিতে নীল বা কালোর ভিত্তিবর্ণে বা পশ্চাৎপটে উজ্জ্বল রংগুলির প্রাণময়তা আজও অম্লান হয়ে আছে। রেখাবলিষ্ঠ এক বা বহুবর্ণ রবীন্দ্রচিত্রাবলী

দেখে মনে হয় বাখের ফ্যুগের গভীর বৈচিত্র্যের প্রায় অতিমানবীয় সুষম গৌরবের কথা, যে বৈচিত্র্য ও সুষমা চেতন-অবচেতনের অন্তর্নিহিত দর্শন থেকে সম্পূর্ণ স্বয়ম্ভর রেখারঙের সম্বন্ধ-পরম্পরার গতিতে শুদ্ধ স্বাধীন। কল্পনার উদ্ভট সন্ধানে তথাকথিত আধুনিক খেয়ালের স্বকীয়তার একটা নতুন কিছু করার তাগিদে তিনি রূপের বিকার চর্চা করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

আমাদের দেশের লোকসংস্কৃতিকে যোগ্য মর্যাদা দিয়ে অধ্যয়নের কাজে যারা উদ্যোগী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ হলেন সর্বাগ্রগণ্য। তাঁর গানে, নৃত্যনাট্যে, নাটকে ইত্যাদিতে লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের বিভিন্ন ধারার সযত্ন সমাবেশ ঘটেছে। কিন্তু লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ শুধু তার বহিরঙ্গ রূপের প্রতি সীমাবদ্ধ নয়। দেশকে জানার জন্য লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের সঙ্গে পরিচিতি যে কত প্রয়োজন সে কথা তিনি বহুদিন আগে শিক্ষিত সমাজের সামনে তুলে ধরেছিলেন। বাংলা ১৩১২ সালে তিনি ছাত্রদের প্রতি এক ভাষণে, "দেশের কাব্যে গানে ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষিকুটিরে" স্বদেশের যে পরিচয় ছড়িয়ে আছে তার সন্ধানে আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান জানান। ঐ একই ভাষণে তিনি জনগণের জীবনপ্রবাহ সম্বন্ধে শিক্ষিতসমাজের জ্ঞানের অভাবের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন,

> "তাঁহারা একথা মনেই করেন না প্রকাণ্ড জনসম্প্রদায় অলক্ষ্যগতিতে নিঃশব্দচরণে চলিয়াছে, আমরা অবজ্ঞা করিয়া তাহাদের দিকে তাকাই না বলিয়া যে তাহারা স্থির হইয়া বসিয়া আছে তাহা নহে, নূতন কালের নূতন শক্তি তাহাদের মধ্যে পরিবর্তনের কাজ করিতেছেই, সে পরিবর্তন কোন্ পথে চলিতেছে, কোন্ রূপ ধারণ করিতেছে, তাহা না জানিলে দেশকে জানাই হয় না।"

শুধু জানাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। জাতীয় সংস্কৃতিতে লোকসংস্কৃতির স্থান ও ভূমিকা কি সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর সেই মতামতগুলিকে অভিনিবেশের সঙ্গে অধ্যয়ন করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কেননা সাধারণভাবে শিক্ষিত সমাজে এই বিষয়ে সচেতনতার অভাব রয়েছে। আমাদের দেশে ইংরেজ আমলে ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী-সমাজের

সঙ্গে লোকমানসের যে ব্যবধান গড়ে উঠেছিল তা আজও দূর হয় নি। অথচ প্রত্যেক দেশে জাতীয় সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের উৎসরূপে কাজ করে লোকসংস্কৃতির আবহমানকাল প্রচলিত নিরবচ্ছিন্ন ধারা। প্রত্যেক জাতির প্রাচীন মহাকাব্যগুলি এমনি লোকমুখে প্রচলিত কাহিনীগুলিকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য, বিভিন্ন পুরাণ, পঞ্চতন্ত্র, বৃহৎকথা, কথাসরিৎসাগর, জাতক, নানা সন্ত-কাহিনী, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতির উদ্ভব হয়েছে এইভাবেই এবং সেগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জনচিত্তকে প্রভাবিত করেছে। শিষ্ট সাহিত্যে সব সময় লোকসংস্কৃতিব পরিপূর্ণ প্রকাশ হয় না কিন্তু সেই ধাবাই নেপথ্য থেকে জাতির মননভঙ্গি ও মূল্যবোধের প্রকৃতি নির্ধারিত করে। যে সব সাহিত্যিক ও শিল্পী সেই উৎস থেকে প্রাণরস সংগ্রহ কবে যুগোপযোগী সৃষ্টি করেন তারা জনচিত্ত জয়ে সফল হন। তাঁদের অবদান আবার লোকমানসে নব-নব উপাদান সৃষ্টির প্রেরণা হিসাবে কাজ করে। ইউরোপে উদীয়মান পুঁজিবাদের যুগে বুর্জোয়া শ্রেণীব বুদ্ধিজীবীরা লোকসংস্কৃতির দিকে নতুনভাবে আকৃষ্ট হন এবং তাকে সুষ্ঠুভাবে অধ্যযনের কাজ শুরু হয়। ইংবেজ নৃতত্ত্ববিদ স্যার জেমস ফ্রেসার (Sir James Fraser) লিখিত "ফোকলোর ইন্ ওল্ড টেস্টামেণ্ট" পুঁজিবাদী শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লোকসংস্কৃতির একটি প্রধান অঙ্গ অর্থাৎ লোককথা অধ্যয়নপদ্ধতিব একটি শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

ববীন্দ্রনাথ লোকসংস্কৃতিব উপবোক্ত ভূমিকার কথা খুব সহজ ও পবিষ্কাব-ভাবে তুলে ধরেন। "গ্রাম্য সাহিত্য" নামক প্রবন্ধে তিনি বলেন

> "দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে প্রথমে কতকগুলি ভাব টুকরা টুকবা কাব্য হইয়া চারিদিকে ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায়। তারপবে একজন কবি সেই টুকরা কাব্যগুলিকে একটা বড়ো কাব্যেব সূত্রে এক কবিয়া একটা বড়ো পিণ্ড করিয়া তোলেন।"

এই বিষয়টিকেই "সাহিত্যসৃষ্টি" নামক প্রবন্ধে আরো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে হরপার্বতীব কত কথা যা কোনো পুরাণে নেই, রামসীতার কত কাহিনী যা মূল রামায়ণে পাওয়া যায় না এমন সব জিনিস গ্রামের গায়ক-কথকদের মুখে মুখে ভাঙা ভাঙা ছন্দ এবং গ্রাম্য ভাষার বাহনে কত কাল ধরে ঘুরে বেড়িয়েছে। এমন সময় কোনো রাজসভার কবি যখন কোনো বৃহৎ বিশিষ্ট সভায় গান গাইবার জন্য আহূত হলেন তখন তিনি সেই

গ্রাম্য কথাগুলিকে আপনার করে নিয়ে মার্জিত ছন্দে ও গম্ভীর ভাষায় দাঁড করিয়ে দিয়েছেন। পুরাতনকে নূতন এবং বিচ্ছিন্নকে এক করে দেখালেই সমস্ত দেশ তার ভিতরে যেন নিজের হৃদয়কে স্পষ্ট এবং প্রশস্তভাবে দেখতে পায়। দেখে আনন্দলাভ করে। প্রথমে নানা মুখে প্রচলিত খণ্ড খণ্ড গানগুলি একটা কাব্যের কাঠামোর মধ্যে বাঁধা পড়ে সেই কাব্য যখন আবার বহুকাল ধরে সর্বসাধারণের কাছে গাওয়া হতে থাকে তখন তার উপর নানা দিক থেকে কালের চিহ্ন পডতে থাকে। সেই কাব্য দেশের সমস্ত দিক থেকে নিজের পুষ্টি টেনে নিয়ে সমস্ত দেশের জিনিস হয়ে ওঠে। তার ভিতর সমস্ত দেশের অন্তঃকরণের ইতিহাস, তত্ত্বজ্ঞান, ধর্মবোধ, কর্মনীতি এসে মিলিত হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, ইংলণ্ডের আর্থার কাহিনী, আরব্য উপন্যাস, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার সাগা সাহিত্য ইত্যাদির জন্ম হয়েছে এই ভাবেই। "এইরূপ ছড়ানো ভাবের এক হইয়া উঠিবার চেষ্টা মানবসাহিত্যে কয়েক জায়গায় অতি আশ্চর্য বিকাশ লাভ করিয়াছে। গ্রীসে হোমারের কাব্য এবং ভারতবর্ষে রামায়ণ ও মহাভারত।" রামায়ণ সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে বলেন যে, রামায়ণ রচিত হওয়ার আগে রামচরিত সম্বন্ধে যে সমস্ত আদিম পুরাণকথা জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল এখন আর সেগুলিকে খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু সেইগুলির মধ্যেই রামায়ণের পূর্বস্চনা হয়েছিল।

জাতীয় সংস্কৃতিতে লোকসংস্কৃতির স্থান এবং ভূমিকা কি তা বোঝার পরে লোকসংস্কৃতির চরিত্রকে বোঝার প্রশ্ন। লোকসংস্কৃতি অধ্যয়ন তথা তার মূল্যায়নের পদ্ধতির কথা এই প্রশ্নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নৃতত্ত্ববিদ বিশেষত লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বুর্জোয়া পণ্ডিতদের মতে তার মধ্যে পাওয়া যায় লোকমানসের প্রতিফলন অর্থাৎ লোকসাধারণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। মানুষের ইতিহাস এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। তাই বিভিন্ন যুগের লোকসংস্কৃতির ভিতরে সামাজিক ঐতিহাসিক পরিবর্তন এবং লোকসাধারণের জীবনে তার প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়। স্মরণাতীত কাল থেকে পুরুষানুক্রমে যে সব কাহিনী ও উপাখ্যান চলে আসছে তার পাশাপাশি অনেক নতুন উপাখ্যান ও কাহিনী সৃষ্টি হয়। অনেক সময় সেইসব পুরুষানুক্রমে প্রচলিত কাহিনীর মধ্যেই নতুন যুগের অভিজ্ঞতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা উপাদানগুলি যোগ হয়। পুরাতনের কাঠামো ঠিক রেখে তাতে নতুন

যুগমানসের প্রতিফলন হয়ে থাকে। বাইরের চেহারা ঠিক থাকলেও নতুন অর্থ ও তাৎপর্য যুক্ত হয়। লোকনৃত্য, সঙ্গীত, উৎসব, অনুষ্ঠান ইত্যাদি লোকমানসকেই প্রতিফলিত করে সুতরাং তাতেও নতুন অর্থ যুক্ত হয়। আবার হয়তো পুরাতনের পাশে নতুন ধারা গড়ে ওঠে। বুর্জোয়া শ্রেণীর পণ্ডিতেরা যুগমানসের প্রতিফলনের সত্যটিকে তার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেন নি, তার কারণ সেই শ্রেণী পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা ও জীবনাদর্শকেই চিরন্তন মনে করে। উপরন্তু তারা নিজ শ্রেণীকেই সমগ্র জাতির প্রতিনিধি এবং নিজ শ্রেণীর স্বার্থকেই সমগ্র জাতির স্বার্থ বলে বিবেচনা করে। সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত উদীয়মান পুঁজিপতিশ্রেণী নিজেকে জাতীয় ঐক্যের ধারক ও বাহক রূপে প্রচার করে। তাদের জাতীয় ঐক্যের ধারণা হল অমূর্ত এবং ভাববাদী। সেই ধারণা শ্রেণীদ্বন্দ্বের সত্যটিকে আড়াল করে রাখতে চায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্মানির বিখ্যাত গ্রিম (Grimm) ভ্রাতৃদ্বয় লোকসংস্কৃতির অনুশীলনের পথ প্রবর্তন করেন। কিন্তু তাঁদের মূল লক্ষ্য হয় এক অমূর্ত চিরন্তন জার্মান 'জাতীয় আত্মা'র তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করা। জার্মানির লোকসংস্কৃতির প্রবাহে সেই জাতীয় আত্মারই বিভিন্ন অভিব্যক্তিকে তাঁরা অনুসন্ধান করেন। পরবর্তী যুগে পুঁজিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান সংগ্রামের পরিস্থিতিতে দেখা যায় যে বুর্জোয়া পণ্ডিতেরা লোক-সংস্কৃতির আদিম যুগগুলির মধ্যেই তাঁদের অধ্যয়ন এবং অনুসন্ধানকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। যুগে যুগে সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের সত্যটি তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আলোচনা করলে দেখা যায় যে তিনি বুর্জোয়া শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির গণ্ডীকে অতিক্রম করে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন। তিনি লোকসংস্কৃতির প্রবাহে শুধুমাত্র পরিবর্তনশীল ইতিহাস ও যুগমানসের প্রতিফলন লক্ষ্য করেই ক্ষান্ত হন নি। সেই প্রতিফলনের ধারার মধ্যে যুগে যুগে সামাজিক অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের সংগ্রামের অভিব্যক্তিগুলিকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর বিশ্লেষণে লোকমানসে বিদ্রোহের সুরটি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। রামায়ণের মূল কাহিনীর মধ্যেই কি ভাবে বিভিন্ন যুগের সামাজিক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ফলে লোকমানসের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ফুটে উঠেছে সে সম্বন্ধে কবিগুরু

"সাহিত্যসৃষ্টি" নামক প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন যে আর্যদের ভারত-অধিকারের আগে দ্রাবিড়জাতীয়েরা আদিম-অধিবাসীদের জয় করে দেশে নিজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেই দ্রাবিড়রা অসভ্য ছিল না। তাবা আর্যদের কাছে সহজে হার মানে নি। তারা আর্যদের যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করত, চাষে ব্যাঘাত ঘটাত এবং কুলপতিরা অরণ্য পরিষ্কার করে যে সব আশ্রম স্থাপন করেছিলেন সেখানে হানা দিয়ে উৎপাত করত। রামচন্দ্র বানবগণকে অর্থাৎ ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের দলে নিয়ে বহুদিনের চেষ্টায় ও কৌশলে দ্রাবিড়দের প্রতাপ নষ্ট করে দিতে সফল হন। সেই কারণেই আর্যদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা হয় এবং গৌরবগাথা প্রচলিত হয়। সেদিন আর্যদেব মধ্যে গোরু ধন বলে এবং কৃষি পবিত্র কর্ম বলে গণ্য হত। চাষের লাঙ্গল দিয়ে আযগণ ভাবতবর্ষেব মাটিকে ক্রমশ আপন কবে নিচ্ছিলেন। লাঙ্গলের মুখে অরণ্য হটে গিয়ে কৃষিক্ষেত্র বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। রাক্ষসেরা ছিল সেই ব্যাপ্তির অন্তরায়। রবীন্দ্রনাথ বলেন যে রামচন্দ্র শত্রুদের পবাজিত করলেও বিনাশ করেন নি বা তাদের বাজ্য হরণ করেন নি। বিজয়ের মধ্য দিয়ে তিনি ক্রমশ আর্য-অনাযেব মিলন ঘটান এবং পরস্পবেব মধ্যে আদান-প্রদানের সম্বন্ধ স্থাপন করেন। তারই ফলে দ্রাবিড়গণ আর্যদের সঙ্গে এক সমাজভুক্ত হযে ক্রমশ হিন্দুজাতি সৃষ্টি কবে। হিন্দুজাতির ভিতর উভয় জাতিব আচারবিচাব পূজাপদ্ধতি মিশে গিয়ে ভারতবর্ষে শান্তি স্থাপিত হয়। ক্রমে ক্রমে যখন আর্য-অনার্যেব মিলন সম্পূর্ণ হল, পরস্পরেব ধর্ম ও বিদ্যাব বিনিময় হয়ে গেল তখন বামচন্দ্রের পুবাতন কাহিনী লোকেব মুখে মুখে নতুন রূপ ধাবণ করতে লাগল। কাহিনীতে রূপান্তর ও ভাবান্তর ঘটতে শুরু করল।

যে কবি দেশপ্রচলিত চবিতগাথাগুলিকে একত্র ক'বে মহাকাব্যেব রূপদান করেন তিনি অনার্য-বশ ব্যাপারকে প্রাধান্য দেওয়াব বদলে এক মহৎ চরিত্রের সম্পূর্ণ আদর্শকে রূপায়িত করে তোলেন। সেদিনের হিন্দুসমাজেব পক্ষে যে সব গুণ আদর্শ ছিল তাকেই আদিকবি রামচরিত্রে একত্র সন্নিবেশ করেন।

"রামায়ণের আদিকবি, গার্হস্থ্যপ্রধান হিন্দুসমাজের যত কিছু ধর্ম রামকে তাহারই অবতার করিয়া দেখাইয়াছিলেন। পুত্ররূপে, ভ্রাতৃরূপে, পতিরূপে বন্ধুরূপে, ব্রাহ্মণধর্মের রক্ষাকর্তারূপে, অবশেষে রাজারূপে

বাল্মীকির রাম আপনার লোকপূজ্যতা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি যে রাবণকে মারিয়াছিলেন সেও কেবল ধর্মপত্নীকে উদ্ধার করিবার জন্য। অবশেষে সেই পত্নীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন সেও কেবল প্রজানুরঞ্জনের অনুরোধে। নিজের সমুদয় সহজ প্রবৃত্তিকে শাস্ত্রমতে কঠিন শাসন করিয়া সমাজরক্ষার আদর্শ দেখাইযাছিলেন। আমাদের স্থিতিপ্রধান সভ্যতায় পদে পদে যে ত্যাগ, ক্ষমা ও আত্মনিগ্রহের প্রয়োজন হয় রামের চরিত্রে তাহাই ফুটিয়া উঠিয়া রামায়ণ হিন্দু সমাজেব মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছে।"

কিন্তু আদিকবি রামচরিত্রকে যেখানে দাঁড় করিয়েছিলেন তা সেখানেই স্থির হয়ে নেই। বাল্মীকি রামকে মানুষরূপে চিত্রিত করেন। রবীন্দ্রনাথ সেই জিনিসটিকে তাঁর মানবতাবাদী দৃষ্টিতে নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় বাল্মীকির মুখ দিয়ে বলান : "তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দে গানে।" আদিকবি রামচরিত্রে অতিপ্রাকৃত উপাদানের সমাবেশ ঘটান। সেই অতিপ্রাকৃত ক্রমে মানুষ রামকে পিছনে ফেলে দেবতায় পরিণত করে। ক্রমশ রামায়ণের মূল সুরের মধ্যে নতুন একটি সুর প্রবেশ করে। সেটি হল রামের ভক্তবৎসলতা। সেই ভাবটির একজন প্রধান প্রবক্তা রূপে কৃত্তিবাসের নাম রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণে ভক্তির লীলাই প্রধান। কৃত্তিবাসের রাম হয়েছেন ভক্তবৎসল। তিনি অধম পাপী সকলকে উদ্ধার করেন। অস্পৃশ্য গুহক চণ্ডাল, বনের পশু বানর, শত্রু রাবণ, শরণার্থী বিভীষণ সকলকেই তিনি প্রেমের দ্বারা ধন্য করেন। লোকমানসে রামচরিত্রেব এই নূতন অর্থ গ্রহণেব সামাজিক কারণ অনুসন্ধান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

"ভারতবর্ষে এক সময়ে জনসাধারণের মধ্যে এই একটা ঢেউ উঠিযাছিল। ঈশ্বরের অধিকার যে কেবল জ্ঞানীদিগেরই নহে এবং তাঁহাকে পাইতে হইলে যে তন্ত্রমন্ত্র ও বিশেষ বিধির প্রয়োজন করে না, কেবল সরল ভক্তির দ্বারাই আপামর চণ্ডাল সকলেই ভগবানকে লাভ করিতে পারে, এই কথাটা হঠাৎ যেন একটা নূতন আবিষ্কারের আনন্দ ভারতের জনসাধারণের দুঃসহ হীনতাভার মোচন করিয়া দিয়াছিল। সেই বৃহৎ আনন্দ দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যখন ভাসিয়া উঠিয়াছিল তখন যে সাহিত্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল তাহা জনসাধারণের এই নূতন গৌরব লাভের সাহিত্য।"

এই ভাবটিই প্রবল হয়ে ভারতবর্ষে রামায়ণকথার ধারাকে গঙ্গার শাখার ভাগীরথীর মতো একটি নূতন ও বিশেষ পথে নিয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ এখানেই থামেন নি। রামায়ণকথার যে একটি অত্যন্ত আধুনিক শাখা মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে তার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন এবং তার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। সেই ধারাটি পুরাতন কথাকে অবলম্বন করলেও বাল্মীকি এবং কৃত্তিবাসের ধারার চেয়ে বিপরীত প্রবৃত্তি অবলম্বন করেছে। কবিগুরু বলেন যে 'মেঘনাদবধ কাব্যে' আছে একটি বিদ্রোহ। কবি যে শুধু পয়ারের বেড়ি ভেঙেছেন তাই নয়, রাম-রাবণের সম্বন্ধে আমাদের মনে যে চিরাচরিত ভাব চলে এসেছে তারও শাসন লঙ্ঘন করেছেন। রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ মধুসূদনের কাব্যে বড় হয়ে উঠেছে। তিনি সেই শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করেছেন যে শক্তি স্পর্ধায় দেবতাদের অভিভূত করে নিজের দাসত্বে নিযুক্ত করেছে, যে শক্তি নিজের আশাকে পূর্ণ করার জন্য শাস্ত্রের বা অস্ত্রের বা কোনো কিছুর বাধা মানতে রাজী নয়। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

> "যে অটলশক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোন মতেই হার মানিতে চাহিতেছে না, কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পবাইয়া দিল।"

রবীন্দ্রনাথের মতে মাইকেলের এই বিদ্রোহ ব্যক্তিগত খেয়ালের ফল নয়, তার বীজ ছিল তখনকার ভারতের পরিস্থিতির ভিতর। তাই তিনি বলেছেন :

> "য়ুরোপের শক্তি তাহার বিচিত্র প্রহরণ ও অপূর্ব ঐশ্বর্যে পার্থিব মহিমার চূড়ার উপর দাঁড়াইয়া আজ আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার বিদ্যুৎখচিত বজ্র আমাদের নতমস্তকের উপর দিয়া ঘন ঘন গর্জন করিতে করিতে চলিয়াছে ; এই শক্তির স্তবগানের সঙ্গে আধুনিক কালে রামায়ণকথার একটি নূতন বাঁধা তার ভিতরে ভিতরে সুর মিলাইয়া দিল, একি কোনো ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালে হইল ? দেশ জুড়িয়া ইহার আয়োজন চলিয়াছে, দুর্বলের অভিমান বশত ইহাকে আমরা স্বীকার

করিব না বলিয়াও পদে পদে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি—তাই রামায়ণের গান করিতে গিয়াও ইহার সুর আমরা ঠেকাইতে পারি নাই।"

জনসাধারণের নূতন গৌরব লাভের সাহিত্য সম্পর্কে "সাহিত্য সৃষ্টি" নামক প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে সেই সাহিত্যের নায়ক কালকেতু, ধনপতি, চাঁদসদাগর প্রভৃতি সাধারণ লোক। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় নয়, মানীজ্ঞানী সাধক নয়, সমাজে যারা নীচে পড়ে আছে, দেবতা যে সে তাদেরও দেবতা এই কথাই সেই সাহিত্যে নানাভাবে প্রচার করা হয়েছে। সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুগে যুগে জনসাধারণের বিদ্রোহের ডমরুধ্বনি কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আরো বিশদভাবে আলোচনা করেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে, দীনেশচন্দ্র সেনের উক্ত নামীয় পুস্তকের অলোচনা প্রসঙ্গে। দেশেব অতীত ইতিহাসকে জানার কাজে লোকসাহিত্যের যে কিছুটা দান আছে সে কথাও তিনি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন :

"েমন ভূস্তর পযাযে ভূমিকম্প অগ্নিউচ্ছ্বাস জলপ্লাবন তুষারসংহতি কালে কালে ভূমিগঠনের ইতিহাস নানা অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে এবং বৈজ্ঞানিক সেই লিপি উদ্‌ঘাটন কবিযা বিচিত্র সৃজন শক্তির রহস্যলীলা বিস্ময়ের ᠁ত পাঠ করেন, তেমনি যে সকল প্রলযশক্তি ও সৃজনশক্তি অদৃশ্য ভাবে সমাজকে পরিণতি দান কবিযা আসিযাছে সাহিত্যের স্তরে স্তরে তাহাদেব ইতিবৃত্ত আপনি মুদ্রিত হইয়া যায। সেই নিগূঢ় ইতিহাসটি উদ্‌ঘাটন করিলে প্রকৃত ভাবে সজীবভাবে আমাদের দেশকে আমরা জানিতে পারি।"

লোকসাহিত্যে ইতিহাসের উপাদান খোঁজাই সব নয়। কোন্ দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করতে হবে সেই প্রশ্ন বড হযে ওঠে। লোকসাহিত্যে বিভিন্ন দেবদেবীর ভিতর প্রাধান্যের সংগ্রামের যে চিত্র পাওয়া যায় অনেকে তাকে আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির দ্বন্দ্বের প্রতিচ্ছবি বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু সেটি আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র। লোকসংস্কৃতিতে যে আর্য ও অনার্য ধারার বহুদিন ধরে দ্বন্দ্ব এবং পরে সংমিশ্রণ ঘটেছিল সে কথাও ববীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন। কিভাবে শিব ক্রমশ আর্য দেবমণ্ডলীতে স্থান লাভ ও পরে শ্রেষ্ঠত্বের আসন অধিকার করেন সে সম্বন্ধে অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তার দিকে রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ঐ একই "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে।

"কখনো সাংখ্যের ভাবে, কখনো বেদান্তের ভাবে, কখনো মিশ্রিত ভাবে এই শিবশক্তি, কখনো বা জড়িত হইয়া, কখনো বা স্বতন্ত্র হইয়া, ভারতবর্ষে আবর্তিত হইতেছিলেন। এই রূপান্তরের কাল নির্ণয় দুরূহ। ইহার বীজ কখন ছড়ানো হইয়াছিল এবং কোন বীজ কখন অঙ্কুরিত হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহা সন্ধান করিতে হইবে। ইহা নিঃসন্দেহ যে, এই সকল পরিবর্তনের মধ্যে সামাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ক্রিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।"

শিব যখন মহেশ্বরের আসনে অভিষিক্ত হলেন কালিকা তখন অনেক পিছনে পড়ে ছিলেন। ক্রমে কালিকা মহাদেবীপদে অধিষ্ঠিত হলেন কিন্তু বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ "কুমারসম্ভব" ও "কাদম্বরী" কাব্যে যে সমাজচিত্র পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে মত প্রকাশ করেছেন যে এক সময়ে এই দেবীপূজা যে ভদ্রসমাজের বহির্ভূত ছিল তা বেশ বোঝা যায়। "কাদম্বরী"র কবি যেরূপ ঘৃণার সঙ্গে অনার্য শাবরের পূজাপদ্ধতির বর্ণনা দিয়েছেন তাতে বোঝা যায় যে পশুরক্তের দ্বারা দেবতার্চনা এবং পশু বলিদান তখন ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে নিন্দিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে সেই ভদ্রমণ্ডলী পরাজিত হলেন কারণ সেদিনের সামাজিক মহোৎপাতের দিনে নীচের জিনিস উপরে এবং উপরের জিনিস নীচে বিক্ষিপ্ত হচ্ছিল।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ শুধু ঐটুকুতেই ক্ষান্ত হয় নি। লোকসমাজে দেবীরূপিনী শক্তির পূজার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে তিনি দেখেছেন সমাজের নীচের তলার দরিদ্র উপেক্ষিত জনসাধারণের বিদ্রোহের ঘোষণা। বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলির ব্যাখ্যা তিনি এই ভাবেই করেছেন। সেখানে যে ধর্মকলহ ব্যাপারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাতে বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের দেবতা শিবের বড় দুর্গতি। তাঁর প্রাধান্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন নতুন "মেয়ে দেবতা"। রবীন্দ্রনাথ বলেন যে এই ধর্মকলহ স্পষ্টতই বিশিষ্ট দলের সঙ্গে ইতর সাধারণের কলহ; "উপেক্ষিত সাধারণ যেন তাহাদের প্রচণ্ডশক্তি মাতৃদেবতার আশ্রয় লইয়া ভদ্র সমাজের শান্ত সমাহিত নিশ্চেষ্ট বৈদান্তিক যোগীশ্বরকে উপেক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিল।"

শক্তির উপাসনা হিন্দু সমাজে প্রবর্তনের প্রক্রিয়াটিই তাঁর মতে জনসাধারণের বিদ্রোহী মনোভাবের ঘোষণা। আর্য-অনার্য যখন মেশে নি তখনও ঝড় উঠেছিল আবার ভদ্র-অভদ্রমণ্ডলীতে জ্ঞানী-অজ্ঞানীতে ভেদ যখন অত্যধিক হয়েছিল তখনও আর একবার ঝড় উঠেছিল। লোকসংস্কৃতিতে

এই উভয় ঝড়েরই স্বাক্ষর পাওয়া যায়। জ্ঞানীর দেবতা অজ্ঞানীদের আনন্দ দান করে না, জ্ঞানীরাও অজ্ঞানীদের অবজ্ঞাভরে আপন অধিকার থেকে দূরে রাখতেন। "শংকরাচার্যের ছাত্রগণ যখন বিদ্যাকেই প্রধান করিয়া তুলিয়া জগৎকে মিথ্যা ও কর্মকে বন্ধন বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছিলেন তখন সাধারণে মায়াকেই, শান্ত স্বরূপের শক্তিকেই, মহামায়া বলিয়া শক্তীশ্বরের ঊর্ধ্বে দাঁড করাইবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। মায়াকে মায়াধিপতির চেয়ে বড়ো বলিয়া ঘোষণা করা এই এক বিদ্রোহ।" ভারতবর্ষে এই বিদ্রোহের সূচনা কবে হয়েছিল বলা যায় না, কিন্তু তা ক্রমে সর্বসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করে। বিদ্রোহের সময় শক্তিকে প্রচণ্ডরূপে প্রকাশ করতে গেলে প্রথমে তার ভীষণতাকে ফুটিয়ে তোলাই স্বাভাবিক। সে শক্তি যখন ভয় থেকে রক্ষা করে তখন মাতৃরূপীনী এবং যখন ভয় জন্মায় তখন তা চণ্ডী। তাঁর ইচ্ছা কোনো বিধি বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, তা বাধাবিহীন লীলা। শক্তি-উপাসনার ব্যাখ্যার পর রবীন্দ্রনাথ মঙ্গলকাব্যগুলির নায়কদের চরিত্র সম্বন্ধে যা বলেছেন তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

> "তাহার পর দেখি, যাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া দেবী পূজা প্রচার করিতে উদ্যত তাহারা উচ্চশ্রেণীর লোক নহে। যে নীচের তাহাকেই উপরে উঠাইবেন ইহাতেই দেবীর শক্তির পরিচয়। নিম্নশ্রেণীর পক্ষে এমন সান্ত্বনা, এমন বলের কথা আর কী আছে! যে দরিদ্র দুইবেলা আহার জোটাইতে পারে না সেই শক্তির লীলায় সোনার ঘড়া পাইল; যে ব্যাধ নীচজাতীয়, ভদ্রজনের অবজ্ঞাভাজন, সেই মহত্ব লাভ করিয়া কলিঙ্গরাজের কন্যাকে বিবাহ করিল। ইহাই শক্তির লীলা।"

ব্যাধের মাধ্যমে চণ্ডীপূজার মাহাত্ম্যপ্রচারের অপর একটি ব্যাখ্যার কথাও রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ এই কাহিনী শবর নামক ক্রূরকর্মা ব্যাধজাতির পূজাপদ্ধতি কিভাবে কালক্রমে উচ্চসমাজে প্রবেশ লাভ করেছে তারই পরিচয় দেয়। কিন্তু তিনি ঐ ব্যাখ্যাতেই সীমিত না থেকে উক্ত কাহিনী ও অনুরূপ কাহিনীর মাধ্যমে নিম্নশ্রেণীর বিদ্রোহের অভিব্যক্তির কথাও বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন এই জিনিসটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়।

মঙ্গলকাব্যে শক্তির মাহাত্ম্য বর্ণিত হলেও সে শক্তি হল ভীষণ ও স্বেচ্ছাচারী। পরবর্তী যুগে সেই শক্তি-উপাসনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে জনসাধারণের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের বন্যা আসে এবং শক্তির নিকট মাথা নত

করার বদলে প্রেমধর্মের সাহায্যে জনসাধারণ আর এক নতুন ও মহত্ত্বের গৌরব লাভ করে। এই ঘটনার কারণ রবীন্দ্রনাথ অনুসন্ধান করেছেন এবং তার নিম্নোক্ত সামাজিক ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেই যুগে নীচের লোকের আকস্মিক অভ্যুত্থান এবং উপরের লোকের হঠাৎ পতন সর্বদা দেখা যেত। হীন অবস্থার লোক কোথা থেকে শক্তি সংগ্রহ করে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করত আবার প্রতাপশালী রাজারা অকস্মাৎ পরাজিত ও লাঞ্ছিত হত। তখনকার নবাব বাদশাহদের ক্ষমতাও ছিল ঈশ্বরের বিধানের অতীত। তাঁদের মরজি মাফিক সবই হতে পারত। তাঁরা সদয় হলে নীচ মহৎ হত আবার যে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী তাকে পথের ভিক্ষুক হতে হত। মঙ্গলকাব্যে যে শক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে তা এই পরিস্থিতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

> "এই সকল কারণে যে সময় বাদশাহ ও নবাবের অপ্রতিহত ইচ্ছা জনসাধারণকে ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া রাখিযাছিল এবং ন্যায়-অন্যায় সম্ভব-অসম্ভবের ভেদচিহ্নকে ক্ষীণ করিযা আনিয়াছিল, হর্ষ-শোক বিপদ-সম্পদের অতীত শান্ত সমাহিত বৈদান্তিক শিব সে সময়কার সাধারণের দেবতা হইতে পারেন না। রাগ-দ্বেষ প্রসাদ-অপ্রসাদের লীলা-চঞ্চলা যদৃচ্ছাচারিণী শক্তিই তখনকার কালের দেবত্বের চরমাদর্শ। সেই জন্যই তখনকার লোকে ঈশ্বরকে অপমান করিয়া বলিত: দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।"

সেই শক্তি ভয়ঙ্করী হলেও প্রথমটা মানুষের মনকে আকর্ষণ করে। কারণ তার কাছে প্রত্যাশার সীমা নেই। তিনি যতক্ষণ কাউকে প্রশ্রয় দেন ততক্ষণ সাতখুন মাপ। কিন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা মানুষের চিত্তকে ভুলাতে পারেন না।

> কারণ, "সে শক্তি ভীষণ, যাহা খেয়ালের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা আমাদিগকে দূরে রাখিয়া স্তব্ধ করিয়া দেয়; সে আমার সমস্ত দাবি করে, তাহার উপর আমার কোনো দাবি নাই। শক্তি পূজায় নীচকে উচ্চে তুলিতে পারে কিন্তু উচ্চ নীচের ব্যবধান সমানই রাখিয়া দেয়, সক্ষম অক্ষমের প্রভেদকে দূর করে।"

তাই সমসামযিক সমাজে নানা বিভীষিকাগ্রস্ত ও পরিবর্তন-ব্যাকুল দুর্গতির দিনে মানুষ প্রথমে সেই ভয়ঙ্করী শক্তির ক্ষমতার প্রচণ্ডতায় আভিভূর্ত হলেও তা চিরাদন মানুষের মনকে পরিতৃপ্ত করে রাখতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের মতে

মানবমনের সেই প্রতিক্রিয়ার ফলে ক্রমশ বাংলার লোকসাহিত্যে অত্যুগ্র চণ্ডীমাতা অন্নপূর্ণা, ভিখারী শিবের গৃহলক্ষ্মীও বিচ্ছেদবিধুর পিতামাতার কন্যা এই ত্রিবিধ মঙ্গল সুন্দর রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। শক্তির এই মঙ্গলমধুর ভাবের অবতারণা কিছু পরিমাণে দেখা যায় কবিকঙ্কন চণ্ডীতে ও অন্নদামঙ্গলে। কিন্তু এই ভাব আত্মপ্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের স্থান নিতে শুরু করে গীতিকবিতা। কারণ মাধুর্যের ভাব হল গীতিকবিতার সম্পত্তি। চণ্ডীপূজা ভক্তিরসে স্নিগ্ধ ও মধুর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলকাব্য ত্যাগ করে খণ্ড খণ্ড গীতে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। সেই সব জিনিস বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে বিজয়া-আগমনীর গীত এবং গ্রাম্য খণ্ডকবিতায় ছড়িয়ে আছে। বৈষ্ণবপদাবলী সংগ্রহের মতো সেগুলি সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি রবীন্দ্রনাথ "গ্রাম্য-সাহিত্য" প্রবন্ধে বিশেষ জোর দিয়েছেন।

শক্তি উপাসনার প্রতিক্রিয়ারূপে দেবতার সঙ্গে ভক্তি ও মাধুর্যের সম্বন্ধের যে ধারণা জনচিত্তে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করে তার পূর্ণ বিকাশ হয় বৈষ্ণবের প্রেমধর্মে। বৈষ্ণবধর্ম তখনকার সমাজে মানুষের চেতনায় যে যুগান্তরের সূচনা করে, প্রেমের গৌরবে সমস্ত মানুষের সমান মর্যাদার বাণী ঘোষণা করে এবং মানুষকে দেবতার উপ'র স্থান দেয়—সেই প্রক্রিয়াটিকে রবীন্দ্রনাথ নিম্নরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

> "বৈষ্ণব ধর্ম এক ভাবের উচ্ছ্বাসে সাময়িক অবস্থাকে লঙ্ঘন করিয় তাহাকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। সাময়িক অবস্থার বন্ধন হইতে এক বৃহৎ আনন্দের মধ্যে সকলকে নিষ্কৃতিদান করিয়াছিল। শক্তি যখন সকলকে পেষণ করিতেছিল, উচ্চ যখন নীচকে দলন করিতেছিল তখনই সে প্রেমের কথা বলিয়াছিল। তখনই সে ভগবানকে তাঁহার রাজসিংহাসন হইতে আপনাদের খেলাঘরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিল, এমনকি প্রেমের স্পর্ধায় ভগবানের ঐশ্বর্যকে উপহাস করিয়াছিল। ইহাতে করিয়া যে ব্যক্তি তৃণাদপি নীচ সেও গৌরব লাভ করিল; যে ভিক্ষার ঝুলি লইয়াছে সেও সম্মান পাইল; যে ম্লেচ্ছাচারী সেও পবিত্র হইল। তখন সাধারণের হৃদয় রাজার পীড়ন ও সমাজের শাসনের উপরে উঠিয়া গেল। বাহ্য অবস্থা সমানই রহিল, কিন্তু মন সেই অবস্থার দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া নিখিলজগৎসভার মধ্যে স্থান লাভ করিল। প্রেমের অধিকারে, সৌন্দর্যের অধিকারে, ভগবানের অধিকারে, কাহারও কোনো বাধা রহিল না।"

কবিগুরু ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে এমনি ধরনের মানুষের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বৈষ্ণবধর্মের এই মানবিক আবেদনের দরুণই তা জনচিত্তকে জয় করতে সমর্থ হয় এবং সমাজে এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করে। বাংলার লোকসাহিত্য তথা বাংলা সাহিত্য সেই প্লাবনে যেন নতুন ও মহত্তর জন্ম লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের কথায় .

"এই প্রেমের শক্তিতে বলীয়সী হইয়া আনন্দ ও ভাবের এক অপূর্ব স্বাধীনতা বাংলাসাহিত্যকে এমন এক জায়গায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে যাহা পূর্বাপরের তুলনা করিয়া দেখিলে হঠাৎ খাপছাড়া বলিযা বোধ হয়। তাহার ভাষা, ছন্দ, ভাব, তুলনা, উপমা ও আবেগের প্রবলতা, সমস্ত বিচিত্র ও নূতন। তাহার পূর্ববর্তী বঙ্গভাষা বঙ্গসাহিত্যের সমস্ত দীনতা কেমন করিয়া এক মুহূর্তে দূর হইল, অলংকারশাস্ত্রেব পাষাণবন্ধন সকল কেমন করিয়া এক মুহূর্তে বিদীর্ণ হইল, ভাষা এত শক্তি পাইল কোথায়, ছন্দ এত সংগীত কোথা হইতে আহরণ করিল? বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে নহে, প্রবীণ সমালোচকের অনুশাসনে নহে—দেশ আপনার বীণায় আপনি সুব বাঁধিয়া আপনার গান ধবিল। প্রকাশ কবিবাব আনন্দ এত, আবেগ এত যে, তখনকাব উন্নত মার্জিত কালোয়াতি সংগীত থই পাইল না, দেখিতে দেখিতে দশে মিলিয়া এক অপূর্ব সংগীত প্রণালী তৈরি করিল, আর কোনো সংগীতের সহিত তাহার সাদৃশ্য পাওয়া শক্ত। মুক্তি কেবল জ্ঞানীর নহে, ভগবান কেবল শাস্ত্রের নহেন, এই মন্ত্র যেমন উচ্চারিত হইল অমনি দেশের যত পাখি সুপ্ত হইযা ছিল সকলেই এক নিমেষে জাগরিত হইয়া গান ধরিল।"

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে বাংলা দেশ নিজেকে যথার্থভাবে অনুভব করে বৈষ্ণব যুগে। সেই সময়ে সে এক অলোকসামান্য গৌরব লাভ করে যা এই দেশ থেকে অন্যত্র বিস্তারিত হয়। তাঁর বিশ্লেষণ থেকে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় যে এই গৌরবের উৎস ছিল জনমানসে নবচেতনার উন্মেষ।

লোকমানসের সৃষ্টিপ্রবাহ যে স্তব্ধ হয়ে যায় নি, শিক্ষিত ভদ্রসমাজের উপেক্ষা সত্ত্বেও ফল্গুধারার মতো বয়ে চলেছে, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে তো সদা সচেতন ছিলেনই, শিক্ষিত সমাজকেও বারবার সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তিনি লিখেছিলেন, "সাহিত্যের

ঐকতান সঙ্গীত-সভায়, একতারা যাহাদের তারাও স্থান যেন পায়।" তাঁর এই আবেদনে লোকসৃষ্টির প্রতি অনুকম্পা নয়, শ্রদ্ধাই প্রকাশ পেয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়া থেকে ফিরে আসার পর শ্রীনিকেতনে বাৎসরিক উৎসবে সমবেত গ্রামবাসীদের কাছে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন :

"আমাদের কলেজে যারা ইকনমিক্‌স্ এথনোলজি পড়ে তারা অপেক্ষা করে থাকে য়ুরোপীয় পণ্ডিতের, পাশের গ্রামের লোকের আচারবিচার বিধিব্যবস্থা জানার জন্য। ওরা ছোটোলোক, আমাদের মনে মানুষের প্রতি যেটুকু দরদ আছে তাতে করে ওরা আমাদের কাছে দৃশ্যমান নয়। পশ্চিম-মহাদেশের নানাপ্রকার 'মুভমেণ্ট'র পূর্বাপর ইতিহাস এঁরা পড়েছেন—আমাদের জনসাধারণের মধ্যেও নানা মুভমেণ্ট চলে আসছে, কিন্তু সে আমাদেব শিক্ষিত-সাধারণের অগোচরে। জানবার জন্যে কোনো ঔৎসুক্য নেই, কেননা তাতে পরীক্ষাপাশের মার্কা মেলে না। দেশের সাধারণের মধ্যে আউলবাউল কত সম্প্রদায় আছে, সেটা একেবারে অবজ্ঞার বিষয় নয়, ভদ্রসমাজের মধ্যে নূতন নূতন ধর্মপ্রচেষ্টার চেয়ে তার মধ্যে অনেক বিষয়ে গভীরতা আছে ; সে সব সম্প্রদায়ের যে সাহিত্য তাও শ্রদ্ধা করে রক্ষা করবার যোগ্য—কিন্তু ওরা ছোটোলোক।"

সমাজ ও ইতিহাসেব প্রাণশক্তি যে জনসাধারণ, তাদের সৃষ্টিক্ষমতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের শুধু অনুরাগ নয়, গভীর শ্রদ্ধা ছিল বলেই তিনি 'ঐকতান' কবিতায় লিখেছিলেন :

"কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।"

তাই তিনি আগ্রহভরা কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন :

"এসো কবি, অখ্যাতজনের
নির্বাক মনের ,
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার।"

কথাগুলি তাঁর জীবনসায়াহ্নে বলা হলেও মোটেই আকস্মিক নয়, তাঁর সমগ্র-জীবনের মানবতাবাদী সুরেরই পরিণতি।

ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ও সামগ্রিক বিচারে তাঁর প্রত্যেকটি ব্যাখ্যাই অভ্রান্ত বা পূর্ণাঙ্গ বিবেচিত নাও হতে পারে। এ কথাও ঠিক যে মার্কসবাদী বিশ্লেষণে অনেক ব্যাখ্যাকে অসম্পূর্ণ মনে হবে। মার্কসবাদীরা যুগে যুগে সামাজিক অন্যায় অবিচারের চরিত্র ও তার বিরুদ্ধে লোকসাধারণের সংগ্রামের প্রকৃতিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। যুগে যুগে লোক-সাহিত্যে শ্রেণীদ্বন্দ্বের যে শিল্পায়ত অভিব্যক্তি হয়েছে, মেহনতী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামী সংকল্পের যে প্রাণস্পন্দন ধ্বনিত হয়েছে তাকে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলতে চান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কৃতী-আলোচনাব সময় মার্কসবাদীদের কাছে তাঁর অসম্পূর্ণতাটাই বড কথা নয়। সবচেয়ে বড কথা হল যে তিনি বাংলার তথা ভারতের লোকসংস্কৃতিতে সমাজের নীচের তলার মানুষের সংগ্রামী ও বিদ্রোহী মনোভাবের অভিব্যক্তিগুলিকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছেন ও স্বীকৃতি দিয়েছেন। এইভাবে তিনি একটা বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ পথের দিগন্ত নিদেশ করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশিত পথ মার্কসীয় দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের লোকসংস্কৃতি অধ্যয়নের কাজে যথেষ্ট সহায়ক ও সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। মানবতাবাদী ও সত্যনিষ্ঠ দৃষ্টির সাহায্যে তিনি যে পথের সন্ধান পেয়েছিলেন তাকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টির সাহায্যে আলোকিত করে তোলার দায়িত্ব মার্কসবাদীদেরই পালন করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা

গোপাল হালদার

রবীন্দ্রনাথের প্রধান পরিচয় তিনি কবি, তিনি স্রষ্টা। সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশই তাঁর স্বধর্ম। জগৎ ও জীবনের বিশিষ্ট উপলব্ধিতেই সেই আত্ম-বিকাশের বিশিষ্টতা; এবং দেশ ও কালের আশ্রয়েই সেই অভিজ্ঞতার উদ্ভব। এই জীবন্ত পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো সত্যকার আত্মপ্রকাশই সম্ভব হয় না। অন্তত রবীন্দ্রনাথের সেরূপ ভূমিভ্রষ্ট আত্মপ্রকাশে বিশ্বাস ছিল না। যে পরিবার-পরিবেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাতে স্বাদেশিকতা ছিল তাঁর আজন্ম সংস্কার। আর, ইতিহাসের যে পর্বে তাঁর জীবন উদ্‌যাপিত তাতে মানুষের ভবিতব্য হয়ে উঠেছিল তাঁর সুগম্ভীর ধ্যানের বিষয়। এই জন্যেই কবি রবীন্দ্রনাথের এই পরিচয়ও মিথ্যা নয়—তিনি তাঁর স্বদেশের "গ্রেট সেন্টিনেল", মহাপ্রতিহার, তিনি আন্তর্জাতিক মৈত্রীচেতনার অগ্রদূত।

আলোচনার ধারা

ভারতীয় স্বাদেশিকতার প্রথম যুগ থেকে স্বাধীনতার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত দীর্ঘ জীবনে রবীন্দ্রনাথ সেই স্বাদেশিকতার ইতিহাসে অজস্র দান জুগিয়েছেন। সে দানও বহুবিধ—তা মহৎ ভাবনার, তা বাস্তব উদ্যোগ ও কর্মের এবং প্রাণময় সৃষ্টির। চিন্তা, কর্ম ও রসসৃষ্টি, এই তিন ক্ষেত্রের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আবার সেই দান বিচিত্র ও সহস্রমুখী। তার ফলে, সেই রবীন্দ্র-দীপ্তিতে চোখ ঝলসে যাওয়া স্বাভাবিক—জ্ঞানে, কর্মে, সৃষ্টিতে কে আর তার স্বদেশকে এমন মহীয়ান করেছে? এই স্বাভাবিক হৃদয়াবেগ সংযত করেই আমরা রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার মতাদর্শ বুঝতে চেষ্টা করতে চাই। সে উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হতে পারে যদি গোড়া থেকেই রবীন্দ্র-প্রতিভার দু-একটি প্রধান

বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ রাখি; এবং কোনো সুস্থির প্রণালীতে তাঁর স্বাদেশিকতার পরিচয় গ্রহণে অগ্রসর হই।

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের অঙ্গ, তাঁর দ্বারা বিশিষ্ট। সেই জীবনদর্শনের প্রধান কথা তার বিশিষ্ট প্রগতিবাদিতা; অর্থাৎ গতিবাদ (ডায়নামিজম্) ও সুষমাবাদ (হার্মনি)-মূলক এক ধরনের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ে বিশ্বাস। আরও অনেক সূত্র বা সূক্ষ্ম তত্ত্বও নির্দেশ করা যায়। কারণ, রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনকে এক কথায় মানবতা বা "মানুষের ধর্ম" বললেও মিথ্যা হবে না। আমাদেব পক্ষে যা প্রথম স্মরণীয় তা এই যে, রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন অখণ্ড জীবনদর্শন; তাঁর অখণ্ড দৃষ্টিরই তা ফল। জগৎ ও জীবনের কোনো সমস্যাকেই রবীন্দ্রনাথ খণ্ড করে দেখতেন না, সকল সমস্যাকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখাই ছিল তাঁর নিয়ম। এই অর্থেই স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ দ্রষ্টাও, শুধু বিবিধের সুরসিক দর্শক নন। এই সমগ্র দৃষ্টির জন্যই ভারতীয় স্বাদেশিকতাকে একান্ত করে দেখা ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, এবং আন্তর্জাতিকতাকে শূন্যাশ্রয়ী করে দেখাও ছিল তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তাঁর অখণ্ড দৃষ্টিতে স্বাদেশিকতা ও আন্তর্জাতিকতা—বৈচিত্র্য ও ঐক্য—একই মহৎ সত্যের পরস্পরাশ্রয়ী প্রকাশ। সেই সত্য মানবতা। পৃথিবীর বিচিত্র জাতির মধ্যে মানবতার ঐক্যই পরিব্যাপ্ত; আব প্রতি জাতির ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সেই বিশ্বমানবের প্রকাশ সুনিশ্চিত। এই অখণ্ড দৃষ্টিতে ও মানবতাব আদর্শে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় স্বাদেশিকতাকে স্বীকাব ও বিচার করেছেন—স্বাদেশিকতাব ধর্মসম্মত, যুক্তিসম্মত ও ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য-সম্মত বিকাশ ছিল তাঁর কামনা ও সাধনা। অবশ্য সেই বিকাশই রবীন্দ্রনাথের নিকট বিকাশ বলে গ্রাহ্য—যে বিকাশ প্রাণবান, যা সৃষ্টি। রবীন্দ্রপ্রতিভা সৃষ্টিধর্মী, তাই স্বাদেশিকতাব যে আবেগ ও উদ্দীপনা সৃষ্টিধর্মী প্রযাসে সংহত ও রূপায়িত হতে চাইত না, রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় তা যথার্থ বিকাশ নয, সুস্থ ও সার্থক দেশানুরাগও নয।

> "মানুষ আপন দেশকে আপনি সৃষ্টি করে।...আমাদের দেশের মানুষ দেশে জন্মাচ্ছে মাত্র, দেশকে সৃষ্টি করে তুলছে না, এই জন্য তাদের পরস্পর মিলনে কোনো উপলক্ষ নেই, দেশের অনিষ্টে তাদের প্রত্যেকের অনিষ্টবোধ জাগে না। দেশকে সৃষ্টি করার দ্বাবাই দেশকে লাভ করবার সাধনা আমাদের ধরিয়ে দিতে হবে।" (স্বরাজ সাধনা, আশ্বিন, ১৩৩২, "কালান্তর")

এই ছিল রবীন্দ্রনাথের দেশ-সেবার মূল ধারণা।

বলা বাহুল্য, স্বাদেশিকতাকে রবীন্দ্রনাথ শুধু দার্শনিক তত্ত্ব বা একটা রাজনীতিক কর্মকাণ্ড-রূপে দেখতেন না। রবীন্দ্রনাথের জীবনদৃষ্টিতে রাজনীতি জিনিসটা গৌণ, সমাজধর্ম জিনিসটাই মৌল; এবং সেই সমাজধর্মের জীবন মানবধর্মের সঙ্গে গাঁথা। এজন্যই নিছক রাজনীতিক কর্মকাণ্ডের "অবাস্তব ভূমিকায়" তাঁর আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু স্বাদেশিকতার সঙ্গে রাজনীতির সর্ববিধ যোগ অবান্তর নয়। ভারতীয় রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া নিয়ে রবীন্দ্রনাথও "মন্ত্রী-অভিষেকের" মতো প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। "সাধনা", "ভারতী", "বঙ্গদর্শন"-এ মাসের পর মাস সম্পাদকীয় বিচারও তাঁকে করতে হয়েছে। সে সূত্রেই তাঁর স্বাদেশিকতার আদর্শও বিকশিত হয়েছে। তাঁর রাজনৈতিক মত সংগ্রহ করতে হলে কী প্রণালীতে করা বিধেয়, তিনি নিজেই তা জীবনের শেষ দিকে (১৩৩৬, ইং ১৯২৯) নির্দেশ করেছেন। স্বাদেশিকতার আলোচনায়ও তা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য; কারণ, তাই যুক্তিসঙ্গত আলোচনা-প্রণালী।

"রচনাকালীন সময়ের সঙ্গে প্রয়োজনের সঙ্গে সেই সব লেখার যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।… আমার সম্বন্ধে জানা চাই যে রাষ্ট্রনীতির মতো ব্যাপারে কোনো বাঁধা মত একেবারে সম্পূর্ণ ভাবে কোনো এক সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয় নি, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে। সেই সমস্ত পরিবর্তন-পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা ঐক্যসূত্র আছে। সেইটির উদ্ধার করতে হলে রচনার কোন্ অংশ মুখ্য কোন্ অংশ গৌণ, কোন্টা তাৎসাময়িক, কোন্টা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান সেইটে বিচার করে দেখা চাই, বস্তুতঃ সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে গেলে পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব করে তবে তাকে পাই।" (রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত, "কালান্তর")

"রাষ্ট্রিক সমস্যা সম্বন্ধে আমি কী ভেবেছি", রবীন্দ্রনাথ নিজেই তা কুড়িয়ে এনে সংক্ষেপে সে প্রবন্ধে একসূত্রে বাঁধবার চেষ্টা করছেন। সে বিষয়ে সেই প্রবন্ধই তাই প্রামাণ্য। আর তা থেকেও স্পষ্ট, রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার আদর্শ বা উদ্দেশ্য শুধু রাজনৈতিক নয়। অন্ততপক্ষে তাঁর স্বাদেশিকতার স্বরূপ বুঝবার পক্ষে রাজনৈতিক লেখার মতোই তাৎপর্যপূর্ণ তাঁর শিক্ষা-বিষয়ক

আলোচনা ও প্রচেষ্টা, ভারতীয় সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টি, লোক-সাহিত্য, পল্লীসেবা ও সমবায়-নীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর গভীর অনুরাগ ও বাস্তব আয়োজন। একথাও স্মরণীয় রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁর দায়িত্ব পালনে কবি কখনো পশ্চাৎপদ হন নি—সে স্বদেশী যুগেই হোক, পাঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতিবাদেই হোক, কিংবা হিজলীর হত্যাকাণ্ডের নিন্দাতেই হোক। কিন্তু তাঁর স্বাদেশিকতার বিশিষ্ট পরিচয় তাঁর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দানে ও আলোচনায়। এজন্যই স্বদেশী গান, কাব্য ও গল্প প্রভৃতি মোটের উপর এখানে বিচার-আলোচনার মুখ্য বিষয় নয়, এখানে আলোচ্য তাঁর স্বাদেশিকতার মতাদর্শ, ভাবনা ও ধারণা। সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প সেই স্বাদেশিকতার বাণীরূপ—যেমন পল্লীসেবা তাঁর স্বাদেশিকতার কর্মরূপ ; সে হিসাবেই তা গণ্য। অবশ্য, স্বাদেশিকতার পরিচয় হিসাবেও সে সব সামান্য নয়।

স্বাদেশিকতার উত্তরাধিকার

রবীন্দ্রনাথ জন্মসূত্রে যে স্বাদেশিকতার উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন "জীবন-স্মৃতি"তে তার পরিচয় সুরক্ষিত। ('স্বাদেশিকতা', দ্রষ্টব্য "জীবনস্মৃতি") সপ্ততি বৎসরের জয়ন্তী উৎসবকালে ছাত্রদের সংবর্ধনার প্রতিভাষণেও তিনি তা সংক্ষেপে স্মরণ করেছেন এবং তাঁর রচনাবলীর "অবতরণিকা" রূপে সে প্রতিভাষণ স্থান লাভ করায় সকলেরই তা পুনঃপুনঃ স্মরণীয়। সাধারণভাবে ভারতীয় স্বাদেশিকতার ইতিহাসে সে পর্বটি ছিল হিন্দুমেলার পর্ব।

> "হিন্দুমেলার পরামর্শ আয়োজনে আমাদের বাড়ির সকলে তখন উৎসাহিত, তার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। এই মেলার গান ছিল মেজদাদার লেখা "জয় ভারতের জয়", গুণদাদার লেখা "লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে", বড়দাদার "মলিনমুখ চন্দ্রমা ভারত তোমারি"। জ্যোতিদাদা এক গুপ্তসভা স্থাপন করেছেন, একটি পোড়ো বাড়িতে তার অধিবেশন, ঋগ্‌বেদের পুঁথি, মড়ার হাড়ের খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত। সেখানে আমরা ভারত উদ্ধারের দীক্ষা পেলাম।" (রচনাবলী ১ম—পৃঃ ১৶০)

অবশ্য ওরূপ "ক্ষ্যাপামির তপ্ত হাওয়ায় উড়ে বেড়ানো" রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-

বিরুদ্ধ, কিন্তু স্বাধীনতাব প্রতি অনুরাগ তা নয়। স্বাদেশিকতার আকর্ষণ ঠাকুব-পরিবারে ছিল স্বাভাবিক। স্বদেশের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, স্বদেশীয় বেশভূষা চাল-চলনের প্রতি আকষণ, মাতৃভাষাব প্রতি অনুবাগ, এসব তাঁর পৈতৃক উত্তরাধিকাব। তেরো বৎসরের বালক ববীন্দ্রনাথ কবিরূপে স্বদেশী কবিতা নিয়ে প্রথম প্রকাশ্যে আবির্ভূত হন হিন্দুমেলায (ইং ১৮৭৫), দু বৎসর পরে "দিল্লী দববাব" সম্বন্ধীয স্বদেশী কবিতাও সেখানেই পাঠ কবেন (ইং ১৮৭৭)। এ-কালেব ভাষায বলা যায ববীন্দ্রনাথ জন্মাবধি "কমিটেড্" বা "স্বদেশীর কবি"।

ঠাকুব-পরিবাবে অবশ্য তখন সত্যেন্দ্রনাথকে আশ্রয কবে নূতন সামাজিক হাওযাও বইছিল। কিন্তু নূতনে পুবাতনে দ্বন্দ্ব দেখা দেয নি। হিন্দুমেলার স্বাদেশিকতায় দুই ই ছিল সম্মিলিত। এ মেলাব দু-একটি বৈশিষ্ট্য তাই স্মবণীয়। প্রথম কথা, হিন্দুমেলা নামটি থেকেই সহজবোধ্য—বাজনাবায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র প্রমুখ উদ্যোক্তাদেব নিকট "হিন্দু" ও "ন্যাশনাল" ছিল সমার্থক, আব "ভারতবর্ষীযত্ব" অর্থ "হিন্দুত্ব", দ্বিতীয লক্ষণীয হিন্দু মেলাব কর্মকাণ্ড। তা মূলতঃ গঠনমূলক, এবং মোটেই "বাজনৈতিক" নয়। ভাবতীয় জীবনেব সর্বাঙ্গীণ পবিচয ভাবতীয ধাবাব সংগঠনেব (মেলা) মধ্য দিযে দেশেব সম্মুখে উপস্থিত কবাই ছিল হিন্দু মেলাব প্রধান কাজ। স্বাদেশিকতাব এই দুই ঐতিহ্যই ববীন্দ্রনাথ তাব পবিবাব পবিবেশ থেকে লাভ কবেন। তাব জীবনেব অভিজ্ঞতায যে স্বাদেশিক মতাদর্শ ক্রমে গড়ে ওঠে পবিবর্তন পবম্পবার মধ্যে সেই উত্তবাধিকাব যে একেবাবে লক্ষ্য ন কবা যায তা নয—এই কথাটি স্মবণীয়।

স্বকীয় দৃষ্টির উন্মেষ

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "'সাধনা' পত্রিকায বাষ্ট্রীয বিষযে আমি আলোচনা শুরু কবি।" অর্থাৎ বাষ্ট্রীয় আলোচনা আবম্ভ হয ইং ১৮৯২-এব পব থেকে। তৎপূর্বে "ভাবতী"ব পৃষ্ঠাতে তরুণ রবীন্দ্রনাথ শ্লেষ ও বিদ্রূপেব যে বাজনৈতিক বাণবৃষ্টি কবেছিলেন (বাং ১২৮৯ ও ১২৯০) তা তিনি বিস্মরণীয ও বর্জনীয় বলেই মনে কবেন। তখনকাব "পোলিটিক্যাল অ্যাজিটেশনেব" অভাবাত্মক রাজনীতিব প্রতি তাঁব বিরূপতা সে সব লেখায প্রকাশিত হয়, কিন্তু সেই

বিরূপতাও অভাবাত্মক। পরেও তার রেশ না ছিল তা নয়, কিন্তু সে সকল তৎসাময়িক বলে অবজ্ঞেয়। তথাপি "ভারতী"র সে সময়কার একটি লেখায় ("হাতে কলমে", ভারতী, আশ্বিন ১২৯১) ভাবী রবীন্দ্রনাথের আভাস পাওয়া যায় যেমন—"স্বদেশের লোক স্বদেশের লোককে সাহায্য করবে, ইহাই স্বদেশ-হিতৈষিতার প্রকৃত চর্চা।"

আর দেশের কাজ সম্বন্ধে তাঁর কথা,"ছোট কাজই বাস্তবিক দুরূহ, আমাদের চারিদিকে আমার আশে-পাশে আমাদের গৃহের মধ্যে আমাদের কার্যক্ষেত্র।"

বিশ বৎসর পরেকার "স্বদেশী সমাজের" এটি পূর্বাভাস, "রবীন্দ্রজীবনী"-কারের একথা অযথার্থ নয়। তবে এ সময়ের রাজনৈতিক আলোচনা অপেক্ষাও সামাজিক আলোচনাতেই রবীন্দ্রনাথের মনীষা ও স্বকীয় জীবনদৃষ্টির উন্মেষেব পরিচয় বেশী লাভ করা যায় আর সেই সামাজিক আলোচনাতে তাঁর স্বকীয় স্বাদেশিকতারও বিশিষ্ট উন্মেষ লক্ষ্য করা সম্ভব। নূতন ও পুরাতনের যে দ্বন্দ্ব হিন্দুমেলার মধ্যে অপরিস্ফুট ছিল "য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি"তে দেখি (১২৯৮ বাং ; ১৮৯১ ইং) রবীন্দ্রনাথ তার সরস ও সুনিপুণ বিচারে বসেছেন। তাঁর মতে এ বিচার "প্রাচীন ও আধুনিক মনুষ্যত্বের, পূর্ব ও পশ্চিমের মনুষ্যত্বের" বিচার, আর সে বিচারের মাপকাঠি "সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস" ("নূতন ও পুরাতন," রচনাবলী ১১শ খণ্ড—পৃঃ ৪৮৩)। "জীবিত মনুষ্যের" স্বপক্ষেই এখানে তাঁর সিদ্ধান্ত :

> "সে ("জীবিত মনুষ্য") বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য এবং বিপরীতের মধ্যে সেতু স্থাপন করে সকল সত্যের মধ্যে আপনাকে বিস্তার করে; একদিকে নত না হয়ে চতুর্দিকে প্রসারিত হওয়াকেই আপনার প্রকৃত উন্নতি জ্ঞান করে।" (ঐ, পৃঃ ৪৮৪)

"ভারতী"র এই ত্রিশ বৎসরের রবীন্দ্রনাথ যে আপন জীবন-দর্শনের কেন্দ্রস্থলের সন্ধান পেয়েছেন, তাতে সন্দেহ করা চলে না। এই কেন্দ্র দুটি শব্দে-ধরা একটি অমৃতময় আইডিয়া "সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ব"।

"সাধনা"র পর্ব : পটভূমি

"সাধনা"র পৃষ্ঠায় এই সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের আদর্শ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রিক বিচারে অগ্রসর হন। "সাধনা"র যুগ (১২৯৮—১৩০২ বাং ; ইং ১৮৯২ ডিসেম্বর—

১৮৯৬ নবেম্বর) কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রথম মধ্যাহ্ন, পূর্ণতার প্রথম প্রহর। কবিতায়, ছোট-গল্পে, নানা বিষয়ক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তখন রাজৈশ্বর্যের অধিকারী—সাহিত্যস্রষ্টা হিসাবে জীবন-রসের, মানব-রসের রসিক; ভাবুক প্রবন্ধকার হিসাবে সাহিত্যরসের সন্ধানী; সমাজ-সত্যের জিজ্ঞাসু। "সাধনা"য় প্রকাশিত "শিক্ষার হের-ফের" (পৌষ ১২৯৯; ইং ১৮৯২ ?) থেকে তাঁর স্বদেশী চিন্তার সূত্রপাত—যদিও সে প্রবন্ধ রাষ্ট্রিক আলোচনা নয়। আর, ১৮৯৪-এর "এবার ফিরাও মোরে"তে (২৩শে ফাল্গুন, ১৩০০; ইং ১৮৯৪) তার পূর্ণোদ্বোধন—সে কবিতাও রাষ্ট্রিক কবিতা নয়। রবীন্দ্র-জীবন-দর্শনের মূল সত্যেই সে কবিতা প্রবুদ্ধ; স্বদেশের ও বিদেশের লাঞ্ছিত মানবতার স্বপক্ষে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের উদ্দেশ্যে এমন উন্মথিত হৃদয়ের উদার ঘোষণা রবীন্দ্রসাহিত্যেও সুলভ নয়। "সাধনা"র পর্বের প্রেক্ষাপটটি মনে রাখলে এ কবিতার তাৎপর্য ও এ-পর্বের রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী চিন্তার যথার্থ রূপ অনুভব করা যায়।

স্বাদেশিকতার আলোচনায় মনে রাখা দরকার ইং ১৮৯৩-৯৪ কালটায় আমাদের জাতীয় চেতনায় একটা পর্বান্তরের সূচনা হয়—এখানে তা বিশদ করার সুযোগ নেই, উল্লেখ করাই শুধু সম্ভব। ব্রিটিশ ধনিকতন্ত্র তখন সাম্রাজ্যবাদ-রূপে আপন ঔদ্ধত্যে আপনি প্রমত্ত। কংগ্রেসের ভিক্ষার রাজনীতি তার থেকে পেয়েছে ভিক্ষুকের প্রাপ্য অপমান ইং ১৮৯২-এর শাসন-বিষয়ক আইনে। সে সূত্রেই সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতির প্রথম বীজ উপ্ত হয়। ভিক্ষার অধিকার অপেক্ষা শিক্ষিত সাধারণের পক্ষে আত্মমর্যাদা ও আত্ম-প্রচেষ্টার দায়িত্বের কথা না ভেবে আর তখন উপায় নেই। বিশেষতঃ এ পরিস্থিতিতে উদ্যোগ-উদ্দীপনার দীপ্তচ্ছটা নিয়ে লোকমান্য টিলক দাঁড়ালেন পুণায়। সর্বজনীন গণপতি-উৎসব ও শিবাজী-উৎসবকে অবলম্বন করে মহারাষ্ট্রে জাগে হিন্দু স্বাজাত্যের চেতনা ও বিদ্রোহের গুপ্ত আয়োজন। অরবিন্দ নামেন "বি-জাতীয় জাতীয় কংগ্রেসের" বিরুদ্ধে ধনুঃশর নিয়ে। বঙ্কিমের মৃত্যু (এপ্রিল ১৮৯৪) উপলক্ষ্য করে তিনি "আনন্দমঠের" স্বাজাত্যকেই দেশের সম্মুখে স্থাপিত করেন, উদ্দেশ্য (রাজনারায়ণ বসুর ঐতিহ্যে ?) বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি স্থাপন। বিবেকানন্দের শিকাগো-সাফল্য (ইং ১৮৯৩) বাঙলায় হিন্দু-পুনরুত্থান ও হিন্দু-স্বাজাত্যের আলোড়ন সৃষ্টি করল। হিন্দু-পুনরুত্থান না হোক, এই হিন্দু-স্বাজাত্য যে কংগ্রেসী আবেদন

নিবেদনের রাজনীতির অপেক্ষা হিন্দু-মেলার স্বাদেশিকতার নিকটতর, তা অনুভব করা যায়। অচল অতীতের সঙ্গ ছাড়তে এই হিন্দু-স্বাজাত্য নারাজ, কিন্তু প্রচণ্ড তার প্রাণশক্তি। কংগ্রেসী উদার রাজনীতির বাগ্‌বিভূতি্‌ যে তাকে আটকাবে—এমন নৈতিক, আধ্যাত্মিক কেন, রাজনৈতিক জোরই বা তার কোথায়? নিষ্ক্রিয় বুদ্ধির মুক্তি থেকে সক্রিয় মুক্তির বুদ্ধির দিকে এইসব কারণ-পরম্পরায় ইং ১৮৯৪-এর সময়ে দেশের চোখ ফিরতে লাগল।

এই হল "সাধনা"র প্রকাশকালের পটভূমি। তাই "এবার ফিরাও মোরে" শুধু রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা নয়, সমগ্র দেশেরই বাণীরূপ। এ পর্বের জাতীয় প্রার্থনা "এবার ফিরাও মোরে।"

১৮৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দের এই ঘটনাস্রোত একটা বিশেষ দিকেই যে প্রবাহিত হয়েছিল তা প্রমাণিত হয়ে গেল দশ বৎসর পরে "স্বদেশীযুগে" (ইং ১৯০৪-৮)। ইং ১৮৯৩-৯৪ যেন দশ বৎসরের পরবর্তী সেই স্বদেশীযুগের আহ্বান। সেই দশ বৎসরের মধ্যে দেশে ও বিদেশে যে ঘটনাবলী ঘটে—যেমন, একদিকে টিলকের কারাদণ্ড, সাম্রাজ্যবাদের দমননীতি, কার্জনী আমলের শিক্ষা-সংকোচ ও ভাষা-বিচ্ছেদের চক্রান্ত, বঙ্গ-বিভাগেব ব্যবস্থা ইত্যাদি; অন্যদিকে শতাব্দীর শেষভাগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উদ্ধত মত্ততা, কৃষ্ণ-আফ্রিকায় তাব অত্যাচার, বুয়র যুদ্ধ, শেষে রুশ-জাপান যুদ্ধ, ইত্যাদি—তাতে সাম্রাজ্যবাদের উৎকট রূপ দেশেব মধ্যে আরো প্রত্যক্ষ হয়। ভাষা ও সাহিত্য অবলম্বন কবে জাতীয় সংস্কৃতি পুনর্গঠনের চেষ্টা বাঙলাদেশে দেখা দেয়; বঙ্কিম-বিবেকানন্দের হিন্দু-স্বাজাত্য-বোধ তাতে প্রবলতর হতে থাকে; নিবেদিতা-ওকাকুরার প্রেরণায় এশিয়ার ঐক্যবোধ উন্মেষিত হয়; আত্মশক্তিতেও দেশবাবাসীর আস্থা জন্মে। তাই বঙ্গ-বিভাগ যখন (ইং ১৯০৫) এল তখন যেন পূর্ব দশ বৎসরেব প্রস্তুতিই তাতে আত্মপ্রকাশ করল।

"সাধনা" ও স্বদেশীযুগ

রবীন্দ্রনাথের দিক থেকেও দেখি জীবনের অভিজ্ঞতায় এ দশ বৎসরে তাঁর সামাজিক-রাজনৈতিক মত-সমূহও গড়ে উঠছিল। সেই ইং ১৮৯৩-এর "ইংরেজ ও ভারতবাসী" ("রাজা ও প্রজার" প্রথম প্রবন্ধ) থেকে শুরু করে ইং ১৯০৪-এর (আগস্ট) "স্বদেশী-সমাজে" পৌছতে পৌছতে তার স্বাদেশিক মতবাদ

একটা বিশিষ্ট আকার লাভ করে ; "সাধনার" শেষে "ভারতী", "বঙ্গদর্শন" ও "ভাণ্ডারে" সেই ধারা বয়ে চলে। তাই এই সমগ্র কালটাকেই একসঙ্গে "সাধনার পর্ব" বলে গণ্য করা অসঙ্গত নয়।

"এবার ফিরাও মোরে"র কবি কর্মক্ষেত্রে অবতরণের জন্যও যখন আকুল তখন এল স্বদেশীর বান। রবীন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ালেন রাজনৈতিক যজ্ঞের পুরোভাগে। "এবার ফিরাও মোরে" যার প্রার্থনা তিনি হলেন রাখীবন্ধনের মিলন-সাধক রবীন্দ্রনাথ। আশ্রম বিদ্যালয়ের যিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনি হলেন জাতীয় শিক্ষার উদ্যোগী পরিচালক। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে স্বদেশীযুগের (ইং ১৯০৪-১৯০৬) সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল। তার আঘাতে-আঘাতেই ভাবুক রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার ধারণা পরিণত হবার অবকাশ পেল। তার নিষ্ফল উদ্দীপনার শূন্যতায় সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা আত্মসংহত হবার প্রয়োজন অনুভব করল এবং আত্মসমাহিত হবারও আয়োজন করল। সেই অভিজ্ঞতার চিহ্ন "পথ ও পাথেয়" (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪) "ব্যাধি -ও প্রতিকার" (শ্রাবণ ১৩১৪), "পাবনা সম্মেলনের অভিভাষণ" (ফাল্গুন ১৩১৪), "সদুপায়" (শ্রাবণ, ১৩১৫) প্রভৃতি প্রবন্ধ। আর সেই স্বদেশী পর্বের পরে (ইং ১৯০৮ থেকে) তাঁর আত্ম-সমাহিতির পর্ব শুরু হয় "গোরা", "গীতাঞ্জলি" রূপক-নাট্যসমূহ দিয়ে। "সাধনা"র পর্বের রবীন্দ্রনাথেরই কর্মক্ষেত্রে প্রকাশ স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথে। এজন্য এই পনরো বৎসরের (ইং ১৮৯৩-৪ থেকে ১৯০৮) রবীন্দ্র-জীবনকে এক সঙ্গে আলোচনা করাও অসঙ্গত নয়। এই পনরো বৎসরের চিন্তা "আত্মশক্তি," "রাজা ও প্রজা", "ভারতবর্ষ", "সমাজ", "সমূহ" প্রভৃতি গ্রন্থে একসঙ্গেই সংগৃহীত হয়ে আছে। তাতে "সাধনা" ও স্বদেশী-যুগের রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার সাধনার একটা ক্রমপরিস্ফুট রূপ, একটা সামগ্রিক ঐক্য প্রত্যক্ষ করা যায় ; আর তা প্রত্যক্ষ করলে পরবর্তী যুগের রবীন্দ্র-সাধনা আর অপ্রত্যাশিত মনে হয় না।

স্বাদেশিকতার সাধনা

"সাধনা"র পর্বে রবীন্দ্রনাথ ছোটবড় নানা সাময়িক সমস্যার আলোচনা করেন। অবশ্য যা তাৎসাময়িক তা গণনীয় নয়। যেমন, সে সময়ের একটা

বিশেষ সমস্যা ছিল ভারতবাসীর প্রতি ইংরেজের অপমান ও অত্যাচার, আর সে ব্যাপারে ইংরেজ শাসকবর্গের অকুণ্ঠিত অবিচার। "বঙ্গদর্শনের" "ঘুষা-ঘুষি" (১৩১০ বাং) কেন, "মেঘ রৌদ্রে"র মতো বড় গল্পের মধ্যেও সেই সমস্যার সুস্পষ্ট ছায়া দেখা যায়। "ইংরেজ ও ভারতবাসী"র ("সাধনা" ১৩০০ বাং) এই বিরোধ-সম্পর্ক উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় মানদণ্ডে রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ-বিচারে প্রবৃত্ত হন। তাঁর বক্তব্য—প্রাচীন ভারতে রাজা ও প্রজায় একটা মানবীয় ও আন্তরিক সম্বন্ধ ছিল; প্রাচীন ও সামন্তযুগের সেই সম্বন্ধই স্বাভাবিক সম্পর্ক। কিন্তু ইংরেজ রাজ ভারতীয়ের সঙ্গে সেই আন্তরিক সম্বন্ধ চায় না; চায় বিজিতের বশ্যতা, আর লাভের অঙ্ক। এখানে ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথ বাস্তব দৃষ্টিতে যথার্থ নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু রাজা ও প্রজার সম্পর্ক-নির্ণয়ে ভারতবর্ষের আদর্শকেই তিনি ভারতীয় ইতিহাসে বাস্তব অবস্থা বলে ধরে নিয়েছেন। শাসক ও শাসিতের শ্রেণীগত দ্বন্দ্বের কথা তিনি তখনও (ইং ১৮৯৩) মানেন না—অবশ্য পরবর্তীকালের লেখায় সেরূপ দ্বন্দ্বের উল্লেখ বহু পাই। কিন্তু এই প্রবন্ধে যা আমাদের বুঝবার তা এই—সে আলোচনায় ('ইরেজ ও ভারতবাসী', "রাজা ও প্রজা") আসল বক্তব্য তিনটি কথা। অত্যাচার-অবিচারের প্রতিকারের উপায় আলোচনা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তা নির্দেশ করেছেন। সংক্ষিপ্ততম ভাষায় তা এরূপ দাঁড়ায়:

প্রথমত, আত্মমর্যাদাবোধের অনুশীলন : (পরজাতির নিকট থেকে) "সম্মান বঞ্চনা করিয়া লইব না, সম্মান আকর্ষণ করিব।" দ্বিতীয়ত, অসহযোগের নীতি অবলম্বন : "ইংরেজ হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের নিকট-কর্তব্য সকল পালনে একান্ত মনে নিযুক্ত হওয়া।" তৃতীয়ত, "আত্ম-নির্মাণ", "জাতি নির্মাণ" : "ইংরেজের নিকট হইতে আদর কুড়াইয়া কোনো লাভ নাই, আপন মনুষ্যত্বকে সচেতন করিয়া তোলাতেই যথেষ্ট গৌরব।"

এ আলোচনায় এরূপে তৎসাময়িককে ছাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার মূল কথাই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে—আত্মশক্তি, অসহযোগ, জাতি-নির্মাণ। অথচ এটি (ইং ১৮৯৩) "সাধনা"র প্রথম দিককারই আলোচনা এবং এবং রাষ্ট্রিক আলোচনাও। এই প্রথম পর্বেও তাঁর রাজনৈতিক চেতনা অস্পষ্ট ছিল না।

স্বদেশী-সংস্কৃতি

স্বাদেশিকতার পোলিটিক্যাল দিকটাই যে একমাত্র দিক নয়, হিন্দুমেলার পরে উদারনীতিকদের সভাসমিতি ও বক্তৃতায় সেই কথাটা প্রায় চাপা পড়ে যাচ্ছিল। "সাধনা"য় রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধিই স্বদেশী সংস্কৃতিকে স্বাদেশিকতার অপরিহার্য বনিয়াদ বলে বোঝাতেও চেষ্টা করেন। "শিক্ষার হের-ফের" (ইং ১৮৯২) থেকেই এই সাংস্কৃতিক স্বাদেশিকতা নির্মাণের আয়োজন লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের এই সাংস্কৃতিক স্বাদেশিকতার রূপ সূত্রাকারে গণনা করলে দাঁড়ায় এরূপ :

এক। স্বাদেশিকতার ভিত্তি স্বদেশ-পরিচয় এবং স্বদেশী শিক্ষানীতি। দেশের প্রতি মমতা দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে জন্মে না। অথচ, ইংরেজ প্রবর্তিত প্রচলিত শিক্ষায় দেশের প্রকৃতি ও দেশের মানুষ, কারও সঙ্গেই পরিচয়ের ব্যবস্থা নেই। শিক্ষাকে স্বাধীন ও জীবন্ত করার প্রয়োজন প্রথম থেকেই তাই রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেন। এ চেষ্টাই শান্তিনিকেতনে আরম্ভ হয় (বাং ১৩০০) ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় ও আশ্রম দিয়ে। আর এ দিকে যে আলোচনা তিনি নানা উপলক্ষে আরম্ভ করেন ("ভারতবর্ষের ইতিহাস", ১৩০৯ বাং, "য়ুনিভার্সিটি বিল" ১৩১১, "সফলতার সদুপায়" ১৩১১; "ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ" ১৩১১), তা স্বদেশী যুগের "জাতীয় শিক্ষা পরিষদ" ছাড়িয়ে ক্রমে ক্রমে "বিশ্বভারতীতে" গিয়ে রূপলাভ করে। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের একজন শিক্ষাগুরু।

দুই। স্বদেশের ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন এই স্বদেশ-পরিচয়েরই অঙ্গ। নিজের সৃষ্টিকর্ম ছাড়াও লোককথা ও লোকগীতি সংগ্রহ থেকে শব্দতত্ত্ব ও সাহিত্যচিন্তা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দান অজস্র। "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" প্রতিষ্ঠায় (১৩০১ বাং) তার অনুশীলন কেন্দ্র গড়ে ওঠে এবং পরিষদকে আশ্রয় করে রবীন্দ্রনাথ গবেষণা ও অনুশীলনের কর্মে যুবকদের আহ্বান করেন।

তিন। শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান এরও মধ্যে বিশিষ্ট একটি আয়োজন। "শিক্ষার হের-ফের" (ইং ১৮৯২) এখনো পর্যন্ত যুক্তিতে বিচারে অখণ্ডনীয় রচনা। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ধৈর্য ও প্রচেষ্টা কখনো হার মানে নি।

চার। দেশের রাজনৈতিক আলোচনায়ও দেশীয় ভাষা ত্যাগ করে ইংরেজী ভাষা ব্যবহারই ছিল তখন নিয়ম। এমন অবাস্তব কাণ্ড অবশ্য লোক-জীবন-বিচ্ছিন্ন অবাস্তব রাজনীতিতেই সম্ভব। কিন্তু তার অবাস্তবতাবোধ স্পষ্ট করে তোলেন রবীন্দ্রনাথ, এবং বাঙলা দেশের প্রাদেশিক সম্মেলনে বাঙলার প্রবর্তন প্রায় তাঁর একক কীর্তি। ইং ১৮৯৭-তে নাটোরের সম্মেলনে যে চেষ্টা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অসম্ভব হয়, পাবনায় ১৯০৮এ তাঁর বাঙলায় সভাপতির অভিভাষণ পাঠে তার স্বীকৃতি লাভ ঘটে।

পাঁচ। জীবনযাত্রায় স্বাদেশিকতা সাংস্কৃতিক স্বাদেশিকতার একটা রূপ। ভারতবাসীর মতো পরাধীন ও বহুজাতিক দেশে জীবনযাত্রা বিভিন্ন হতে বাধ্য; এবং প্রবল পাশ্চাত্ত্য প্রাধান্যে সাহেবিয়ানায় বা বিদেশিয়ানায় সব একাকার হওয়াও অসম্ভব নয়। বেশ-ভূষায়, চাল-চলনে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বাড়ির উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন। তার পরে, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের পুনরাবিষ্কারে সেই ভারতীয় জীবনযাত্রার শ্রী ও শোভনতার দিকটিও ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। এদিকে নিবেদিতা, হ্যাভেল, ওকাকুরা প্রমুখ নব্য ভারত-শিল্পের উদ্যোক্তারা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ব্যাপকতর প্রয়াসের সহকারী। দেশের শিল্পকলা যে দেশেরই নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিধৃত রবীন্দ্রনাথের শিল্পদৃষ্টি তা অনুভব করে ("দেশীয় রাজ্য", আত্মশক্তি ১৩৯২, রচনাবলী ৩য় খণ্ড—পৃঃ ৬৩২)। "রাখীবন্ধন" থেকে ঐতিহ্যসম্মত ও সৌন্দর্য-সমন্বিত স্বাদেশিকতার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। আজ তা আমাদের জীবনযাত্রায়, বিশেষত অনুষ্ঠানে-আয়োজনে সমাদৃত।

ভাবী দিনে কালের নিয়মে আমাদের এই জীবনযাত্রা নিশ্চয়ই পরিবর্তিত হবে; যা মূলহীন তা মূল্যহীন হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের আত্মোপলব্ধির ইতিহাসে তার প্রয়োজন ছিল; স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও অপরিস্ফুট সৌন্দর্যবোধকে তা একদিন পরিস্ফুট করেছে।

এভাবে গণনা করতে গিয়ে একটি কথা আরও পরিষ্কার হয়। রবীন্দ্রনাথ সমস্ত সমস্যাকে গোড়া থেকে দেখে তার মৌলিক উত্তর খুঁজতেন; যুক্তির অবতারণাও তিনি করতেন সমগ্র আদর্শের সঙ্গে উপস্থাপিত প্রসঙ্গটিকে মিলিয়ে। তাই এরূপ বিশ্লেষণে তার সম্পূর্ণ রূপ গোচর হয় না, এবং রবীন্দ্রনাথের ভাবনার ঐক্যকে বিচ্ছিন্ন করে ও যুক্তির ধারাবাহিকতাকে খণ্ডিত করে তাঁর বক্তব্য পরিবেশন করাও প্রায় অসম্ভব। তথাপি তাঁর স্বাদেশিকতার বৈশিষ্ট্য বুঝতে

হলে বিশিষ্ট করেই প্রধান দিকগুলোর ও প্রধান তত্ত্বসমূহের (আইডিয়া) উল্লেখ করতে হয়, এবং স্থানাভাবে অতি-সংক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন উক্তি উদ্ধৃত করা ছাড়া উপায় থাকে না।

এরূপে চিন্তায়, কর্মে ও সৃষ্টি প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ সাংস্কৃতিক স্বাদেশিকতার বনিয়াদ স্থাপন করেন। সেইরূপই তাঁর ভারতীয় স্বাদেশিকতার আশ্রয়স্থল ছিল কয়েকটি মূল তত্ত্ব যা ধর্ম-সম্মত, যুক্তি-সম্মত, ভারতীয় সাধনা-সম্মত। সংক্ষেপে সেই তত্ত্ব তিনটিকে বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের "ভারত-তত্ত্ব", "নেশন" তত্ত্ব, এবং তাঁর "স্বদেশী সমাজতত্ত্ব"। অবশ্য এ তিনটির কোনোটিকেই যে বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করা যায় না, তা আবার বলা প্রয়োজন।

ভারত-তত্ত্ব

হিন্দু-ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা রবীন্দ্রনাথের জন্মগত। সে হিন্দু-ভারত অবশ্য মুখ্যত উপনিষদের ভারত। "সাধনায়" রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম ও চন্দ্রনাথ বসুর রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে দাড়াতে দ্বিধা করেন নি। কিন্তু হিন্দু-সাধনা ও হিন্দু-সংস্কৃতির মর্মবাণীতে তিনিও আস্থাবান। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে তিনিও হিন্দুসমাজকে সমগ্রভাবে দেখতে উৎসুক। তাই এ সময়ে (ইং ১৮৯৮, ১৯০৫) হিন্দুযুগের প্রাচীন ভারত তাঁর দৃষ্টিতে এক মহিমায় অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের মৃত্যুহীন অতীত এসময়ে কথা কয়ে উঠল তাঁর "কথা"র কবিতায় (বাং ১৩০৬, ইং ১৮৯৯); "নৈবদ্যের" সনেটে (বাং ১৩০৭, ইং ১৯০০) ভারতবর্ষের সুগম্ভীর মহিমা বাণীরূপ লাভ করল। এই সুরেই রবীন্দ্র-নাথের এই সময়কার ভারতের ইতিহাস ও সমাজ-সম্বন্ধীয় আলোচনাসমূহও বাঁধা। বিশ্লেষণ করলে তাতে তাঁর কয়েকটি বিশিষ্ট ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। "ভারতবর্ষের ইতিহাসে" (বঙ্গদর্শন, বাং ১৩০৯, ইং ১৯০২) তাঁর ভারত-তত্ত্ব মূর্ত হয় :

"ভারতবর্ষে চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা," ইত্যাদি (রচনাবলী ৩য় খণ্ড—পৃঃ ৩৮১)। ভারতীয় স্বাদেশিকতাও তাই এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাধনা, এইটিই ভারতীয় ইতিহাসের মূলতত্ত্ব।

> "পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন ভারতবর্ষের মধ্যে সে প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই।" (ঐ পৃ ৩৮৪)।

এইটি ঐ মর্মেরই কথা, কিন্তু ১৯৪৭-এর পরে এ কথা অবিসম্বাদিত নয়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথও তাঁর সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন হন। কিন্তু এই আদর্শ যে ভারতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, তা নিঃসন্দেহ। রবীন্দ্রনাথেরও তাতে সন্দেহ ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ এ সময়ে ভারতীয় বর্ণাশ্রম ধর্মেরও সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন, এইটিও লক্ষণীয়।

> "ভারতবর্ষে কর্মবিভেদ শ্রেণীবিভেদ মুনিনির্দিষ্ট বলিয়াই উচ্চশ্রেণীরা নিজের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য নিম্নশ্রেণীকে লাঞ্ছিত করিয়া বহিষ্কৃত করে না" ইত্যাদি (রচনাবলী ৪র্থ—পৃঃ ৩৭৫)

এ মর্মের কথা অবশ্য চূড়ান্ত নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও পরে তাতে গুরুত্ব আরোপ করতেন না। তবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের প্রতি তুলনা সে সময়ে তিনি বারবার করেছেন। ঐক্যের 'সাধনা'র পর্বের এই ভেদমূলক ভাবনা তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। গুরুত্ব এই জন্য যে, তাঁর ভক্তির যুক্তি ও বিশ্বাসের দীপ্তি সেদিনের হিন্দু স্বাজাত্যবোধকে শক্তি জুগিয়েছে। যেমন এই "নববর্ষ"-র ঘোষণা—

> "জয় হইবে ভারতবর্ষেরই জয় হইবে! যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্বাক, তাহারই জয় হইবে, আমরা —যাহারা ইংরেজী বলিতেছি, আমরা "বর্ষে বর্ষে মিলি মিলি যাওব সাগরলহরী সমানা" (নববর্ষ ; ১৩০৯ বাং)।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ বিশ্বাস একেবারে পরিত্যাগও করেন নি। বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য-সাধন ভারতবর্ষের নির্দেশ, তা ভারতীয় স্বাদেশিকতার ব্রত ; এবং এই ব্রত উদ্‌যাপনও আপনার ধর্মপথেই ভারতকে করতে হবে ; বিশ্বমানবের ইতিহাসে তাই ভারতের সাধনা—তার বিশেষ বাণী। ভারতবর্ষের একটা "মিশন" আছে, তার একটি "মেসেজ" আছে—ঐরূপ ধারণা রবীন্দ্রনাথ শেষ অবধিও পোষণ করতেন। "সাধনা" পর্বেই কিন্তু তাঁর এই "ভারত-তত্ত্ব" দানা বেঁধে উঠেছিল, বিশেষ করে হিন্দু-ভারতকে অবলম্বন করে। এ জন্য য়ুরোপের সঙ্গে ভারতের ও প্রাচ্য চীনের ভাব ও সভ্যতাগত বৈষম্য-ব্যাখ্যায় তিনি তখন দ্বিধা করেন নি।

"নেশন" বনাম "সমাজ"

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রতিতুলনার প্রধান কারণ য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের নগ্নরূপ তখন প্রত্যক্ষ। রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধিই অনুভব করেন নেশনবাদই পরিণত হয় সাম্রাজ্যবাদে। অথচ ভারতবর্ষ তখন নেশন হতে চাইছে; না হতে পারাতেই ভারতবর্ষ ঐক্যহীন, ভারতবর্ষের দুর্দশা। কিন্তু আশ্চর্য এই রবীন্দ্রনাথের মনে নেশন-এর আদর্শ কোনো মোহ সঞ্চার করতে পারল না। রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার প্রধান গৌরব এই যে প্রথমাবধিই তা নেশনবাদের মোহমুক্ত। "নৈবেদ্যে"র (ইং ১৯০১) অবিস্মরণীয় সনেট দুটিতে এই নেশনবাদের রক্তপিপাসু রূপ তিনি এ সময়ে মূর্ত করে তোলেন:

"শতাব্দীর সূর্য আজ রক্ত মেঘ মাঝে / অস্ত যায়"—

বুয়র যুদ্ধ ও চীনে ঔপনিবেশিক পাশবতা এ সনেটটির উপলক্ষ। অন্যটি সাম্রাজ্যবাদী সংকটেরই চিত্র:

"স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত"……

কিন্তু নেশন দেশকে এক করে। নেশন না হয়ে ভারতবর্ষ তা হলে কী সূত্রে এক হবে? "নেশন কী" প্রবন্ধে রেনাঁর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ নেশন-এর পরিবর্তে ঐক্য-সংস্থাপক রূপে উপস্থাপিত করলেন ভারতীয় সমাজ,—'ভারতবর্ষীয় সমাজ', 'সমাজভেদ', 'বিরোধমূলক আদর্শ প্রভৃতি প্রবন্ধে তা বহুভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। তাই নেশনবাদের প্রবর্তিত "রাষ্ট্রধর্ম" ও "জাতিপ্রেমের" পরিবর্তে উপস্থাপিত করলেন ভারতের ধর্মের আদর্শ, ন্যায়ের আদর্শ। অবশ্য—

> "ধর্ম বলিতে রিলিজিয়ন নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র—তাহার মধ্যে যথাযোগ্যভাবে রিলিজিয়ন, পলিটিক্‌স সমস্তই আছে।" (সমাজভেদ, স্বদেশ, রচনাবলী ১১শ; পৃঃ ৪৮৫)।

অর্থাৎ, এ মানব-ধর্মেরই কথা। এই ধর্মই মানুষকে রক্ষা করে, মানুষও তাকে রক্ষা না করে পারে না। ভারতবর্ষের সমাজ এই ধর্মের দ্বারাই বিভিন্ন স্তরের মানুষকে চিরদিন একত্র ধরে রেখেছে, পালন করেছে,—রাজা-রাজ্য তা করে নি। নেশনবাদ কিন্তু এই ধর্মাধর্ম মানে না; রাষ্ট্রধর্মই নেশন-এর ধর্ম, জাতিস্বার্থই সত্য। "ন্যাশনালিজম" এর ইংরাজী বক্তৃতাবলীর (ইং ১৯১৬)

বহু পূর্বেই (ইং ১৯০১-এর সময়ে) এই অভিমতে রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়প্রত্যয় হন, তখন থেকেই তিনি নেশনবাদের বিরোধী।

অবশ্য নেশন বলতেই রবীন্দ্রনাথ ধরে নিয়েছেন শভিনিজম বা সংকীর্ণ জাত্যাভিমান এবং ইম্পিরিয়ালিজম্ বা স্বার্থান্ধ সাম্রাজ্যবাদ। ("এ অন্ধতা নেশন-তন্ত্রের মূলগত ব্যাধি"—"বিরোধমূলক আদর্শ", ১৩০৮ রচনাবলী ১০ম পৃঃ ৫৯২)। দ্বিতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথ নেশনকে মানব-সমাজের বিকাশের একটা বিশিষ্ট স্তর হিসাবে এ সময়ে মনে করতেন না, তিনি মনে করতেন—তা একমাত্র য়ুরোপীয় সমাজেরই একটা বিশিষ্ট রূপ। ধনিকতন্ত্রের সঙ্গেই নেশনের উদ্ভব, ধনিক-স্বার্থেই স্বার্থান্ধ জাতিপ্রেমে তার পরিণতি, এই সত্য রবীন্দ্রনাথের নিকট পরে অনেকটা প্রতিভাত হয়েছিল। "লোকহিত" (১৩২১ বাং) "লড়াইয়ের মূল" (১৩২১ বাং) প্রভৃতি ১৯১৪এর প্রথম যুদ্ধারম্ভের সময়কার প্রবন্ধাবলীতে দেখতে পাই তিনি শ্রেণী-বৈষম্য সম্বন্ধেও অবহিত। "ন্যাশনালিজম্" এর ইংরেজী বক্তৃতাসমূহ আরো দুই বৎসর পরে রচিত হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে বুঝবার কথা এই—রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার অর্থ ন্যাশনালিজম্ নয়, রাষ্ট্রধর্ম নয়; তার লক্ষ্য ভারতীয় সমাজের বিকাশ, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন। এইজন্য একদিকে প্রয়োজন যেমন ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির স্বরূপ-সন্ধান; অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় সমাজের নব-রূপায়ণ, ভারতীয় বৈচিত্র্যের মধ্যে জাতীয় ঐক্য-স্থাপন; এবং দেশপ্রেমের ভিত্তিতে বিশ্বপ্রেমের সাধনা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, রাষ্ট্রিক মতামত ও রাষ্ট্রিক কর্ম সে সাধনার অনুষঙ্গ মাত্র।

স্বদেশী-সমাজ

ভারত-তত্ত্ব ও নেশন-তত্ত্ব,—একটি আস্তিক্যধর্মী অন্যটি নাস্তিক্যধর্মী;—এই দুই তত্ত্বকে মনে রেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বাদেশিকতার আদর্শানুযায়ী সাধনপদ্ধতি স্থির করেন। তা 'স্বদেশী সমাজে'র (ইং ১৯০৪ 'আত্মশক্তি', রচনাবলী ৩য়, পৃঃ ৫২৬) বক্তৃতার মুখ্য বিষয়। স্বদেশী যুগের প্রাক্কালেই তাতে স্বাদেশিকতার আদর্শ ও মূলরূপ তিনি ব্যাখ্যা করেন।

প্রথমেই দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য স্বদেশী রাষ্ট্র নয়, স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনা। তাঁর মূল লক্ষ্য আত্মশক্তির উদ্বোধন ও রূপায়ণ; মূল উপায়

সৃষ্টিমূলক কর্ম ; সাধন-প্রণালী পল্লীসমাজের মাঝখানে সুদীর্ঘ তপস্যা, সেবার মধ্য দিয়ে দেশকে আপনার করা। সেজন্য আবশ্যক নানা স্থলে মেলার মতো স্বাভাবিক মিলন-আয়োজন ; আবশ্যক নূতন নূতন যাত্রা কীর্তন কথকতা রচনা বায়স্কোপ ম্যাজিকলণ্ঠনের যোগে ভাব-প্রচার ; পল্লীমণ্ডল গঠন এবং এই সমাজ-প্রয়াসকে কেন্দ্রিত ও রূপায়িত করবার জন্য চাই একজন সমাজপতি (তুলনীয়, 'দেশনায়ক') নির্বাচন করে তাঁর নেতৃত্বে চলা। মূল প্রেরণা অবশ্য ঐক্য-সাধনা :

"বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য-স্থাপন ইহাই ভারতবর্ষের আন্তরিক ধর্ম।...(পূর্ব ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানের) এই ঐক্যসাধন ভারতবর্ষীয় প্রতিভার প্রধান কাজ। ভারতবর্ষ কাহাকেও ত্যাগ করিবার, কাহাকেও দূর করিবার পক্ষে নহে—ভারতবর্ষ সকলকেই স্বীকার করিবার, গ্রহণ করিবার, বিরাট একের মধ্যে সকলকেই স্বঃ স্বঃ প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করিবার পন্থা এই বিবাদ-নিরত ব্যবধান-সঙ্কুল পৃথিবীর সম্মুখে একদিন নির্দিষ্ট করিয়া দিবে--" (রচনাবলী ৩য়, পৃঃ ৫৫০-৫৫১)

ভারতবর্ষের যা সাধনা ('মিশন') ও ভারতবর্ষের যা বাণী ('মেসেজ') তার অনুরূপ করেই স্বাদেশিকতার কর্মকাণ্ড ('প্রোগ্রাম') এ বক্তৃতায় (ইং ১৯০৪) সংক্ষেপে নির্দেশিত হয়েছিল। স্বদেশী যুগের উদ্দীপনাকেও (ইং ১৯০৫-০৬) রবীন্দ্রনাথ এই ধারায় রূপায়িত দেখতে আশা করেছিলেন। সে উদ্দীপনা যখন নিষ্ফল উত্তেজনায় শেষ হচ্ছে তখন পাবনায় প্রাদেশিক সম্মিলনীর "সভাপতির অভিভাষণে" ('সমূহ', রচনাবলী ১০ম, পৃঃ ৪৯৬-৫২২) তিনি স্বদেশী যুগ থেকে বিদায় নেবার পূর্বে স্বদেশী সমাজের এই কর্মকাণ্ড আরও বিস্তৃত করে ব্যাখ্যা করেন ;—দেশকে সংগঠন করবার জন্য পল্লীতে পল্লীতে পল্লীর মণ্ডলী গড়ে সেই ভিত্তিতে গড়ঁতে হবে দেশের এক প্রতিনিধি সভা ; আর প্রত্যেক পল্লীমণ্ডলী নিজের পাঠশালা, শিল্প শিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার, ব্যাঙ্ক স্থাপন ও সালিশীর দ্বারা গ্রামের মামলা মিটানো, সমবায়-নীতি ও মিতশ্রমিক যন্ত্রে চাষ ইত্যাদির ব্যবস্থা করবে। অভিভাষণের শেষাংশে একেবারে কার্যনীতিও রবীন্দ্রনাথ সম্মেলনে উপস্থাপিত করেন। যথা, প্রথম অর্গ্যানিজেশন, দ্বিতীয় শিক্ষিত শ্রেণী ও জনসমাজের ঐক্যবোধ ; তৃতীয় গণসমাজে কর্মের মধ্য দিয়ে প্রাণের যোগ সঞ্চারিত করা, ইত্যাদি।

"সাধনা"র ও স্বদেশী যুগের পনরো বৎসরের অভিজ্ঞতার সারকথা এই "স্বদেশী-সমাজ"। এ দেশে এই বোধহয় গঠনমূলক কার্যক্রম "পঞ্চায়েত রাজের"

প্রথম খসড়া, "রাষ্ট্রাধীন স্বরাজ" (স্টেট উইদিন স্টেট) গড়ার প্রথম পরিকল্পনা। মনে রাখতে হবে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগের ও গঠনমূলক কাজের ১৭ বৎসর পূর্বে এই কার্যক্রম রচিত। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশীসংস্কৃতি গঠনের প্রয়াস, ভারত-তত্ত্ব ও নেশন-তত্ত্বের ব্যাখ্যা, ঐক্যনির্মাণ ও জাতি নির্মাণের ভাবনা, প্রভৃতি কিছুই তাঁর স্বাদেশিক মতবাদের আলোচনায় তুচ্ছ বিষয় নয়। কিন্তু স্বদেশী সমাজের এই প্রস্তাব আগাগোড়া সম্মুখে না রাখলে রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার আলোচনা শুধু অসম্পূর্ণ নয়, বহুলাংশে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও স্বদেশী সমাজকেই তাঁর রাজনৈতিক মতের মূলকথা বলে স্বীকার করতেন, এইটিই তাঁর স্বাদেশিকতার প্রোগ্রাম, তাঁর সৃষ্টিধর্মী স্বাদেশিকতার প্রধান পরিচয়পত্র, আর স্বদেশী যুগের পূর্বেই তা প্রথম প্রণীত (ইং ১৯০৪)।

স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ

বুঝা যায় বঙ্গভঙ্গের পূর্বেই বাঙলাদেশ জাতীয় সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল; বঙ্গভঙ্গ তাতে স্ফুলিঙ্গ সঞ্চার করল। বাঙালীর জীবনে এমন অগ্নিময় মুহূর্ত এর পূর্বে আর আসে নি। যে রবীন্দ্রনাথ কর্মক্ষেত্রে নামবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন, তিনি দেখলেন বিরাট কর্মক্ষেত্রের দ্বার খুলে যাচ্ছে। স্বদেশীযুগের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন কী উদ্দীপনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন, আর তাঁর নিজের সৃষ্টিও সে আন্দোলনে কতটা উদ্দীপনা জোগায় (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর লেখা দ্রষ্টব্য, রচনাবলী ১০ম, পৃঃ ৬৬৪-৫)। অবশ্য তাঁরাও লক্ষ্য করবেন—এই স্বদেশী আন্দোলনেও রবীন্দ্রনাথের কর্মক্ষেত্র ছিল প্রধানত সাংস্কৃতিক, রাখীবন্ধনের মতো ঐক্যসাধনার দিক, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের মতো স্বাধীন-শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ। মূল জীবন-দর্শন ও সৃষ্টিধর্ম তখনো তিনি বিস্মৃত হন নি; কিন্তু "উত্তেজনার হাত থেকে আমিও নিষ্কৃতি পাইনি", এ তাঁর নিজের স্বীকৃতি। ("সফলতার সদুপায়", "ছাত্রগণের প্রতি সম্ভাষণ", "অবস্থা ও ব্যবস্থা" প্রভৃতি বহু প্রবন্ধ, বিশেষ করে তাঁর গান-কবিতাও এই উদ্দীপনার ফল)। কিন্তু মত্ততায় বা উত্তেজনায় স্বস্তি পাবার মতো প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের নয়। তিনি চাইছিলেন গঠনমূলক কাজ, সৃজনমূলক কাজে এই উদ্দীপনার সার্থকতা। ক্রমেই তা অসম্ভব হয়ে উঠল। তিনিও মাস তিনেকেই হাঁপিয়ে উঠলেন, বললেন—

"বিদায় দেহ ক্ষমো আমায় ভাই
কাজের পথে আমি তো আর নাই।"

('বিদায়', চৈত্র ১৩১২ বাং, ১৯০৬ এপ্রিল)

তথাপি জাতীয় শিক্ষাপরিষদের শিক্ষা-কর্মে ও সাহিত্য-শিক্ষায় তিনি প্রায় দু'বৎসর কাল (ইং ১৯০৭-১৯০৮) লেগে থাকেন। মনের বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করল পরে দুটি কারণে : এক বিলাতী দ্রব্য বয়কটের জবরদস্তিতে দেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল, অর্থাৎ যে জাতীয় ঐক্য বিনাশের জন্য বঙ্গভঙ্গের চক্রান্ত সেই ঐক্যই এই বয়কটের জবরদস্তিতে বিনষ্ট হতে চলল—রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তা অসহনীয়। দ্বিতীয় কারণ—মজঃফরপুরে কেনেডি হত্যার (৩১শে মার্চ, ১৯০৮) সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের আবির্ভাব—তাও রবীন্দ্রনাথের আদর্শ- বিরুদ্ধ,—ধর্মহীন, যুক্তিহীন, ভারতের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের বিরোধী।

হিন্দু-মুসলমান বিরোধের মূল সন্ধান করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ গোড়ার থেকে এখন নূতন করে ভাবলেন। তিনি দেখলেন স্বদেশ-উদ্ধারের পথে বাধা শুধু বাইরের নয়, বাধা নিজেরাই, আমাদের নিজেদের পাপ। দেশকে উদ্ধার করতে হবে কার হাত থেকে ? "নিজেদের পাপ হইতে" ("ব্যাধি ও প্রতিকার", শ্রাবণ ১৩১৪)। আর, সেই দেশোদ্ধারের সত্য পথ—"পল্লীর মাঝখানে যাও, জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আশা দাও, সেবা করো।" অকুণ্ঠিত চিত্তে এখন থেকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করলেন—ভেদ শুধু ইংরেজ সৃষ্টি করে নি, ভেদ আমাদের মধ্যে রয়েছে। এখন রাজনৈতিক উদ্বোধনে তা প্রকট হচ্ছে। এবার তিনি অনুভব করলেন—প্রাচীন ভারতীয় সমাজ বিচিত্রকে এক করলেও তার সেই ক্ষমতা পরবর্তীকালে অনেকাংশেই খুইয়ে ফেলেছিল—হিন্দু-মুসলমান এক হয় নি এ কথাটাও এখন থেকে রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়ে বলতে থাকেন। দেখলেন, বয়কট সেই ভেদ-রেখাটাকেই গভীরতর করে তুলছে। তিনি তাই তীব্র কণ্ঠে এই বয়কটের আত্মঘাতী নীতির প্রতিবাদ করলেন :

> "বিলাতী দ্রব্য ব্যবহারই দেশের চরম অহিত নহে, গৃহবিচ্ছেদের মতো এত বড় অহিত আর কিছু নাই।" ('সদুপায়', "সমূহ" রচনাবলী ১০ম, পৃঃ ৫২২)

গভীর দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ এই হিন্দু-মুসললান বিচ্ছেদের প্রতিকার খুঁজলেন। বললেন, ইংরেজের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের সমস্বার্থের ও সমবিরোধের সূত্রেও সে সমাধান সম্ভব নয়,—পরবর্তীকালে অসহযোগের

সময়ে সে কৌশল অনেকটা গৃহীত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় মত—মিলনের পথ সেবা, প্রীতির যোগেই নির্মাণ করতে হয়:

"মানুষকে চাহিলে মানুষকে সেবা করিতে হয়। পরস্পরের ব্যবধান দূর করিতে হয়—নিজেকে নম্র করিতে হয়।" ('সদুপায়', "সমূহ")

আজ আমরা নিঃসন্দেহে বুঝি এইটাই মূল সমাধান। কিন্তু এও দেখছি—"তৃতীয় পক্ষ"-ও একটা প্রচণ্ড সত্য।

কোরিয়া, ভিয়েৎনাম, প্রভৃতি দেশে দৃষ্টান্ত দেখে বুঝতে পারি সাম্প্রদায়িক ভেদ-রেখা যেখানে ছিল না সেখানেও ভেদ-রেখা ফুটিয়ে তোলা সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে একেবারে দুঃসাধ্য হয় না। আমাদের তো ভেদ থেকেই গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা মূল থেকেই চেয়েছিল এই বিভেদের বিলোপ। জীবনের শেষভাগে তিনি প্রায় সেই চরম অকল্যাণও দেখতে পেয়েছিলেন—যা ১৯৪৬-৪৭এর ভারতবর্ষকে রক্তাপ্লুত ও বিখণ্ডিত করে ফেলল। ('হিন্দু-মুসলমান' ১৯৩১ ইং এর লেখা, "কালান্তর", রচনাবলী ২৪শ, পৃঃ ৪৫২-৪৫৩)। এ যেন দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎদর্শন।

বয়কট ব্যাপারে যখন তিনি (ইং ১৯০৭-১৯০৮) বিরক্ত তখনি ক্ষুব্ধ উত্তেজনা দেখা দিল বোমা বিস্ফোরণে। রবীন্দ্রনাথ জানতেন হতাশার সেই উন্মাদ সাহস দেশকে গোপনে গোপনে চমৎকৃতও করেছে, কিন্তু গুপ্ত হত্যা অধর্ম।

"এই প্রকার দুশ্চেষ্টা অনিবার্য পরাভবের মধ্যে লইয়া যাইবেই।… মঙ্গলকে সৃষ্টি করিতে হয় তপস্যার দ্বারা। ক্রোধের আবেগ তপস্যাকে বিশ্বাসই করে না।" ("পথ ও পাথেয়")

তাছাড়া, এরূপ গুপ্তহত্যা শুধু ধর্মহীন যুক্তিহীন নয়, তা স্বাদেশিকতার আত্ম-বিস্মৃতি, ভারতীয় সাধনার অস্বীকৃতি। কারণ, ভারতবর্ষের একটা মহান নিয়তি আছে:

"ভারতবর্ষে বিশ্বমানবের একটা প্রকাণ্ড সমস্যার মীমাংসা হইবে। সেই সমস্যা এই যে, পৃথিবীতে মানুষ বর্ণে ভাষায় স্বভাবে আচরণে ধর্মে বিচিত্র—নরদেবতা এই বিচিত্রকে লইয়াই বিরাট। সেই বিচিত্রকে আমরা ভারতবর্ষের একাঙ্গ করিয়া দেখিব।" ("সমস্যা" রচনাবলী ১০ম পৃঃ ৪৬৮)

সন্ত্রাসবাদের আবির্ভাবে প্রথম লেখা হল "পথ ও পাথেয়" (জ্যৈষ্ঠ,

১৩১৫ বাং), পর মাসেই "সমস্যা", তৃতীয় মাসে "সদুপায়", শেষে "দেশহিত" (বঙ্গদর্শন, আশ্বিন, ১৩১৫)—কোথাও তিনি সন্দেহের অবকাশ রাখলেন না—নৈতদ্ নৈতদ্। পরেও "ঘরে-বাইরে"তে সে অবকাশ রাখেন নি। হিজলীর বন্দী-হত্যার পরে রচিত "প্রশ্ন" (১৯৩১) কবিতা থেকে বোঝা যায়—গান্ধীজীর মতো শাসক-শক্তিকে ক্ষমা করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সহজ ছিল না। কিন্তু "ন্যায়ধর্মের কেন্দ্র ছাড়লে বুদ্ধির নষ্টতা অনিবার্য", "চার অধ্যায়েও" (১৯৩৪) সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে তাঁর এ বক্তব্য সুপ্রতিষ্ঠিত।

স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ছিন্ন করে রবীন্দ্রনাথ (ইং ১৯০৮) পাবনা সম্মিলনীর পরে তাঁর বিদ্যালয়ে ফিরে যান, ফিরে যান শিলাইদহতে আপন জমিদারিতে। নিজের মতো করে সেখানে পল্লীসমাজ গঠনের কাজে হাত দেন। এক অর্থে সেই সূচনাই শেষ পর্যন্ত পরিণত হয় শ্রীনিকেতনের নানা উদ্যোগে। অবশ্য স্বদেশী যুগের পরেও বিশেষ বিশেষ ক্ষণের দায়িত্ব পালন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বারবার রাজনীতি ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী হয়ে এসেছেন। কিন্তু জাতীয় সংগ্রামে যে তিনি সেরূপ সমস্ত উদ্যম নিয়ে আর যোগদান করেন নি তাতে জাতির লাভই হয়েছে।

কারণ, স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার ভাণ্ডারে যা শ্রেষ্ঠ দান তা কী ? আজ আমরা জানি তা তাঁর স্বদেশী গান। 'নৈবেদ্যের' অবিস্মরণীয় দেশপ্রেমের কবিতা ('আঘাত সংঘাত মাঝে', 'তোমার ন্যায়ের দণ্ড', 'হে ভারত,' ইত্যাদি), 'মেঘ ও রৌদ্রের' মতো গল্প থেকে তার সূচনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো এত উৎকৃষ্ট স্বদেশী গান ('গীতবিতান' ৪৬।৪৭) আর কোনো কবি লিখেছেন বলে আমাদের জানা নেই। উৎকৃষ্ট এ জন্য যে, তাতে সংকীর্ণ জাতিপ্রেমের লেশমাত্র নেই; স্পর্ধা ঔদ্ধত্য নেই, বিদ্বেষ হিংস্রতা নেই; উদার গম্ভীর তার মেজাজ। এবং খাঁটি স্বদেশী, মাটির গন্ধমাখা বাঙলার লৌকিক সুরে তা বাঁধা। সেদিনের 'সন্ধ্যা,' 'যুগান্তর' আজ বিস্মৃত। সম্ভবতঃ, 'স্বদেশী সমাজ'ও এখন ইতিহাস মাত্র। কিন্তু 'সার্থক জনম আমার' বা 'সোনার বাঙলা' প্রভৃতি গান অম্লান। শুধু স্বদেশী গান লিখলেও রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশিকতার ইতিহাসে অমর হয়ে থাকতেন। তাঁর স্বাদেশিকতার চিন্তা এত বিপুল ও অসামান্য না হলেও চলত।

স্বদেশী যুগের অভিজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা'র পর্বের স্বাদেশিকতার কোনো কোনো ধারণার পরীক্ষা হয়ে গেল, পরিশোধন ও পরিণতিও ঘটল, যেমন, হিন্দু স্বাজাত্যের ঝোঁকের, ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধীয় কল্পনার। ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধেও তাঁর দৃষ্টিতে আরও স্বচ্ছতা এল। সেই ১৯০৮-এই (১৩১৫ বাং) 'পূর্ব ও পশ্চিমের' বক্তৃতাতেই তিনি বললেন :

> "ভারতবর্ষের ইতিহাস কাহাদের ইতিহাস? হিন্দু, মুসলমান কাহারও স্বতন্ত্র ইতিহাস নহে। ইংরেজের আগমনও এখানে অপ্রয়োজনীয় নয়। পশ্চিমের সহিত প্রাচ্যকে মিলিতেই হইবে। পশ্চিমকে আপনার শক্তিতে আপনার করিয়া লইতেই হইবে।"

কথাটি পূর্বেও রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করতেন না, কেবল মাঝখানে কিছুদিন 'বিরোধমূলক আদর্শকে' গুরুত্ব দান করেছিলেন। এখন বুঝলেন ঐক্যই ভারতের সাধনা, তার মিশন। আরম্ভ হল "ভারত-তীর্থের" পর্ব।

রবীন্দ্রপ্রতিভার গণনায় ইং ১৯০৮ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত যুগটাকে বলা হয় 'গীতাঞ্জলি'র পর্ব, ১৯১৪ থেকে "বলাকা"র পর্বারম্ভ। প্রথম পর্বটায় রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করে আধ্যাত্মানুরাগী সুরকার ও সঙ্গীতকার, এবং রূপক নাট্যের রচয়িতা। স্বাদেশিকতার দিক থেকে ইং ১৯০৮ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত কালকে—গান্ধীজীর অসহযোগের কাল অবধি সময়টাকে—একসঙ্গে গ্রহণ করে আমরা বলতে পারি—"ভারততীর্থের পর্ব"। "গোরা", "প্রায়শ্চিত্ত", "অচলায়তন", "রাজা", এবং "সবুজ পত্রে"র কবিতা, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এ পর্বটা অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। এখানে তার বিশদ বিশ্লেষণ অসম্ভব, বিশিষ্টতাই শুধু সূত্রাকারে নির্দেশ করা যেতে পারে। যেমন, "গোরা" উপন্যাসের পরিধিতে রবীন্দ্রনাথের পরিশোধিত ভারততত্ত্ব, ভারতীয় সাধনা ও ভারতধর্মের রূপ রূপায়িত; এজন্য শত ত্রুটি সত্ত্বেও "গোরা" মহৎ সৃষ্টি। গোরার নিজের প্রবল হিন্দুস্বাজাত্য যেন বিবেকানন্দ-নিবেদিতার ভারততত্ত্বেরই সাহিত্য-রূপ। "স্বদেশী সমাজে" গান্ধীজীর পূর্বে গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের প্রস্তাব ছিল—"প্রায়শ্চিত্তের" (১৩১৫ বাং, ধনঞ্জয় বৈরাগী দিল গান্ধীজীর সত্যাগ্রহরূপ সংগ্রাম-পদ্ধতির

আভাস—রাষ্ট্রীয় মুক্তির বিশেষ পথ কী. তার সংকেত। এই সঙ্গেই দেখতে পাই স্বাদেশিকতার সামন্ত-সমাজ-বিদ্রোহী বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের খরতর ও দৃঢ়তর চেতনা—এইটিও এ পর্বের বিশিষ্টতা। "অচলায়তনে"র বিদ্রোহটা নিশ্চয়ই সামাজিক অচলায়তনের বিরুদ্ধেও, সামন্তযুগের শাস্ত্র ও সংস্কারের বিরুদ্ধেও। "সাধনা" "বঙ্গদর্শনে"র যুগে এ দিকটায় তত জোর দেওয়া হয় নি। "গীতাঞ্জলির" 'হে মোর দুর্ভাগা দেশে' তা আরও স্পষ্ট—এটি মানুষের অধিকারের দাবি। "সবুজ পত্রে"র কবিতা সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ও প্রাণবান বিদ্রোহের ডাকে মুখর। "কর্তার ইচ্ছায় কর্মের" (১৩২৪ বাং) পঠিত বক্তৃতাই অবশ্য সমাজ-বিবর্তনের সর্বাধিক সুতীব্র আহ্বান। "গীতাঞ্জলি"র 'হে মোর চিত্ত' ("ভারততীর্থ") সেই ভারত-মিশনের অপূর্ব ঘোষণা। ভারতের জন্য প্রার্থনা (১৯১১) "জনগণমন-অধিনায়ক" গান। 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা'য় (১৩১৮ বাং—ইং ১৯১১, "পরিচয়", রচনাবলী পৃঃ ৪২৪) ভারত-ইতিহাসের নূতন জিজ্ঞাসা। শেষকথা, রাষ্ট্রিক অভিমতও এ সময়ে অকুণ্ঠিত উত্থিত হয়েছে প্রথম যুদ্ধকালীন আটক-নীতির বিরুদ্ধে "ছোট ও বড়ো"তে—যখন সেই সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশে কেউ মুখ খুলতেন না। নাইটহুড্ ত্যাগের পত্রের (ইং ১৯১৯) কথা উল্লেখই হয়তো যথেষ্ট—সে পত্রকে কিন্তু অভিনন্দন করতে সেদিনের অমৃতসর কংগ্রেসের নেতারা সাহসী হন নি। দেশপ্রেমিকের মতো এসব রাজনৈতিক কর্তব্য করলেও রবীন্দ্রনাথ এসব ক্ষেত্রেও মানবতার মহৎ নীতিতেই উদ্বুদ্ধ। 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা'রও শেষ কথা তাই—

> "এইরূপ উপলব্ধি করিব যে স্বজাতির মধ্য দিয়া সর্বজাতিকে ও সর্বজাতির মধ্য দিয়া স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়।"

বিশ্বভারতীর পর্ব

এ কথা তাই বলা যায়, এই "গোরা", "অচলায়তন", "ন্যাশনালিজম"-এর পর্বে রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা সামন্ত-সংস্কার বিরোধী, স্বার্থান্ধ রাষ্ট্রধর্ম বিরোধী, এবং একই কালে দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম রূপে সুস্থির পরিণতি লাভ করেছে; ভাবে ভাষায় তার সম্পূর্ণতা তখন সুস্পষ্ট। এ পর্বের পরে তার প্রকাশ আর ব্যাহত হয় নি। 'শিক্ষার মিলন', (বাং ১৩২৮) 'সত্যের আহ্বানে' তখন দেখতে পাই গান্ধীজীর চরকাবাদ ও বিজ্ঞানবিরোধী পশ্চাদমুখিতার বিরুদ্ধে

স্বাদেশিক রবীন্দ্রনাথের সাহসিক অভিযান—তাকে আমরা সাধারণভাবে কবির বিশ্বভারতীর পর্বের (ইং ১৯২১ থেকে) স্বাদেশিকতাও বলতে পারি। এ পর্বে দেখি বিজ্ঞানের স্বপক্ষে, সভ্যতার স্বপক্ষে ও বিশেষ করে বিশ্বসংস্কৃতির মিলনের জন্য রবীন্দ্রনাথের বিপুল প্রচেষ্টা। ভারতবাসী ও ভারতীয় জাতীয়তাকে কবির সেই সব ভাব ও প্রয়াস পরোক্ষে কম প্রভাবিত করে নি— তা এখন বোঝা যায়। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা আজ আমাদের জাতীয় ও বৈদেশিক নীতির আদর্শ। রবীন্দ্রনাথের মতো এ আদর্শ আর কে প্রচার করেছে ?

অবশ্য, এ পর্বেই প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে তিনি বিশ্বব্যাপী শ্রেণী-সংঘর্ষ সম্বন্ধেও সচেতন হয়েছিলেন; "রক্তকরবী"তে তা স্পষ্ট। ভারতীয় স্বাদেশিকতার ঔপনিবেশিকতাবিরোধী ভাবাদর্শের বিকাশে, সেই শোষক-শোষিতের বিরোধ-বোধেরও একটা ক্ষীণ যোগ না ছিল তা নয়। তবে রবীন্দ্রনাথের মতে সংঘর্ষের সমাধান বিদ্বেষে ও বিনাশে নয়, সৃষ্টিতেই বিরোধের সামঞ্জস্য; কিন্তু বিরোধকে নিঃশেষ করে, এমনকি বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই আসবে সেই সামঞ্জস্য। তখনো অবশ্য সামন্ত ভূমিব্যবস্থার বিলোপে তিনি উৎসাহী নন— ("রায়তের কথা", রচনাবলী ২৪শ)। পল্লী-শিক্ষা ও পল্লী-সমাজ সংগঠনই তাঁর মতে ভূমিসংস্কারের ভিত্তি। কারণ শিক্ষাই রায়তকে আত্মরক্ষার বুদ্ধি ও শক্তি দিতে পারে, এই তাঁর ধারণা।

এই ধারণা যে জমিদারী মনোভাবের জন্য নয়, তার প্রমাণ পাওয়া গেল পরবর্তী স্তরে। ইং ১৯৩০-এ দু সপ্তাহের জন্য রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় গেলেন— না গেলে এ জীবনের তীর্থযাত্রা অসম্পূর্ণ থাকত, এই তাঁর কথা। রবীন্দ্রনাথের কোনো মৌলিক ধারণা যে রাশিয়ার অভিজ্ঞতায় পরিবর্তিত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু এই ১৯৩০ ইং থেকে মৃত্যু পর্যন্ত (১৯৪১ ইং) তাঁর জীবনের চরম স্তরটি যে তাঁর জীবন-সাধনার চূড়ান্ত স্তর তাতে সন্দেহ নেই। রাশিয়ার অভিজ্ঞতা অগভীর বা মামুলী বস্তু ছিল না। কাজেই রাশিয়ার অভিজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবন-দৃষ্টি কোনো কোনো দিকে তখন স্বচ্ছ ও সাহসী হয়ে উঠেছে, কোনো কোনো ধারণা পরিচ্ছন্ন হয় (যেমন, কোরীয় যুবকের সঙ্গে সাক্ষাৎ থেকে বুঝি ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে শোষিতদের আন্তর্জাতিক ঐক্য তিনি বুঝতে পেরেছেন; গান্ধীজীর নিকটেও তিনি শ্রেণী সংগ্রামকে সত্য বলে মত প্রকাশ করেন)। কৃষি-সমবায়, যন্ত্রশিল্পের ফলাফল, পল্লী ও নগরের বিরোধের সামঞ্জস্য-সম্ভাবনা প্রভৃতি কোনো কোনো বিষয়ে কবির

কর্ম-যোগ আরও বাস্তবানুগ হয়। • রাশিয়া দেখে মানবিক সাধনায় শ্রমিক-শ্রেণীর দান সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ সচেতন হলেন—কারণ, রাশিয়ার শ্রমিক-নেতৃত্ব জাতিতে জাতিতে বৈষম্য ঘুচিয়েছে, সকল মানুষকে দিয়েছে শিক্ষার ও সংস্কৃতির অধিকার। নিশ্চয়ই রাশিয়ার সব জিনিস সম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয় হন নি—হতে পারেন না। কিন্তু "চিঠিপত্র" থেকে বোঝা যায় একথাও বুঝলেন জমিদারি একটা অচল ব্যবস্থা; মানুষের ব্যক্তি-সত্তার পক্ষে বিত্তের বাহুল্য একটা বাধা; আর মূল কথাটাও বুঝলেন, 'ব্যক্তিগত খাদ থেকে সামগ্রিক উদ্যোগে ধনের প্রয়োগেই' সোভিয়েতের সার্থককা। তিনি দেখলেন—যা তিনি চেয়েছিলেন রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব তা'ই করতে অগ্রসর।

যে স্বাদেশিকতা তাঁর আদর্শ—যাতে দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের সমন্বয়,—তা কি প্রোলিটোরিয়ান্ পেট্রিয়টিজম্-এর স্বগোত্র? অন্ততঃ, শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে ছাড়া ফিউডাল-বুর্জোয়া নেতৃত্বে সেরূপ স্বাদেশিকতার রথও কি অচল?—এসব প্রশ্ন স্বভাবতই আমাদের মনে জাগে। কিন্তু এর ধরাবাঁধা উত্তরে রবীন্দ্র-নাথের রুচি ও আস্থা ছিল কি না সন্দেহ। বরং সত্যকারের উত্তর পাওয়া যায় তাঁর কর্মে ও সৃষ্টিতে। সেই ফ্যাশিজম্-এর বর্বরতার দিনে, সভ্যতার সংকটে তিনি দাঁড়ালেন সৃষ্টিতে, কর্মে ও ভাবনায় মানুষের হয়ে, আর তার স্বদেশেরও হয়ে—হিজলির হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি গিয়ে দাঁড়ালেন মনুমেণ্টের তলায়, মৃত্যুর ছায়ায় বসে কলম তুলে নিলেন মিস র‍্যাটবোন্-এর প্রতিবাদে, এ বিশ্বাসও ঘোষণা করলেন শেষ জন্মদিনের বাণীতে—পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্তেই দেখা দেবে সংকটের শেষে আবার সেই মহামানবের নূতন অভ্যুদয়।

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিক মতবাদের স্বরূপ ও তার বিকাশের ধারা আমরা অনুধাবন করতে চেষ্টা করেছি। সে আলোচনায় আমরা রবীন্দ্রনাথের নানা বাস্তব আয়োজন—বিশ্বভারতী, শ্রীনিকেতন, এমনকি গান্ধীজী, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির অনুষ্ঠিত নানা রাষ্ট্রিক আয়োজনের সঙ্গে তাঁর সক্রিয় যোগাযোগ, বা সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি তাঁর ধিক্কার, এসব সুপরিচিত গুরুতর বিষয়ের উল্লেখও প্রায় বিশেষ করলাম না। সেরূপই প্রায় উল্লেখ করলাম না যে, ভারতীয় স্বাদেশিকতায় তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় দান কী—তাঁর সৃষ্টি,—সাহিত্য, সঙ্গীত-শিল্প। যে-দেশে রবীন্দ্রনাথ জন্মেছেন সে-দেশ রাষ্ট্র হিসাবে যদি আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে নাও পারত, বিশ্বের নিকট সে যে আত্মপ্রকাশে সমর্থ হয়েছে, একথা অস্বীকার করবে কার সাধ্য?

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার নব-জাগরণ

সুশোভন সরকার

॥ এক ॥

শতবার্ষিকী উৎসবে রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় প্রতিভার আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর স্বদেশ ও স্বকালের বিশাল পটভূমিকার কথা স্বতঃই মনে আসে। মানুষের কীর্তি মহীরুহের মতো আকাশে আলোতে বাতাসে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে দাঁড়ালেও মাটির সঙ্গে তার নিবিড় যোগটুকু হারাতে পারে না। সেই মাটির বন্ধন রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে হল উনিশ শতকের বাংলা দেশে নব-জাগরণের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র।

উৎসবের দিনে চিন্তাশীল বাঙালী তাই রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-বিদ্যাসাগর-মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে পারবে না, করলে তার স্মৃতি হবে অসম্পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথকে এইভাবে পূর্বসূরীদের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা বাঙালীর পক্ষে স্বাভাবিক তো বটেই, এটা আমাদের বিশেষ কর্তব্য-ও। আজ দেশে রবীন্দ্রনাথের যে-বন্দনা উঠছে সেখানে তিনি একক স্বমহিমায় দীপ্যমান; সেখানকার দৃষ্টির সামনে পশ্চাৎপট কিছু নেই। বাংলার বাইরে বাংলার নব-জাগরণ আজও অনাদৃত, অজ্ঞাত। বিশ্বকবি হয়েও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নিজস্ব দেশ-কাল সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ ও সচেতন ছিলেন, পারিপার্শ্বিক সমাজ-জীবনে তাঁর আগ্রহের অন্ত দেখি না, স্বজাতির সমসাময়িক ভাবনা-বেদনা কোনো দিন তাঁকে স্পর্শ না করে পারে নি।

বাংলার নব-জাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথকে দুই দিক থেকে দেখা চলে। উনিশ শতকের উত্তাল তরঙ্গের তিনি শীর্ষমণি, তাঁরই মধ্যে সেই প্রেরণার সকল অঙ্গ যেন তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ পেয়েছিল, তার সকল সম্পদকে তিনি গৌরব-মণ্ডিত করতে পেরেছিলেন। আমাদের রেনেসাঁসের পরিপূর্তি ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথে। আবার একথাও সত্য যে সে-যুগের সকল চিন্তা, পরস্পরবিরোধী ভাবধারা, সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত আলোড়ন এনেছিল

রবীন্দ্রনাথের মনে। তাঁর মন কখনও জগৎ থেকে বিমুখ হয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবনায় ডুবে যেতে পারে নি—

"নিভৃত এ চিত্তমাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ-আঘাত
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত বিরাম নাই,
নিদ্রাহীন সারা দিনরাত।"

রবীন্দ্র-মানসে নব-জাগরণের চিন্তাপ্রবাহের এই নির্নিমেষ অবিরাম প্রতিধ্বনি আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু। আর, আমাদের রেনেসাঁসে দিকে দিকে যে সমৃদ্ধি রবীন্দ্রনাথ এনে দিয়েছিলেন, উৎসবের মধ্যে সে-বিচার তো আজ অফুরন্ত।

॥ দুই ॥

বাংলার নব-জাগরণকে রেনেসাঁস আখ্যা দেওয়াটা মনে হয় হাল ফ্যাশানের কথা, গত পনরো কুড়ি বছরে এর বহুল প্রচলন হয়েছে। নামকরণের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে ইওরোপে পনেরো ষোলো শতকের রেনেসাঁসের সঙ্গে তুলনার একটা ইঙ্গিত।

দুয়ের মধ্যে অবশ্য পার্থক্য বিস্তর। প্রথমতঃ, আদি রেনেসাঁসে বুদ্ধির মুক্তি এসেছিল যুগান্তকারী বহুমুখী জাগরণের অঙ্গ হিসাবে, সেই জাগরণের মধ্যে দেখা গেল অকূল সমুদ্র উত্তরণ, ধর্মজগতে আমূল বিপ্লব, নব বিজ্ঞানের বিশ্ব-পরিচয়, কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তি গঠন, পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থায় ভাঙন, বাণিজ্য-কৃষি-শিল্পে পুনর্বিন্যাস। এই প্রচণ্ড প্রাণশক্তি-এ রেনেসাঁসে সম্ভব ছিল না। এদেশে ব্রিটিশশাসন পুরাতন ব্যবস্থা চুরমার করার আয়োজন করে থাকলেও নূতন সমাজ গড়ে তোলার ইচ্ছা বা দায়িত্ব রইল তার আওতার বাইরে; অবসাদগ্রস্ত নির্জীব দেশবাসীর পক্ষেও অতখানি উদ্যম হাতের নাগালে আসে নি। দ্বিতীয় পার্থক্য দেখা যাবে রাষ্ট্রিক পরিবেষ্টনে। পশ্চিমী রেনেসাঁসের লীলাভূমি পশ্চিম ইওরোপের স্বাধীন রাজ্যগুলিতে, এমনকি ইটালিও পরাধীন হয়ে পড়ে আন্দোলনের অবসানের যুগেই, প্রারম্ভে নয়। আমাদের জাগরণ এল বিদেশীর পদাশ্রয়ে, অর্ধকলোনিত্বের পত্রপুটে; তার ভিতর স্বচ্ছন্দ বিকাশের অবকাশ কোথায়। বিজয়ীয় প্রভুত্ব জাগরণের পথে

আনুকূল্যের চাইতে বিঘ্নের সহায়ক হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। তৃতীয় প্রভেদটাও নিশ্চয় সুদূরপ্রসারী। ইওরোপীয় রেনেসাঁসে প্রাণসঞ্চার করে প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার; গ্রীক চিন্তা, গ্রীক আদর্শ, গ্রীক দৃষ্টি গড়ল নূতন হিউম্যানিস্ট মণ্ডলীগুলিকে; আধুনিক মনকে তৃপ্তি দেবার মতো সঙ্গতির অভাব ছিল না ঐশ্বর্যমণ্ডিত এই অতীত চিন্তাধারার মধ্যে। আমাদের দেশে অতীত সভ্যতা-সম্পদ নূতন যুগের এতটা উপযোগী কিনা এ প্রশ্ন না তুললেও বাংলার রেনেসাঁসে উন্মেষক প্রেরণা এসেছিল সেকালের ভারত থেকে নয়, একালের নবজাগ্রত পশ্চিম থেকে। সেই পশ্চিমের বাহুবলেই আবার দেশ তখন মুহ্যমান, ভূলুণ্ঠিত।

স্পষ্টতই দেখা যায়, ইওরোপের তুলনায় বাংলার রেনেসাঁস ঘটনাচক্রে বাধ্য হল খণ্ডিত, আড়ষ্ট, কিছুটা অস্বাভাবিক রূপ নিতে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমাদের নব-জাগরণের ঐতিহাসিক মূল্য যৎকিঞ্চিৎ। একালের সমালোচকের চোখে ইওরোপের রেনেসাঁসও কিছু নিখুঁত নয়, তার উৎকর্ষও নিশ্চয় ছিল সীমিত। অন্ধ অনুকরণ প্রবৃত্তি, গ্রীক চৌহদ্দির বাইরে সকল গভীর চিন্তার প্রতি অবজ্ঞা, সংস্কৃতিবান ও সাধারণের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ভেদরেখা প্রভৃতি দুর্বলতারই পরিচায়ক। তাছাড়া, কোনো সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রকৃত মূল্য পাওয়া যায় পূর্ববর্তী যুগের পশ্চাদ্ভূমিতে, তারই তুলনায়। আঠারো শতকের বাংলায় মানস-জগৎ ও সমাজ-জীবনের মান এমন কিছু ছিল না যে আমাদের রেনেসাঁসকে উন্নাসিক কায়দায় অশ্রদ্ধা করা চলে। বাংলার নব-জাগরণের অতিরঞ্জিত ছবি আঁকা অথবা তাকে তাচ্ছিল্য-জ্ঞানে অস্বীকার করা, এই দুই-ই হল ঐতিহাসিক বাস্তব বিচার থেকে বিচ্যুতি। যুগবিশেষের কীর্তি যেমন অসীম নয়, তার আপেক্ষিক মূল্যটাও তেমনি মূল্যই বটে।

॥ তিন ॥

বাংলার রেনেসাঁসকে সচরাচর দেখা হয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অগ্রগতি হিসাবে, চিন্তা ও উদ্যমের কাহিনী হিসাবে, সর্বাঙ্গীণ জাগরণের নিদর্শন হিসাবে, দেশের নবজন্মের প্রতীক হিসাবে। প্রবাহের নানা ধারকের কৃতিত্ব এর মধ্যে পাশাপাশি স্থান পায়, নানা চিন্তা চিহ্নিত হয় পরস্পরের পরিপূরক রূপে। বহু ঢেউ-এর সমষ্টি একটা স্রোত চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সকল বৈচিত্র্য

সেখানে একধর্মী, জাতীয়-জাগরণধর্মী। ফুলের মালার প্রতিটি ফুল আমাদের আদরের ধন, গৌরবের সামগ্রী।

এটা এক ধরনের দেখা বইকি। এতে আমাদের চোখ থাকে সামগ্রিক প্রকাশের দিকে, জাগ্রত শক্তির পরিচয়ের দিকে, মোট সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টাটার দিকে। একই যুগে কত লোক কত কথায় মুখর হয়ে উঠেছে, কত ধরনের কর্মের পত্তন করেছে, সকলের মিলনে চিত্তজগতে নব-জাগরণ পৃথিবীর কাছে তুলে ধরতে পেরেছে।

এই ছবি নিশ্চয় একটা ঐতিহাসিক বিচার, কিন্তু বাহ্যিক বিচার মাত্র। চিন্তার জাগরণে একই পর্যায়ে বিভিন্ন স্বতন্ত্র ধারার প্রকাশটাও কিন্তু স্বাভাবিক, তাদের মধ্যে বিরোধ কিছু অপ্রত্যাশিত নয়। কাজেই সমসাময়িক সংশ্লিষ্ট লোকের কাছে এদের মধ্যে মূল্যবিচার করে একটা বাছাই অনিবার্য। তাই বাহ্যিক দৃষ্টি থেকে নিবৃত্ত হয়ে যুগ-মানসের মধ্যে অন্তরঙ্গ প্রবেশের চেষ্টা করলে চোখে পড়বে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ, বিভিন্ন ভাবের ঘাতপ্রতিঘাত, বাস্তব জীবনের সংঘাত। জীবনের ধরনই হল এই। কোন্‌টা ঠিক পথ এই নিয়ে পদে পদে তর্ক ওঠে, বিশ্বাসের ভেদাভেদ ও প্রচেষ্টার পরস্পর-বিরোধিতা প্রতি মুহূর্তে লোককে উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ করে তোলে। তারা কিছু সমর্থন করে, অন্য কিছু হয় তাদের কাছে প্রত্যাখ্যাত।

পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিককেও এই মূল্যবিচার রেহাই দেয় না। তাঁকে দেখতে হয় আলোচ্য কালের কোন্ ধারা শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়ে উঠেছে, কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে পড়েছে অচল। দূর থেকে গোটা ফুলের মালার সৌন্দর্যটা কিছু মিথ্যা নয়, কিন্তু গভীরতর দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এড়ানো যায় না। স্রোতের এক প্রবাহের বদলে চোখে আসে বিপরীতধর্মী আবর্ত।

॥ চার ॥

আমাদের নব-জাগরণে অন্তর্বিরোধ বিশ্লেষণ করতে গেলে যে-দুটি প্রধান ধারা চোখে পড়ে, যাদের সুরের ঝঙ্কার স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের মনেও প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, তাদের নাম দেওয়া যাক পশ্চিমী দৃষ্টি এবং প্রাচ্যাভিমান। ইংরেজীতে বলা যেতে পারে Westernism ও Orientalism।

এর অনুরূপ অবস্থা আমরা দেখি উনিশ শতকে রুশদেশের ইতিহাসে।

সেখানে পশ্চিমপন্থী ওয়েস্টার্নারেরা চেয়েছিলেন পশ্চিম ইওরোপের চিন্তাধারাকে আত্মসাৎ করে তার উপর ভবিষ্যৎ রুশ সমাজের প্রতিষ্ঠা। আর ঐতিহ্যভক্ত স্লাভোফিলেরা অর্থাৎ স্লাভজাতির ভক্তবৃন্দ প্রাচীন ধ্যান-ধারণাকে কিছুটা সংস্কৃত করে নিয়ে তার ভিতরেই সন্ধান করেছিলেন আগামী দিনের উপযুক্ত ভিত্তি। মাসারিক প্রভৃতির লেখায় এই অন্তর্দ্বন্দ্বের বিবরণ অনেকের কাছেই অপরিচিত নয়।

বিরোধী দুই ধারা নির্দেশ করার অর্থ অবশ্য এই নয় যে বাংলার জাগরণের প্রতিভূদের পরিষ্কার দুই দলে ভাগ করে ফেলা হচ্ছে। সুস্পষ্ট দুই দল নির্ণয় হয়তো বা উনিশ শতাব্দীর রুশদেশে সম্ভব ছিল ; বাংলার রেনেসাঁসে স্পষ্ট দুটি গোষ্ঠীর সন্ধান অনেকটা পণ্ডশ্রম হবে। এখানে দেখি একই লোকের চিন্তায় দুটি ঝোঁকেরই পরিচয় রয়েছে, বিভিন্ন পর্বে, এমনকি মাঝে মাঝে একই সময়ে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছিলেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' প্রতিষ্ঠার সূচনায় যাঁরা কোঁৎ-মিলের ধ্বজা উড়িয়েছিলেন তাঁরাই আবার পরবর্তীকালে প্রাচীন আদর্শের আশ্রয় খুঁজলেন—

"তোমরা আনিয়া প্রাণের প্রবাহ
ভেঙেছ মাটির আল,
তোমরা আবার আনিছ বঙ্গে
উজান স্রোতের কাল।"

নব-জাগরণে প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি সুরই যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও সাড়া তুলেছিল একথাও অবিদিত নয়। সুতরাং পশ্চিমী দৃষ্টি এবং প্রাচ্যাভিমান বলতে আমরা বুঝব দুটি অমূর্ত বা অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট্ ধারণা, দুটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী নয়। অমূর্ত ধারণা রূপ গ্রহণ করে বিশ্লেষকের চোখে ঝোঁক বা ট্রেণ্ড্ হিসাবে। বাস্তব জীবনে এর প্রকাশ সরল নয়, বহুধা বিচিত্র।

অথচ পশ্চিমী দৃষ্টি ও প্রাচ্যাভিমানের আদর্শগত পার্থক্যটা অগ্রাহ্য করা চলে না। উভয় ধারার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার চেষ্টা করলে কথাটা পরিষ্কার হবে। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে উভয় ক্ষেত্রেই আদর্শের প্রকাশ ব্যক্তিবিশেষের মনে সমান প্রবল বা সম্পূর্ণ না হওয়াটাই স্বাভাবিক।

বাংলার নবযুগে পশ্চিমী ধারার প্রথম প্রকাশ দেখা যায় সমাজ-সংস্কার পরিকল্পনায়। প্রচলিত সমাজ-বিধির মধ্যে অন্যায়, অবিচার, অন্ধ সংস্কারের দিকে চোখ পড়তে থাকে ; সতীদাহ, আমরণ বৈধব্য, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ,

নারীর অবনত অবস্থা ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মাথা তোলে; সমাজের পুনর্গঠন ঈপ্সিত হয় এমন পথে যাকে আধুনিক পশ্চিমী পথের অনুবর্তন হিসাবে দেখাটা অন্যায় নয়। আমরা যে মনোভাবকে প্রাচ্যাভিমানী বলছি সেটা যে সব সময় সামাজিক কুপ্রথার সমর্থক অথবা এ বিষয়ে উদাসীন তা নয়। তবে তার প্রভাবে মনে হত ব্যাপারটা এমন কিছু জরুরী নয়, সংস্কার ধীরে ধীরে আপনা থেকে আসবে, উত্তেজিত বা বিচলিত হওয়াটা বিসদৃশ, হয়তো বা প্রাচীন প্রথার স্বপক্ষেও অনেক কিছু বলার আছে। বিশেষত আইন দিয়ে সমাজ-সংস্কার বরদাস্ত করা প্রাচ্যাভিমানের কাছে সম্ভব ছিল না। প্রধান যুক্তি, আইনকর্তা তো বিদেশী শাসক। অবশ্য, সেই বিদেশী শক্তিরই নির্দিষ্ট আইন-কানুন জীবন-যাত্রার অপরাপর ক্ষেত্রে মেনে নিতে বিশেষ আপত্তি দেখি না।

সমাজ-সংস্কার থেকে এগিয়ে গিয়ে পৌঁছনো যায় যুক্তিবাদে। সংস্কারের স্বপক্ষে শাস্ত্রোক্তি প্রয়োগ করা হত—যেমন দেখি রামমোহন বা বিদ্যাসাগরে; কিন্তু প্রধান প্রেরণা নিশ্চয় এসেছিল যুক্তি থেকে, তারপর খোঁজা হত শাস্ত্রের সমর্থন। প্রাচীন আচার, ব্যবস্থা, ধারণা, বিশ্বাসকে যুক্তির আলোতে টেনে আনার প্রবণতা স্পষ্টই চোখে পড়ে; যুক্তিবিচারটাও মূলতঃ পশ্চিমী শিক্ষার প্রয়োগ। সেই শিক্ষা থেকে উৎসারিত যুক্তিবাদ যে তরুণ মনকে কতখানি অভিভূত করেছিল তার নিদর্শন পাই 'ইয়্যাং বেঙ্গলে'।

কিন্তু যুক্তিবাদ আসলে বুদ্ধির নির্বিশেষ বিচার নয়, নিরাসক্ত সত্যের সন্ধান নয়। ইতিহাসে যুক্তিবাদ চিরদিনই আশ্রয় করেছে নূতন কোনো মূল্যবোধকে, প্রচলিত ঐতিহ্যের বিপক্ষে নূতন আদর্শের অভিযানকে। বাংলাদেশে পশ্চিমী দৃষ্টির যুক্তিবাদ গড়ে উঠল পশ্চিমের মানবতাবাদকে অবলম্বন করে, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আহ্বানে। "কালান্তর" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথই এই প্রসঙ্গে স্মরণ করেছিলেন বার্ন্‌সের অমর উক্তি: A man's a man for a'.that। বলা বাহুল্য, বুর্জোয়া সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ দিকটাই এর মধ্যে প্রকাশ খুঁজেছিল। বাংলার পশ্চিমী দৃষ্টি অনুভব করল যে আধ্যাত্মিক মুক্তি আমাদের যতই কাম্য হোক না কেন, প্রাচীন প্রাচ্য-সমাজে মানুষকে নির্বিশেষ মানুষের মর্যাদা দেওয়ার আগ্রহ নেই।

সমাজ-সংস্কার, যুক্তিবাদ, মানবতাবোধ উনিশ শতকে ইওরোপ থেকে সঞ্চারিত হচ্ছিল বলেই এ সব কিছু সমর্থনের ঝোঁকটাকে পশ্চিমী দৃষ্টি বলার

সার্থকতা আছে। এই স্রোতের বিরুদ্ধে গড়ে উঠল আমাদের রেনেসাঁসের অপর ধারা—অর্থাৎ প্রাচ্যাভিমান।

এর প্রথম আশ্রয় হল প্রাচীন গৌরবের উপাসনা। ইওরোপীয় প্রভুত্বের প্রতিবাদে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এই দিকে প্রবাহিত হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। পশ্চিমী পণ্ডিতেরা প্রাচীন ভারতের সভ্যতা-সম্পদ আবিষ্কার করছিলেন, তার সঙ্গে আবহমান প্রাচীন শাস্ত্রের নূতন উপলব্ধি এসে সম্মিলিত হল। ইওরোপের গুরুগিরির প্রতিবাদে রব উঠল—আমরাই বা কিসে কম। "অতীত গৌরব-কাহিনী" বাণীর মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজল বিক্ষুব্ধ বিচলিত মন, চিত্তাকাশে উড়ল আত্মসম্মানের ধ্বজা।

যে-প্রাচীন গৌরবের দিকেই কেবল উনিশ শতকের দৃষ্টি ফিরেছিল, ঘটনাক্রমে সে-গৌরব কিন্তু হিন্দুসভ্যতার। হিন্দুর সামাজিক ঐতিহ্য আবার আগে থাকতেই ছিল দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, পশ্চিমী ঝড় তাকে বিশেষ কাবু করতে পারে নি। দুয়ের সংমিশ্রণে গড়ে উঠল আমাদের প্রাচ্যাভিমানীদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—হিন্দুত্ববোধ। আত্মরক্ষার দিক থেকে হিন্দুত্বের ছত্রছায়ার সার্থকতা ছিল নিশ্চয়, কিন্তু তার মধ্যস্থিত দুর্বলতার দিকটা কিছুতেই উড়িয়ে দেওয়া চলে না। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক হিন্দু, কিন্তু অহিন্দুর সংখ্যাও সামান্য নয়। অহিন্দুর মনে আঘাত নব-জাগরণকে সহজেই ব্যাহত করতে পারে। সংখ্যাধিক হিন্দু সম্প্রদায় কিছু দৃঢ়সম্বদ্ধ একীভূত শক্তি নয়; হিন্দুসমাজ শত-বিভক্ত, উচ্চ নীচ অগণিত স্তরে গ্রথিত সমাজ। হিন্দু ঐতিহ্যের গৌরব অসামান্য বলে স্বীকার করলেও তাই পশ্চিমপন্থীর মনে হওয়া অনিবার্য যে তার অনেক কিছুই বর্জনীয়। ভবিষ্যতের ঐক্যবদ্ধ জাগ্রত ভারতকে হিন্দু-অহিন্দুত্বের উর্ধ্বে উঠে মানব-অধিকারকে আশ্রয় করতে হবে, পশ্চিমী দৃষ্টির ন্যায্য পরিণতি এই দিকে।

প্রাচ্যাভিমানের মধ্যে তৃতীয় দিক দেখতে পাই ভক্তি-প্রবণতার মধ্যে—যেটা হল এদেশে চিরাচরিত ধর্মসাধনার অন্তরঙ্গ অঙ্গ। পশ্চিমী দৃষ্টি স্বভাবতঃই ভক্তি উচ্ছ্বাসের প্রতি সন্দেহের ভাব পোষণ করে, কারণ যুক্তি ভক্তির বিপরীত পথ। প্রাচ্যাভিমানীর ভক্তির উপর জোর দেওয়া ধর্মবোধের সমার্থক মনে করি না। ধর্মের শান্ত সমাহিত ব্যক্তিগত রূপ পশ্চিমীভাবের পরিপন্থী নয়। কিন্তু রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম এবং শতাব্দীর শেষভাগের ভক্তিমার্গের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য আছে। রামকৃষ্ণের নিজস্ব ভক্তিসাধনাকেও পশ্চিমী মন

শ্রদ্ধা করতে পারে। কিন্তু ভক্তি সমাজ-জীবনে প্রবলবেগে প্রবাহিত হলে সংস্কার-কামনা, যুক্তিপ্রয়োগ, মানব-অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম প্রভৃতির থেকে জনমন বিক্ষিপ্ত হওয়াটাই সম্ভব। সুতরাং প্রাচ্যপ্রত্যয় ভক্তিকে আশ্রয় করে দেশে পশ্চিমী ভাবের প্রতিরোধকেই শক্তিশালী করতে চেয়েছিল বললে অন্যায় হবে না।

বাংলার রেনেসাঁসের এই দুই প্রধান ধারা—পশ্চিমী দৃষ্টি আর প্রাচ্যাভিমান—কোনোটাকেই অবজ্ঞা করা চলে না। কারণ দুটিই বাস্তব জীবনধারার প্রকাশ, ঐতিহাসিক বাস্তবতা থেকে কোনোটাই বঞ্চিত নয়। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল এই যে, আমাদের নব জাগরণের অন্ততঃ দুটি প্রধান অঙ্গ আলোচ্য দুই ধারার কাছেই ঋণী। প্রথম, সাহিত্যশিল্প সৃষ্টির বিস্ময়কর প্রাচুর্য, রেনেসাঁসের প্রসঙ্গে প্রথমে যার কথা মনে আসে। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষিত সমাজে স্বাদেশিকতার উন্মেষ ও অগ্রগমন, ব্যাপক ইতিহাসে আমাদের নব-জাগরণের সঙ্গে যার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। স্বাদেশিকতা এবং সংস্কৃতিচর্চা সমানে পুষ্টিলাভ করেছিল উভয় ধারা থেকে। কিন্তু সুপরিচিত এই সম্মিলিত জয়যাত্রা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নয়।

চিন্তাজগতের অন্তত যে দুই ধারাকে এখানে বিরোধী শক্তি হিসাবে চিত্রিত করা হল, তাদের অবজ্ঞা না করার অর্থ হল, আসল রূপ ও বিকৃতির মধ্যে সীমারেখা টানা। বিকৃতি দুই ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সে-বিকৃতি আসলের প্রতিরূপ নয় বলেই অগ্রাহ্য। সেকালের শিক্ষিত যুব-সমাজের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার, নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ ও মদ্যপান, অনাচার কিংবা ব্যাভিচার, ইঙ্গবঙ্গ সমাজে ইংরেজী হাবভাবের অনুকরণ, "সাহেবিয়ানা" ইত্যাদিকে পশ্চিমী দৃষ্টির পরিচয় হিসাবে প্রতিপন্ন করাটা হাস্যাস্পদ। পশ্চিমী ধারার বিশিষ্ট প্রতিনিধি মধুসূদন সে যুগের বাবুসভ্যতাকে বিদ্রূপের কশাঘাত করেছিলেন। প্রাচ্যাভিমানেরও বিকৃতি দেখি অহিন্দুকে উৎপীডনের মধ্যে অথবা হিন্দু আচারকে বিজ্ঞানের অধুনাতম আবিষ্কারের সঙ্গে একার্থ করে দেখার ভিতরে। কবিতা ও কৌতুক নাট্যে এর প্রতি শ্লেষবর্ষণ রবীন্দ্রনাথের পাঠকমাত্রের স্মরণে আসবে।

কিন্তু বিকৃতি বাদ দিলেও অমূর্ত ধারণা দুটির পরস্পর-বিরোধিতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। অবশ্য অনেকে আমাদের রেনেসাঁসে সমন্বয় খোঁজেন, এবং ইচ্ছামতো পেয়েও থাকেন। সমন্বয় ধরা পড়ে বারবার—

রামমোহনে, বঙ্কিমচন্দ্রে, রবীন্দ্রনাথে—শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে সন্দেহই জাগে। দুটি বিরোধী ধারার সমন্বয় পাওয়া যায় তখনই—যখন উভয়কে ছাপিয়ে নূতন তৃতীয় বস্তু প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আমাদের সমাজে তৃতীয়ের উত্তরণটুকু কোথায়? বারবার তার আবশ্যকই বা হয় কি করে? আসলে এমন সমন্বয় অনেকটা আপোসরফার অনুরূপ, বিরোধী বিভিন্ন ঝোঁকের সহাবস্থান মাত্র। ব্যক্তিবিশেষের জীবনে বিভিন্ন পর্যায়ে, এমনকি একই পর্বে, বিরোধী অমূর্ত দুই ধারণাই ছায়া ফেলাটা বিচিত্র নয়। কিন্তু সনাতন ঐতিহ্য রক্ষা ও সংস্কার, হিন্দুত্বের গৌরব এবং ধর্মসমাজ-নিরপেক্ষ মানব-অধিকারের দাবি, ভক্তি আর যুক্তি—এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমন্বয় সহজ বুদ্ধির অগম্য।

অথচ ইতিহাস যেহেতু ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা, সেই কারণে সমাজে বিরোধী চিন্তার সন্ধান পেলে কিছু মূল্যবিচার অপরিহার্য হইয়া পড়ে। যা ঘটে সেটাই যথার্থ, সব কিছুরই সার্থকতা আছে, "তোমরা সবাই ভালো"—ইতিহাস অন্ততঃ এই পথে চলতে পারে না। পরস্পরবিরোধী ঝোঁককে উপহাস করা চলে না, বিভিন্ন ধারার ঐতিহাসিক স্বাভাবিক বাস্তব কারণ থাকে, প্রত্যেকের স্বরূপ অনুধাবন আবশ্যক। কিন্তু ইতিহাসের গতির দিক থেকে প্রভেদ নির্ণয়েরও প্রয়োজন আছে।

নিছক শিল্পসৃষ্টি এবং রাষ্ট্রিক আন্দোলনের প্রকৃত বিকাশকে আমরা এই আলোচনার বাইরে রেখেছি বলে সামাজিক আদর্শের সংঘাতটাই এখানে আমাদের বিচার্য। এক্ষেত্রে লেখকের মতামত এতক্ষণে পাঠকের কাছে নিশ্চয়ই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। বাংলার নব জাগরণের ইতিহাসে পশ্চিমী দৃষ্টিকে আমি প্রাচ্যাভিমানের উপরে স্থান দিই দুই কারণে। প্রথমতঃ, এই জাগরণের মূল প্রেরণা আসে নূতনের আগমনে; প্রাচীন রক্ষণশীলতা ঠিক তার আদি উৎস ছিল না, হওয়াটাও হত অস্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাতেই, "(পশ্চিমী) সংস্কৃতির সোনার কাঠি প্রথম যেই তাকে স্পর্শ করল অমনি বাংলাদেশ সচেতন হয়ে উঠল।" রেনেসাঁসের গঠনকার্যে প্রাচ্যাভিমানের দান অস্বীকার না করেও বলা চলে যে তার প্রাণসঞ্চার হয়েছিল পশ্চিমী চিন্তার আবাহনে। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের ভবিষ্যতের স্বপ্নে যে-ভারতবর্ষ বিরাজ করছে, তার বাহ্যিক আকার যেরূপই নিক না কেন, অন্তর্বস্তুটুকুকে পশ্চিমী না বলে উপায় নেই। যে সমাজবাদ আমাদের কাম্য

ন্যায্যত তার সঙ্গতি পাই প্রাচ্যাদর্শে নয়, পশ্চিমী দৃষ্টিরই মধ্যে, যে-পশ্চিমী সংস্কৃতি থেকে তার উদ্ভব ও পরিণতি।

॥ পাঁচ ॥

রবীন্দ্রনাথের মনে বাংলার নব-জাগৃতি কি ঢেউ তুলেছিল, পশ্চিমী প্রত্যয় ও প্রাচ্যাভিমান তাঁর লেখায় কিভাবে ঝংকার এনেছিল, এবার সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। এখানে রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি নিশ্চয় অন্যায় হবে না। তাঁর বক্তব্যের সরস স্বচ্ছতা, তাঁর অনুপম ভাষা আমাদের শক্তির নাগালের বাইরে। শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর নিজের বাণী শোনাটাও পরম লাভ। সকল উদ্ধৃতি সমস্ত পাঠকের কাছে সমান পরিচিত নাও হতে পারে।

বলা বাহুল্য, উক্তিগুলি সংগৃহীত হয়েছে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রামাণ্য সংস্করণ থেকে। লেখাগুলিকে সাজানো হয়েছে অনেকটা ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন: "যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সঙ্গত।" ('রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত'—১৯২৯)। তাছাড়া তারিখ অনুসারে সাজালে তাঁর চিন্তার ক্রমবিকাশের কিছুটা পরিচয় পাওয়াও অসম্ভব নয়। অবশ্য সংবেদনশীল কবির চিত্তে প্রায় একই সময়ে বিভিন্ন বিরোধী সুর ধ্বনিত হতে পারে। তবু পর্যাপ্ত সাক্ষ্যের সমাবেশে ভাবধারার স্তরভেদ ও পর্বান্তরের সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর।

সারা জীবন ধরে রবীন্দ্রনাথ বাংলার নব-জাগরণকে যে ভাবে দেখেছিলেন, ব্যাখ্যা করেছিলেন, বিচার করতে চেয়েছিলেন, আজকের দিনে সেটা নিশ্চয় আমদের শিক্ষণীয়। রচনাবলীর "অবতরণিকায়" তিনি স্বয়ং লিখে গেছেন: "আমাকে গ্রহণ করার দ্বারা দেশ যদি কোনো ভাবে নিজেকে লাভ না করে থাকে তবে আজকের এই উৎসব অর্থহীন।"

॥ ছয় ॥

আদি পর্বে, জীবনের প্রথম কুড়ি বছরে, রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন তার অধিকাংশই বর্জন করা হয়েছিল তাঁরই ইচ্ছানুসারে। বাংলার জাগরণ সম্বন্ধে সে-সময়ে তাঁর মনে বিশেষ সমস্যা উদয় না হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবু

যে-পরিবারে তিনি মানুষ, যে-পিতৃবিশ্বাসে তাঁর উত্তরাধিকার, তার মধ্যে একদিকে যেমন তীব্র পশ্চিমী ভাব ছিল অনুপস্থিত, অন্যদিকে তেমনি সেই ব্রাহ্ম আবহাওয়া দেশাচার ও প্রচলিত-সংস্কার-প্রীতি থেকে অনেকাংশে মুক্ত ছিল বলা যায়। 'এক-চোখো সংস্কার' প্রবন্ধে ১৮৮১ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : "যখন সমাজের কোন নিয়ম আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার সাহায্য না করিবে, তখন নিয়মরক্ষার জন্য যে সে নিয়ম রক্ষা করিতে হইবে তাহা নহে।—একদল লোক বিলাপ করিবেই।—সত্যযুগ কোন কালে বর্তমান ছিল না চিরকাল অতীত ছিল।"

প্রাচ্যাভিমানের প্রথম একটা ঢেউ রবীন্দ্রনাথের ১৮৮২-১৮৮৫ সালের লেখায় চোখে পড়ে। প্রাচ্যপ্রত্যয়ের একটা বড়ো উৎস ছিল ভারতে থিওসফি আন্দোলন, কলিকাতায় তার পত্তন হয় সম্ভবতঃ ১৮৮২ সালে। ঠাকুরবংশীয় তরুণদের উপর রাজনারায়ণ বসুর প্রভাবও কিছু সামান্য ছিল না।

'মেঘনাদবধ সমালোচনায়' (১৮৮২) রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনকে আক্রমণ করেন দেশের ঐতিহ্যকে অপমান করার জন্য। 'অনাবশ্যক' প্রবন্ধে (১৮৮৩) তিনি লিখলেন : "প্রত্যক্ষকে দেখিয়া অপ্রত্যক্ষকে মনে আনাই পৌত্তলিকতা। জগৎকে দেখিয়া জগতাতীতকে মনে আনা পৌত্তলিকতা।...অনেকগুলি অর্থহীন প্রথা পূর্বপুরুষদিগের ইতিহাস বলিয়াই মূল্যবান। তুমি যদি তাহার মূল্য দেখিতে না পাও, তাহা অকাতরে ফেলিয়া দাও, তবে তোমার শরীরে দয়া-ধর্ম কোনখানে থাকে তাহাই আমি ভাবি!...আমার অতীতের মধ্যে আমার কতকগুলি তীর্থস্থান প্রতিষ্ঠিত আছে, যখন বর্তমানে পাপে তাপে শোকে কাতর হইয়া পড়ি তখন সেই তীর্থস্থানে গমন করি।"

১৮৮৫ সালে 'রামমোহন রায়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মত প্রকাশ করেছিলেন যে রামমোহনের "প্রধান মহত্ত্ব" এই যে "তিনিই হিন্দুধর্মের জীবনরক্ষা করিলেন...যে বাঁধ নির্মাণ করিয়া দিলেন "খ্রীষ্টীয় বিপ্লব সেখানে আসিয়া প্রতিহত হইয়া গেল।" "ব্রহ্ম সমস্ত জগতের ঈশ্বর, কিন্তু তিনি বিশেষরূপে ভারতবর্ষেরই ব্রহ্ম।...ব্রহ্মই ভারতবর্ষের জাগ্রত দেবতা; জিহোভা, গড্ অথবা আল্লা আমাদের ভাবের সম্পূর্ণ গম্য নহেন।" এখানে ভারতের সঙ্গে হিন্দু ভারতের সমীকরণ লক্ষণীয়।

সেই বৎসরেই লেখা 'সমস্যা'তে আমরা পড়ি :

"বঙ্গসমাজের যে অংশে ইংরেজী সভ্যতার তাত লাগিতেছে সেখানটা

দেখিতে দেখিতে লাল হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু শ্যামল অংশটির সঙ্গে তাহার কিছুতেই বনিতেছে না।...সাম্প্রদায়িকতার অনুরোধে সামাজিক স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা অন্ধ গোঁড়ামির কার্য।...সকল অবস্থাতেই আইনপূর্বক বাল্যবিবাহ বন্ধ করিলে সমাজে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতে পারে।" একই প্রবন্ধে তিনি অবশ্য লিখেছিলেন যে "পরিবার-বিশেষে" বাল্যবিবাহের অবসান এবং বিধবা-বিবাহের প্রবর্তন কাম্য।

॥ সাত ॥

পরবর্তী ১৩ বৎসরে (১৮৮৬-১৮৯৮) যুবক রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় পশ্চিমী প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে প্রবলতর হয়ে উঠেছিল বললে বোধহয় অন্যায় হবে না।

১৮৮৪ সাল আন্দাজ শশধর তর্কচূড়ামণির আবির্ভাবে নব্য হিন্দুয়ানি মাথা তুলতে আরম্ভ করে। এই ঝোঁক যে রবীন্দ্রনাথের অসহ্য মনে হয়েছিল তার প্রমাণ তাঁর শ্লেষাত্মক রচনায় প্রচুর পাওয়া যায়। হাস্যকৌতুকের 'আর্য ও অনার্য' লেখা হয় ১৮৮৬ সালে; 'গুরুবাক্যের' তারিখ ১৮৮৭। ১৮৮৭ সালের 'চিঠিপত্রে' পাই: "আধুনিক বিজ্ঞানের সমুদয় সিদ্ধান্তই শাণ্ডিল্য-ভৃগু-গৌতমের জানা ছিল...আমাদের বৈদিক পৌরাণিক যুগ যে চলিয়া গেছে এ বড়ো দুঃখের বিষয়...।" ১৮৯১ সালের 'প্রত্নতত্ত্বে' পড়ি: "আমরা হিন্দু...পরের মতের উপর কোনো হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না। অতএব আমাদের সর্বপ্রধান যুক্তি বাপান্ত, অর্ধচন্দ্র এবং ধোপা-নাপিত-রোধ।" কবিতার মধ্যে সুপরিচিত 'কড়ি ও কোমলে'র 'পত্র' (১৮৮৬)—"ক্ষুদে ক্ষুদে আর্যগুলি ঘাসের মতো গজিয়ে ওঠে"; 'ধর্মপ্রচার' (১৮৮৮)—"হিন্দুধর্ম করিব রক্ষা, খৃষ্টানি হবে মাটি" ইত্যাদি।

অবশ্য এই বিদ্রূপের লক্ষ্য প্রাচ্যভাবের বিকৃতি মাত্র। কিন্তু খাঁটি প্রাচ্যাভিমানের পরিবর্তন-বিমুখিতার বিরুদ্ধেও রবীন্দ্রনাথ লেখনী ধরেছিলেন। ১৮৮৮ সালেরই কবিতা 'পরিত্যক্ত':

"বন্ধু, এ তব বিফল চেষ্টা,
আর কি ফিরিতে পারি?
শিখর গুহায় আর ফিরে যায়
নদীর প্রবল বারি?"

১৮৮৭ সালের 'চিঠিপত্র' এর উজ্জ্বল সাক্ষ্য:

"স্বদেশ যেমন একটা আছে, স্বকালও তেমনি একটা আছে।···সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে এবং হইয়াই থাকে। সেই পরিবর্তনের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। নহিলে আমাদের জীবনই নিষ্ফল।···আমরা গৃহের বাহির হইব। যে বন্ধনে আমরা সমস্ত মানবজাতির সহিত যুক্ত, সেই বন্ধনে আজ টান পড়িয়াছে।···এই নূতন জ্ঞান, এই নূতন প্রেম, এই নূতন জীবন—এই তো আনন্দ।···সহসা যখন নূতন ভাবের প্রবাহ উপস্থিত হইয়া জাতির হৃদয়ে আবর্ত রচনা করে···তখন যে কী হইতে কী হয় ঠাহর পাইবার জো নাই। অতএব আমবাগানে আমাদের সেই ক্ষুদ্র নীড়ের মধ্যে আর ফিরিব না" যুবকের চিঠির উত্তরে বৃদ্ধ ষষ্ঠীচরণ শেষপর্যন্ত লেখেন: "তোমরা নিঃসংশয়ে কাজ করো, নির্ভয়ে অগ্রসর হও।"

'হিন্দুবিবাহ' প্রবন্ধটি স্পষ্টোক্তিতে পরিপূর্ণ (১৮৮৭):

"চন্দ্রনাথ বাবু বলেন, হিন্দুবিবাহে যেরূপ একীকরণ দেখা যায় এরূপ অন্য কোনও জাতির বিবাহে দেখা যায় না।···তবে এদেশে বহুবিবাহ কিরূপে সম্ভব হইত।···বিবাহের যত কিছু আদর্শের উচ্চতা সে কেবলমাত্র পত্নীর বেলায়···বর্তমান সমাজের সুবিধা ও আবশ্যক অনুসারে হিন্দুবিবাহ সমালোচনা করিবার অধিকার আছে।···ইংরেজী আদর্শের প্রতি যদি কোনো কোনো শিক্ষিত লোকের পক্ষপাত দেখা যায়, তবে তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না। উহা অবশ্যম্ভাবী। ইংরেজী শিখিয়া যে কেবলমাত্র অন্নটুকু উপার্জন করিব তাহা হইতেই পারে না, ইংরেজী ভাব উপার্জন না করিয়া থাকিবার জো নাই। জলে প্রবেশ করিয়া মাছ ধরিতে গেলে ভিজিতেও হইবে।"

এর সমর্থনে 'মুসলমান মহিলা'-র (১৮৯১) উল্লেখ করা উচিত:

"একীকরণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যিনিই যত বড়ো কথা বলুন, মানুষের প্রতি মানুষের অধিকারের একটা সীমা আছে; পৃথিবীর প্রাচ্য প্রদেশে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকার সেই সীমা এতদূর অতিক্রম করিয়াছে যে, আধ্যাত্মিকতা দোহাই দিয়া কতকগুলা আগড়ম-বাগড়ম বকিয়া আমাদিগকে কেবল কথা ছলে লজ্জা নিবারণ করিতে হইতেছে।"

সেই বৎসরই লেখা হয় 'প্রাচ্যসমাজ' প্রবন্ধ:

"য়ুরোপে এসিয়ায় প্রধান প্রভেদ এই যে, য়ুরোপে মনুষ্যের একটা গৌরব আছে, এসিয়াতে তাহা নাই।···তাই সেখানে রাজার একাধিপত্য ভাঙিয়া আসে, পুরোহিতের দেবত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং গুরুবাক্যের

অভ্রান্তিকতার উপর স্বাধীন বুদ্ধি জয়লাভ করে।...যে সকল বৃহৎ দোষ স্বাধীন সমাজে থাকে তাহা তেমন ভয়াবহ নহে, স্বাধীনবুদ্ধিহীন অবরুদ্ধ সমাজে তিলমাত্র দোষ তদপেক্ষা সাংঘাতিক।"

'কর্মের উমেদার' (১৮৯২) প্রবন্ধে রয়েছে :

"আমরা কলের কাজ করিবার জন্য একেবারে কলে তৈয়ারি হইয়াছি। মনু পরাশর ভৃগু নারদ সকলে মিলিয়া আমাদের আত্মকর্তৃত্ব চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন...মাঝে ইংরেজী শিক্ষায় আমাদের মনে ঈষৎ চাঞ্চল্য আনয়ন করিয়াছিল। বহু দিবসের পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের মনে মুক্ত আকাশ এবং স্বাধীন নীড়ের কথা উদয় হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের জ্ঞানী লোকেরা সম্প্রতি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এরূপ চাঞ্চল্য পবিত্র হিন্দুদিগকে শোভা পায় না।"

সেই বৎসরে লেখা 'আদিম সম্বল'-এ আছে :

"মনুষ্যের সকল প্রকার স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া আমাদের সমাজের যে কী আশ্চর্য শৃঙ্খলা দাঁড়াইয়াছে এই কথা লইয়া যাঁহারা গৌরব করেন, তাঁহারা প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।...এখন কথা এই আমরা নব্য বাঙালীরা আপনাদিগকে পুরাতন জাতি না নূতন জাতি, কী হিসাবে দেখিব। যেমন চলিয়া আসিতেছে তাই চলিতে দিব, না, জীবনলীলা আর একবার পাল্‌টাইয়া আরম্ভ করিব ?...যদি একটা জাতি বাঁধিতে চাই তবে যে সকল প্রাচীন আরাধ্য প্রস্তর আমাদের মনুষ্যত্বের উপর চাপিয়া বসিয়া তাহার সমস্ত বল ও স্বাধীন পুরুষকার নিষ্পেষিত করিয়া দিতেছে, তাহাদিগকে যথাযোগ্য ভক্তি ও বিচ্ছেদ-বেদনা সহকারে বিসর্জন দেওয়া আবশ্যক।"

'আচারের অত্যাচার' (১৮৯২) থেকে আসছে এই উদ্ধৃতি :

"হিন্দুর দেবতা, এই কি তোমার বিধান যে, আমরা কেবলমাত্র 'হিঁদু' হইব, মানুষ হইব না।...আমাদের দেশেও হইয়াছে তাই। বিধিব্যবস্থা-আচার-বিচারের প্রতি অত্যধিক মনোযোগ করিতে গিয়া মনুষ্যত্বের স্বাধীন উচ্চ অঙ্গের প্রতি অবহেলা করা হইয়াছে।"

'সমুদ্রযাত্রা' (১৮৯৩) একটি উল্লেখযোগ্য রচনা :

"স্পষ্ট মানিতে হয়, শাস্ত্রশাসন সকল-কালে সকল স্থানে খাটে না।...লোকাচার যদি অভ্রান্ত হইত, তবে পৃথিবীতে এত বিপ্লব ঘটিত না। ...আমাদের কি নিজের কোনো শক্তি নাই। আমাদের সমাজে যদি কোনো দোষের সঞ্চার হয়...তবে তাহা দূর করিতে গেলে কি আমাদিগকে খুঁজিয়া

বাহির করিতে হইবে, বহু প্রাচীনকালে তাহার কোনো নিষেধ-বিধি ছিল কি না।…দোষও কি প্রাচীন হইলে পূজ্য হয়।…আমাদের জীবন্ত মনুষ্যত্বের উপরে নিয়মের পর নিয়ম পাষাণ ইষ্টকের ন্যায় স্তরে স্তরে গাঁথিয়া তুলিয়া একটি দেশব্যাপী অপূর্ব প্রকাণ্ড কারাপুরী নির্মাণ করা হইয়াছে।…মানসিক আন্দোলনই হিন্দুসমাজের পক্ষে সর্বাপেক্ষা আশঙ্কার কারণ।…নূতন জ্ঞান, নূতন আদর্শ, নূতন সন্দেহ, নূতন বিশ্বাস জাহাজ-বোঝাই হইয়া এদেশে আসিয়া পৌছিতেছে। …ইংরেজী-শিক্ষাতে কেবলমাত্র যতটুকু কেরানীগিরির সহায়তা করিবে ততটুকু আমরা গ্রহণ করিব, বাকিটুকু আমাদের অন্তরে প্রবেশ লাভ করিবে না। এও কি কখনও সম্ভব হয়।"

১৮৯৩ সালে লেখা 'পঞ্চভূতের ডায়ারি'তে পড়া যায় :

"জড়ের নিকট হইতে পলায়ন পূর্বক তপোবনে মনুষ্যত্বের মুক্তিসাধন না করিয়া জড়কেই ক্রীতদাস করিয়া ভৃত্যশালায় পুষিয়া রাখিলে এবং মনুষ্যকেই এই প্রকৃতির প্রাসাদে রাজা রূপে অভিষিক্ত করিলে আর তো মানুষের অবমাননা থাকে না।" অন্যত্র : "যাহারা মনুষ্য প্রকৃতিকে ক্ষুদ্র ঐক্য হইতে মুক্তি দিয়া বিপুল বিস্তারের দিকে লইয়া যায় তাহারা অনেক অশান্তি অনেক বিঘ্নবিপদ সহ্য করে, বিপ্লবের রণক্ষেত্রের মধ্যে তাহাদিগকে অশ্রান্ত সংগ্রাম করিতে হয়—কিন্তু তাহারাই পৃথিবীর মধ্যে বীর এবং তাহারা যুদ্ধে পতিত হইলেও অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে।"

'বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য' লেখা হয় ১৮৯৪ সালে :

"হিন্দুর পবিত্র নিমতলায় ম্লেচ্ছদেহ দগ্ধ হয় (ভারতহিতৈষী হ্যামারগ্রেন সাহেবের) ইহাতে কোনো কোনো হিন্দুপত্রিকা গাত্রদাহ প্রকাশ করিতেছেন।…এই অমানুষিক মানবঘৃণাই কি আমাদের পক্ষে অক্ষয় কলঙ্কের কারণ নহে, অবশেষে আমাদের শ্মশানও কি আমাদের গৃহের ন্যায় বিদেশীর নিকটে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিব।"

বাংলার নব-জাগরণের ইতিহাসে বিদ্যাসাগর অবিস্মরণীয়। তিনি যে মনেপ্রাণে পশ্চিমী ভাবাপন্ন ছিলেন, একথা অস্বীকার করা শক্ত। অথচ বাহিরের দিকে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী। ইংরেজী পোশাক, খাবার, সাহেবী ধরনে চলাফেরা, ব্যবহারিক জীবনে বিদেশীপনা, ইংরেজীতে চিঠি লেখা কিংবা সেই মাধ্যমে শিক্ষালাভ—বহিরঙ্গ এই চিহ্নগুলি যে পশ্চিমী দৃষ্টির আসল পরিচায়ক নয়, এই সত্যটাই বিদ্যাসাগরে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ('বিদ্যাসাগর-চরিত', ১৮৯৫): "পল্লী-আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালীজীবনের জড়ত্ব, সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতিপ্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে, করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে (তিনি) আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন…বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন…তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে নির্বাসন-ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না। …এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্‌কার ছিল। কারণ তিনি সর্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন।"

এরই আগের বৎসর রামমোহনকে নূতন ভাবধারার প্রবর্তক হিসাবে অভিনন্দিত করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ('বঙ্কিমচন্দ্র', ১৮৯৪):

"বঙ্গদেশ আজ সেই রামমোহন রায়ের নিকট কিছুতেই হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে চাহে না।"

এই সময়ের দু-একটি কবিতার উল্লেখ করা যায়। যেমন—'দুই উপমা' (১৮৯৬):

"যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।…
যে জাতি চলে না কভু, তারি পথ 'পরে
তন্ত্র-মন্ত্র সংহিতায় চরণ না সরে।"

অথবা—'সতী' (১৮৯৭):

"যবন ব্রাহ্মণ
সে ভেদ কাহার ভেদ? ধর্মের সে নয়।
অন্তরের অন্তর্যামী যেথা জেগে রয়
সেথায় সমান দোঁহে।"

১৮৯৮ সালের দুটি উদ্ধৃতি দিয়ে এই পর্যায় শেষ করব:

"এক্ষণে যদি ভারতবর্ষীয় জাতি বলিয়া একটা জাতি দাঁড়াইয়া যায়, তবে তাহা কোনো মতেই মুসলমানকে বাদ দিয়া হইবে না।" ('কোট বা চাপকান')

"ভক্তি করাকেই আমরা ধর্মাচরণ বলিয়া থাকি; কাহাকে ভক্তি করি তাহা বিচার করা আমাদের পক্ষে বাহুল্য।" ('অযোগ্য ভক্তি')

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা যাকে পশ্চিমী দৃষ্টি বলেছি তার এই ধরনের প্রকাশ সম্বন্ধে কথা উঠতে পারে যে একে পশ্চিমী বলবার সার্থকতা কি? এ-জাতীয় স্বর কি আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যে পাওয়া যায় না? কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে উনিশ শতকে সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্কারের সমালোচনার আসল প্রেরণা ও প্রবৃত্তি আসছিল পশ্চিমী ভাবাদর্শ থেকেই, দেশাভিমান থেকে নয়। প্রাচ্যপ্রীতির স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল বরঞ্চ গোটা ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরা বিচারবুদ্ধি অনুসারে তাকে গ্রহণ বর্জন না করে। সেই বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের প্রবক্তাই ছিলেন যুগপ্রবর্তক রামমোহন। সমন্বয়-সাধন অপেক্ষা এটাই তাঁর প্রকৃত অবদান।

॥ আট ॥

ইতিমধ্যে দেশে শুরু হয়েছিল হাওয়া-বদল, এক্স্‌ট্রিমিজম্‌-এর তরঙ্গ দেশ-মানসে আছড়ে পড়ছিল। রবীন্দ্রনাথের উপর তার প্রবল প্রভাবের নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে ১৮৯৮ থেকে ১৯০৬ সালের প্রৌঢ় বয়সের রচনায়।

জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতিতে এক্স্‌ট্রিমিজম্‌-এর দান অসামান্য একথা বলা বাহুল্য। কিন্তু ইতিহাসে অগ্রগামী আন্দোলনেও অন্তর্বিরোধ থাকে। তার মধ্যে যদি পিছনের টান বলে কোনো কিছুকে স্বীকার করতে হয়, তবে সেই টান সাময়িক সাফল্যের হেতু হলেও পরের দিনে দৌর্বল্য ও অবসাদের সোপান হয়ে ওঠাটাও বিচিত্র নয়। স্বদেশী যুগের (১৯০৫ এর বেশ কিছু আগে থাকতেই তার সূচনা) বিরাট ঐতিহাসিক রাষ্ট্রিক জাগরণের মধ্যে প্রাচ্যাভিমানের একটা প্রবল উত্তাপ লক্ষণীয়। নিঃসন্দেহে তখনকার জাগরণে এটা একটা বাস্তব চালকশক্তি ছিল। প্রাচ্যাভিমানের দুর্বলতাটুকুও তার মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল বললে অন্যায় হবে না, ভবিষ্যতে সে তার প্রাপ্য মূল্য আদায় করে নিতে ছাড়ে নি।

রবীন্দ্রনাথের মনে একটা অশান্তি এই পর্ব আরম্ভ হবার আগে থাকতেই দেখা যায়। আত্মশক্তি আবাহনের কথা বলছি না, রবীন্দ্রনাথের লেখায় আগাগোড়া সে-ভাব বিদ্যমান, সেখানে পর্যায়ভেদের কথা ওঠে না। ১৮৯৭ সালে কবিতায় আহত মন ছায়া ফেলেছে দেখি:

"যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে,
হে মোর স্বদেশ,
মোরা তারি কাছে ফিরি সম্মানের তরে
পরি তার বেশ।"

"ক্ষণেক স্নেহকোল ছাড়ি
চিনিতে আর নাহি পারি।
আপন সন্তান
করিছে অপমান—
সে যে আমার জননী রে!"

আন্তরিক অনুভূতি থেকে বিশ্বাসের দিকে যাত্রা বোধহয় অস্বাভাবিক নয়। তারই নিদর্শন এখানে :

"জগতে হিন্দুজাতি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। ইহাকে বিশেষ জাতি হিসাবে গণ্য করা যায় এবং যায়ও না।…য়ুরোপে জাতিগত উপাদানে রাজনৈতিক ঐক্যই সর্বপ্রধান। হিন্দুদের মধ্যে সেটা কোনো কালেই ছিল না বলিয়া যে জাতিবদ্ধ নহে, সে কথা ঠিক নহে।" ('প্রসঙ্গ-কথা' ২-১৮৯৮)

১৯০১ সালের 'নৈবেদ্য'তে আগের মতোই "তুচ্ছ আচার", "নিরর্থ আচার" -এর প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু সেই বৎসরেই 'ব্যাধি ও প্রতিকারে' চোখে পড়বে :

"আমাদের মধ্যে একটা দ্বিধা জন্মিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং আধুনিক সভ্য জগতের চৌমাথার মোড়ে আমরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছি।…মনে করিয়াছিলাম এই পাশ্চাত্ত্যমন্ত্র গ্রহণ করিলেই আর জেতা-বিজেতার ভেদ থাকিবে না…ভেদ সমানই রহিয়া গেল। এখন মনে মনে ধিক্কার জন্মিতেছে; ভাবিতেছি কিসের জন্য…ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শটিকে যদি আমরা বরণ করিয়া লই, তবে আমরা ভারতবর্ষীয় থাকিয়াও নিজেদের নানা কাল নানা অবস্থার উপযোগী করিতে পারিব।"

অবশ্য আসল সমস্যা এইখানেই। চিরন্তন আদর্শকে আঁকড়ে থাকলে যুগোপযোগী হওয়া সম্ভব কি? নূতন আদর্শকে দেশের অবস্থার সঙ্গে খানিকটা খাপ খাওয়ানোটাই কি শ্রেয়স্কর পথ নয়?

১৯০১ সালেই লেখা হয় 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা' :

"আমরা স্বাধীন হই বা পরাধীন থাকি, হিন্দুসভ্যতাকে সমাজের ভিতর হইতে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি এ আশা ত্যাগ করিবার নহে। ...আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ, কিছুই নেশন-গঠনের প্রাধান্য স্বীকার করে না।"

১৯০১ সালের অন্যান্য লেখাতেও প্রাচ্যপ্রত্যয় প্রকাশ পেল :

"বিধবাবিবাহের নিষেধ এবং বাল্যবিবাহের বিধি অন্যদিকে ক্ষতিকর হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুর সমাজসংস্থান যে ব্যক্তি বোঝে সে ইহাকে বর্বরতা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে না।" ('সমাজভেদ')

"অন্য নেশনকে ক্ষুদ্র করিতে হইবে, ইহা নেশনের ধর্ম, ইহা পেট্রিয়টিজমের প্রধান অবলম্বন।...সমাজের পক্ষে উদারতা সহজ।...সামাজিক উন্নতিতে মানুষের চারিত্রগত উন্নতি হয়—সে উন্নতিতে কাহারও সহিত স্বার্থের বিরোধ ঘটে না।" ('বিরোধ-মূলক আদর্শ')

"সমাজের সচেষ্ট স্বাধীনতা অন্য সকল স্বাধীনতা হইতেই বড়ো।" "ব্রহ্মের মধ্যে মানবসমাজকে নিরীক্ষণ করা, ইহাই হিন্দুত্ব।" "বিপুল হিন্দু-সভ্যতাকে পুনর্বার প্রাপ্ত হইব।" ('ভারতবর্ষীয় সমাজ')

১৯০১ সালে 'নেশন কি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতকে সূত্রাকারে উপস্থিত করা চলে : নেশন=প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ+বর্তমান পারস্পরিক সম্মতি, অথবা অতীত গৌরব+বর্তমান এক ইচ্ছা। কিন্তু সব নেশনের মূল্যবান অতীত তো নাও থাকতে পারে, অতীতে অগৌরবও অসম্ভব নয়। ভবিষ্যতে পুনর্গঠনের স্বপ্নটুকু এখানে বাদ পড়েছে।

প্রাচ্যাভিমান প্রবলতর হয়ে উঠল ১৯০২ সালে :

"মন্ত্রতন্ত্রকে অত্যন্ত সরল ও সহজ করিয়া কাজকে সকলের আয়ত্ত করা, অন্নকে সকলের পক্ষে সুলভ করা প্রাচ্য আদর্শ।...পৃথিবীতে অবস্থার অসাম্য থাকিবেই...সমাজের এই অধিকাংশকেই অমর্যাদার লজ্জা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষ যে উপায় বাহির করিয়াছে তাহারই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হইবে। য়ুরোপ এই কথা বলেন যে, সকল মানুষেরই সব হইবার অধিকার আছে—এই ধারণাতেই মানুষের গৌরব। কিন্তু বস্তুতই সকলের সব হইবার অধিকার নাই, এই অতি সত্য কথাটি সবিনয়ে গোড়াতেই মানিয়া লওয়া ভালো। আমরা যাহারা ইংরেজী বলিতেছি, অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন করিতেছি, আমরা বর্ষে বর্ষে 'মিলি মিলি যাওব সাগর-

লহরী-সমানা।' তাহাতে নিস্তব্ধ সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না।" ('নববর্ষ')

"অর্থনীতিশাস্ত্র আর সব জায়গাতেই খাটে কেবল ভারতবর্ষেই তাহা উলট-পালট হইয়া যায়।" ('বারোয়ারি-মঙ্গল')

এর মূল স্বরটি একেবারে স্লাভোফিল।

"ইংরাজের পক্ষে তাঁহার প্রেস্টিজ যেরূপ মূল্যবান ব্রাহ্মণের পক্ষেও তাঁহার নিজের প্রেস্টিজ সেইরূপ।—আমাদের দেশে সমাজ যেভাবে গঠিত, তাহাতে সমাজের পক্ষেও ইহার আবশ্যক আছে।...ধর্ম এবং জ্ঞানার্জন, যুদ্ধ এবং রাজকার্য, বাণিজ্য এবং শিল্পচর্চা সমাজের এই তিন অত্যাবশ্যক কর্ম। ইহার কোনোটাকেই পরিত্যাগ করা যায় না। ইহার প্রত্যেকটিকেই ধর্মগৌরব কুলগৌরব দান করিয়া সম্প্রদায়বিশেষের হস্তে সমর্পণ করিলে তাহাদিগকে সীমাবদ্ধও করা হয়, অথচ বিশেষ উৎকর্ষ সাধনেরও অবসর দেওয়া হয়।...এই-জন্যই ভারতবর্ষে কর্মভেদ বিশেষ বিশেষ জনশ্রেণীতে নির্দিষ্ট করা।...অতীতের রসে হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে হইবে।...আজ যদি আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে জাগিয়া থাকে, তবে তো আমাদের আনন্দের দিন।" ('ব্রাহ্মণ', ১৯০২)

'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে (১৯০২) প্রশ্ন আছে, "কারুখচিত কবরচূড়া" অথবা "মসজিদের পাষাণমণ্ডপ" ইত্যাদিকে "ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিয়া লাভ কি?" সেই বৎসরেরই 'অত্যুক্তি'তে রয়েছে: "অনেকদিন ধরিয়া চোখ বুজিয়া আমরা বিলাতী সভ্যতার হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম। আজ হঠাৎ চমক ভাঙিবার সময় আসিয়াছে।"

মহর্ষি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন: "পিতৃদেব সার্বভৌমিক ধর্মের স্বদেশীয় প্রকৃতিকে একটা বিমিশ্রিত একাকারত্বের মধ্যে বিসর্জন দিতে অস্বীকার করিলেন।" ('মহর্ষির জন্মোৎসব', ১৯০৪) সেই যুগেরই লেখা 'মা ভৈঃ' প্রবন্ধে কবি প্রণাম নিবেদন করলেন "বাংলার সেই প্রাণবিসর্জনপরায়ণা পিতামহীকে" যিনি "সহজে বধূবেশে সীমন্তে মঙ্গলসিন্দুর পরিয়া পতির চিতায় আরোহণ" করতেন। (১৯০২)

সুবিখ্যাত 'স্বদেশী সমাজ' লেখা হয় ১৯০৪ সালে। এর মধ্যকার আত্ম-শক্তির আবাহন আমাদের ইতিহাসে উজ্জ্বল। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করব স্টেট থেকে সমাজের পৃথকীকরণটাকে। বিদেশী শাসকের সঙ্গে

দেশী সমাজের অসহযোগের ধারণাটা নিশ্চয়ই অগ্রগতির সহায়ক, কিন্তু এখানে সমাজ যদি ধর্মনিরপেক্ষ সকল দেশবাসীর সংগঠন না হয়ে প্রতিষ্ঠিত ধর্মাশ্রয়ী অতীত সমাজকে বোঝায় তবে ততদূর পর্যন্ত তাকে হিন্দুত্বের দিকে পিছনের টান বলেই স্বীকার করতে হবে। তার ঐতিহাসিক কারণ ছিল, কিন্তু তাছাড়াও তাতে ছিল ভবিষ্যতের বিঘ্ন। নিচের উদ্ধৃতিগুলি লক্ষণীয় :

"সামাজিক প্রথাকেও ইংরেজের আইনের দ্বারাই আমরা অপরিবর্তনীয়-রূপে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিতে দিয়াছি (পৃথিবীতে) চারি প্রধান ধর্মকে আশ্রয় করিয়া চার বৃহৎ সমাজ আছে।...হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না—এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না, তাহা বিশেষভাবে হিন্দু।"

একমাস পরে লেখা 'স্বদেশী সমাজের পরিশিষ্ট' থেকে :

"কোনো কোনো সামাজিক প্রথাকে অনিষ্টকর জ্ঞান করিয়া আমরা ইংরেজের আইনকে ঘাঁটাইয়া তুলিয়াছি...যেদিন কোনো পরিবারে সন্তানদিগকে চালনা করিবার জন্য পুলিসম্যান ডাকিতে হয়, সেদিন আর পরিবার-রক্ষার চেষ্টা কেন! ..খ্রীস্টান সমাজ আমাদের সমাজের ভিতের উপর বন্যার মতো ধাক্কা দিতেছে।...মনই সমাজের মস্তিষ্ক; বিদেশী প্রভাবের হাতে সে যদি আত্মসমর্পণ করে তবে সমাজ আর আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবে কি করিয়া ?...বিলাতী সভ্যতার প্রভাবকে রোগের সঙ্গে তুলনা করিলাম বলিয়া মার্জনা প্রার্থনা করি।" পরে আছে যে পরকে আপন করা একাকার করা নয়, "পরন্তু পরস্পরের অধিকার সুস্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া।"

'সফলতার সদুপায়' লেখা হল ১৯০৫ সালে ঝড় ফেটে পড়ার ঠিক প্রাক্কালে :

"যে পর্যন্ত না আমাদের নানা জাতির মধ্যে ঐক্যসাধনের শক্তি যথার্থভাবে স্থায়িভাবে উদ্ভূত হয় সে পর্যন্ত ইংরেজের রাজত্ব আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, কিন্তু পরদিনেই আর নহে।" এখানে "জাতি" নিশ্চয় ধর্মাশ্রয়ী সমাজের সূচক। সেই জন্যই 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধে (১৯০৫) প্রস্তাব করা হয় যে যে-কর্তৃসভার হাতে দেশের কর্মশক্তিকে সংগঠিত করতে হবে তার অধিনায়ক থাকুক একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান। কিন্তু এই পথে চললে দেশকে কল্পনা করতে হয় ধর্মসমাজের ফেডারেশন হিসাবে।

বিদেশী শাসনের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ পায় এই সময়কার 'দেশীয় রাজ্য' প্রবন্ধতেও (১৯০৫) :

"আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলি পিছাইয়া পড়িয়া থাকুক আর যাহাই হউক, এইখানেই স্বদেশের যথার্থ স্বরূপকে আমরা দেখিতে চাই।"

১৯০৫-১৯০৬ সালে বাংলা দেশে যে আলোড়ন হয়, ঐতিহাসিক সেই অভিযানে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একেবারে সামনে। স্বভাবতই সেই উন্মাদনাময় দিনগুলিতে ঝোঁক পড়েছিল সমবেত সংগ্রামের উপর, আদর্শ আলোচনার ও তর্কবিতর্কের সময় তখন নয়। সেদিনের আবেগ কবি লিপিবদ্ধ করেছিলেন 'বিজয়া সম্মিলনে' (১৯০৫) :

"যদি বিদ্যুৎ চকিত হইয়া থাকে, বজ্র ধ্বনিত হইয়া উঠে, তবে তোমরা ফিরিয়ো না, ফিরিয়ো না…যে চাষী চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো…অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো।"

এ তো সম্মিলিত যুদ্ধযাত্রার আহ্বান, কিন্তু এর মধ্যে দেশগঠনের আদর্শ, প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্ত্য, এবং বিভিন্ন আদর্শের মূল্যবিচার নেই, থাকার কথাও নয়। কিন্তু স্বদেশী অভ্যুত্থানের প্রাথমিক চিন্তার পর্বে রবীন্দ্রনাথ যে প্রাচ্যাভিমানের আকর্ষণ তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন তার প্রমাণ রইল উপরের উদ্ধৃতিগুলিতে।

॥ নয় ॥

১৯০৭ থেকে রবীন্দ্রনাথের লেখায় আর একটা মোড় ফিরবার নিদর্শন পাওয়া যাবে। এর পর দশ বৎসর ধরে বন্যার মতো যে-রচনাস্রোত দেশকে প্লাবিত করে তা হল পরিণত রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। তার মধ্যে প্রাচ্যাভিমান থেকে যে-দিকে তাঁর মুখ ফিরেছে, সে হল হিন্দুত্ব নয়, নূতন ভারতবর্ষের স্বপ্ন, যাকে আমাদের বিশ্লেষণে পশ্চিমী দৃষ্টি ছাড়া অন্য আখ্যা দেওয়ার উপায় নেই।

'গীতাঞ্জলির' তিনটি সুপরিচিত কবিতায় এই সুরই ধ্বনিত হয়েছে: "হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে", "যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন", আর "হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান"। ১৯১০ সালে পর পর তিন দিন এই কবিতা তিনটি লেখা হয়। এর আগের

পর্বেই (১৯০৬) 'রাজভক্তি' প্রবন্ধে এর পূর্বাভাস পাওয়া যাবে : "হে আমার স্বদেশ,...তোমার...আসনের সম্মুখে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বৌদ্ধ বিধাতার আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া বহুদিন হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে।" এই প্রতীক্ষা ভবিষ্যতের নূতন ভারতের প্রতীক্ষা, অতীতের আবাহন নয়।

স্বদেশী আন্দোলন থেকে রবীন্দ্রনাথের অপসরণ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, এখানে সে-তর্কে নামবার প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু আমার মনে হয় এর মধ্যে একটা প্রবল ঝোঁক ছিল প্রাচ্যাভিমান থেকে পশ্চিমী দৃষ্টির দিকে প্রত্যাবর্তনের। স্বদেশী আন্দোলনের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি হয়তো বা অবিচার করেছিলেন, কিন্তু পোলিটিকাল অভিযান তাঁর নিজের কাজ ছিল না, তিনি স্বভাবতঃই বিচরণ করতেন ভাবনা ও আদর্শের ক্ষেত্রে। স্বদেশের মুক্তিসংগ্রামে তিনি পরেও যে উদাসীন ছিলেন না তার প্রমাণ পাব্না কনফারেন্সে অভিভাষণ (১৯০৮) কংগ্রেসে প্রকাশ্য বক্তৃতা (১৯১৭), নাইট্হুড ত্যাগ (১৯১৯), হিজলি বন্দীহত্যার প্রতিবাদ (১৯৩১) ইত্যাদি। আসল কথা, স্বদেশী উত্তাল অভ্যুদয়ের মুহূর্তের পর রবীন্দ্রনাথের মনে হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না যে পোলিটিকাল এজিটেশন তাঁর কর্মক্ষেত্র নয়। সেই সঙ্গে প্রাচ্যাভিমানের সীমাবদ্ধতা উত্তরোত্তর তাঁকে পীড়া দিতে থাকে, তিনি মুক্তি খোঁজেন পশ্চিমী দৃষ্টির আলোতে।

মুক্তির পরিচয় নিয়ে এল তাঁর অমর উপন্যাস 'গোরা' (১৯০৭-১৯০৯)—সাহিত্যসৃষ্টিতে সমসাময়িক সমস্যার ঘাত-প্রতিঘাতের চিত্র হিসাবে যার উৎকর্ষ এ দেশে আজও অতুলনীয় হয়ে রয়েছে। 'গোরা'র পাতা ওলটাতে ওলটাতে আমরা পড়ি :

"জাত নিয়ে কেউ পৃথিবীতে জন্মায় না।...মেয়েরা প্রচ্ছন্ন থাকাতে আমাদের স্বদেশ আমাদের কাছে অর্ধসত্য হয়ে আছে...যে দিন চলে গেছে সেই দিনে কি কখনো ফিরে যাওয়া যায়? বর্তমানে যা সম্ভব তাই আমাদের সাধনার বিষয়...মানুষের প্রতি মানুষের এমন অপমান এবং ঘৃণা যে জাতিভেদে জন্মায় সেটাকে অধর্ম না বলে কি বলব?...সমাজ যদি কালের গতিকে বাধা দেয় তা হলে সমাজকে যে আঘাত পেতেই হবে। ...সত্যের পরীক্ষা যে কোনো এক প্রাচীনকালে একদল মনীষীর কাছে একবার হয়ে গিয়ে চিরকালের মতো চুকে বুকে যায় তা নয়...(আমাদের) সমাজ সমস্ত মানুষের সমাজ নয়—দৈববশে যারা হিন্দু হয়ে জন্মাবে এ সমাজ কেবলমাত্র তাদের।"

যাঁদের মনে হবে এ সব কথা তো স্বতঃসিদ্ধ তাঁদের প্রতি জিজ্ঞাসা এটিই যে, নিজের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতায় আজকের দিনেও তাঁরা কার্যতঃ এই সব মেনে চলেন কি না? না, রবীন্দ্রনাথেরই আর এক উক্তি আজও সত্য—"আমাদের দেশে এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যহই দেখা যায়, মানুষ একটা জিনিসকে ভালো বলিয়া স্বীকার করিতে অনায়াসে পারে অথচ সেই মুহূর্তেই অম্লান বদনে বলিতে পারে 'সামাজিক ব্যবহারে ইহা আমি পালন করিতে পারিব না'।" ('শিক্ষাবিধি'—১৯১২)

উপন্যাসের নায়ক গোরা প্রচণ্ড প্রাচ্যাভিমানী, কিন্তু "পল্লীর মধ্যে··· নিশ্চেষ্টতার মধ্যে গোরা স্বদেশের গভীরতর দুর্বলতার যে মূর্তি তাহাই একেবারে অনাবৃত দেখিতে পাইল।" উপন্যাসের শেষে গোরার উক্তি অবিস্মরণীয়: "আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।···সমস্ত কারুকার্য বানাবার বৃথা চেষ্টা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আমি বেঁচে গেছি।"

১৯০৮ সালের 'পূর্ব ও পশ্চিম' এরই প্রতিধ্বনি করেছে: "অতীতের সেই পর্বেই কি ভারতবর্ষের ইতিহাস দাড়ি টানিতে পারিয়াছে। বিধাতা কি তাহাকে এ কথা বলিতে দিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস হিন্দুর ইতিহাস।" এই প্রবন্ধে রামমোহনের ভূমিকায় পূর্ণ উপলব্ধি লক্ষণীয়: "রামমোহন রায়··· মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপর ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একদিন একাকী দাঁড়াইয়া ছিলেন। কোনো প্রথা কোনো সংস্কার তাঁহার দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই।"

বাংলা দেশে পশ্চিমী হাওয়াকে স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে (১৯০৭) লিখলেন: "য়ুরোপ হইতে একটা ভাবের প্রবাহ আসিয়াছে এবং স্বভাবতই তাহা আমাদের মনকে আঘাত করিতেছে। এইরূপ ঘাত প্রতিঘাতে আমাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, সে কথা অস্বীকার করিলে নিজের চিত্তবৃত্তির উপর অন্যায় অপবাদ দেওয়া হইবে।" এই প্রসঙ্গে তিনি মধুসূদনকে প্রাপ্য সম্মান দিলেন এই বলে: "মেঘনাদবধ কাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নয়, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই।···ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে।"

১৯০৭ সালের 'বাস্তব' প্রবন্ধে লেখা আছে :

"বর্তমান সময়ে কতকগুলি বিশেষ কারণে হিন্দু আপনার হিন্দুত্ব লইয়া ভয়ংকর রুখিয়া উঠিয়াছে। বিশ্বরচনায় এই হিন্দুত্বই বিধাতার চরম কীর্তি এবং এই সৃষ্টিতেই তাঁহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করিয়া আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, এইটে আমাদের বুলি।...বঙ্কিমকে আমরা ভালো বলি, কেন না স্বামীর প্রতি হিন্দু রমনীর যেরূপ মনোভাব হিন্দুশাস্ত্রসম্মত তাহা তাঁহার নায়িকাদের মধ্যে দেখা যায়।"

১৯০৮ সালের লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া গেল :

"চাকরি ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশী পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। এইরূপে আমাদের মধ্যে একটা পার্থক্য ঘটিয়াছে। এইটুকু কোনোমতে না মিটিয়া গেলে আমাদের ঠিক মনের মিলন হইবে না...যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্ন মনে প্রার্থনা করি।...ভারতবর্ষের এই দুই প্রধান ভাগকে এক রাষ্ট্রসম্মিলনের মধ্যে বাঁধিবার জন্য যে-ত্যাগ, যে-সহিষ্ণুতা, যে-সতর্কতা ও আত্মদমন আবশ্যক তাহা আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে।...জনসমাজের সহিত শিক্ষিত সমাজের নানা প্রকারেই বিচ্ছেদ ঘটাতে জাতির ঐক্যবোধ সত্য হইয়া উঠিতেছে না।" ('পাবনা অভিভাষণ')

"আমাদের দেশেও একটু নাড়া দিলেই হিন্দুতে মুসলমানে, উচ্চবর্ণে নিম্নবর্ণে সংঘাত বাধিয়া যায় না কি?...একত্র সংগঠনমূলক সহস্রবিধ সৃজনের কাজে ভৌগোলিক ভূখণ্ডকে স্বদেশরূপে স্বহস্তে গড়িতে ও বিযুক্ত জনসমূহকে স্বজাতিরূপে স্ব চেষ্টায় রচনা করিয়া লইতে হইবে। ...কর্মক্ষেত্রকে সর্বত্র বিস্তৃত করো, এমন উদার করিয়া এত দূর বিস্তৃত করো, যে, দেশের উচ্চ ও নীচ, হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান, সকলেই সেখানে সমবেত হইয়া হৃদয়ের সহিত হৃদয়, চেষ্টার সহিত চেষ্টা সম্মিলিত করিতে পারে।" ('পথ ও পাথেয়')

"ব্যবস্থাবদ্ধ ভাবে একত্রে অবস্থানমাত্র মিলনের নেতিবাচক অবস্থা, ইতিবাচক নহে। তাহাতে মানুষ আরাম পাইতে পারে, কিন্তু শক্তি পাইতে পারে না।...যখন একই সরস অনুভূতির নাড়িজাল সমগ্রের মধ্যে প্রাণের চৈতন্যকে ব্যাপ্ত করিয়া দিবে তখনই জানিব মহাজাতি দেহধারণ করিয়াছে।... যে দেশে একটি মহাজাতি বাঁধিয়া ওঠে নাই সে দেশে স্বাধীনতা হইতেই

পারে না। কারণ, স্বাধীনতার 'স্ব' জিনিসটা কোথায়?...সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাধারণ আত্মীয়তার যে বৃহৎ সম্বন্ধ তাহাকে স্বকীয় করিবার সম্বল আমরা কিছুই উদ্বৃত্ত রাখি নাই। সেই কারণে আমরা দ্বীপপুঞ্জের মতোই খণ্ড খণ্ড হইয়া আছি, মহাদেশের মতো ব্যাপ্ত বিস্তৃত ও এক হইয়া উঠিতে পারি নাই।...ভারতবর্ষে এবার মানুষের দিকে মানুষের টান পড়িয়াছে।" ('সমস্যা')

(স্বদেশী উপলক্ষে) "আমরা দেশের নিম্নশ্রেণীর প্রজাগণের ইচ্ছা ও সুবিধাকে দলন করিবার আয়োজন করিয়াছিলাম।...ময়মনসিং প্রভৃতি স্থানে আমাদের বক্তারা যখন মুসলমান কৃষিসম্প্রদায়ের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন নাই তখন তাঁহারা অত্যন্ত রাগ করিয়াছিলেন। এ-কথা তাঁহারা মনেও চিন্তা করেন নাই যে, আমরা যে মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের যথার্থ হিতৈষী তাহার কোনো প্রমাণ কোনো দিন দিই নাই... এমন অবস্থায় 'ভাই' শব্দটা আমাদের কণ্ঠে ঠিক বিশুদ্ধ কোমল স্বরে বাজে না...জন্মভূমিকে লক্ষ্য করিয়া 'মা' শব্দটাকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছি... দেশের মধ্যে মাকে আমরা সত্য করিয়া তুলি নাই।" ('সদুপায়')

আপত্তি উঠতে পারে যে জনসংযোগ পশ্চিমী দৃষ্টি হবে কেন, প্রাচ্যাভিমানীরাই তো তার চেষ্টা করছিলেন ব্যাপকভাবে স্বদেশী আমলে। এখানে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এদেশীয় সাহেবিয়ানা আর পশ্চিমী দৃষ্টি এক নয়, তফাত খোসার সঙ্গে সারবস্তুর। প্রাচ্যপ্রত্যয়ের স্বভাবজাত অতীত-(হিন্দু) গৌরব, হিন্দুত্ববোধ ইচ্ছা সত্ত্বেও অহিন্দুকে টানতে পারে নি, হিন্দুকেও করে তুলেছে অসহিষ্ণু; আর ভক্তিভাব বাস্তব সমস্যা থেকে লোকের চোখ ফিরিয়েছে খণ্ড খণ্ড ব্যক্তিত্বের মুক্তি-সাধনার দিকে। তাই অমূর্ত আদর্শের দিক থেকে জনসংযোগ পশ্চিমী ভাবেরই বেশী কাছে, কারণ সে-প্রত্যয় জোর দিচ্ছে মানুষ হিসাবে মানুষের অধিকারের উপর, তার যুক্তিবাদ ধর্মের গোঁড়ামিকে আঘাত করছে, তার সমাজ-সংস্কার নিপীড়িতদের মুক্তি চাইছে।

'গোরা'র পর 'অচলায়তন' (১৯১১), প্রতিষ্ঠিত আচার-সংস্কারের উপর সাক্ষাৎ আক্রমণ। সেই বৎসর এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

"জগতের যেখানেই ধর্মকে অভিভূত করিয়া আচার আপনি বড়ো হইয়া উঠে সেখানেই মানুষের চিত্তকে সে রুদ্ধ করিয়া দেয়...দেশের মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে যাহা আমাদের বুদ্ধিকে শক্তিকে ধর্মকে

চারিদিকে আবদ্ধ করিয়াছে…আমার পক্ষে প্রতিদিন ইহা অসহ্য হইয়া উয়াছে…আমাদের সমস্ত দেশব্যাপী এই বন্দীশালাকে একদিন আমিও নানা মিষ্ট নাম দিয়া ভালোবাসিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মা তৃপ্তি পায় নাই…বাস রে! এমন নীরন্ধ্র বেষ্টন, এমন আশ্চর্য পাকা গাঁথনি! বাহাদুরি আছে বটে, কিন্তু শ্রেয় আছে কি?"

পরিণত আত্মস্থ রবীন্দ্রনাথ আগেকার দিনের প্রাচ্যাভিমানের প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। শুধু রূপকে নয়, প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে স্পষ্ট প্রবন্ধে:

"মানুষকে এইরূপ অন্যায় অবজ্ঞা করতে আমাদের ধর্মই উপদেশ দিতেছে, আমাদের প্রকৃতি নয়।‥ আমাদের দেশের অধিকাংশ লোককেই আমাদের ধর্মশাসন স্বয়ং বলিয়া আসিয়াছে পূর্ণ সত্যে তোমার অধিকার নাই, অসম্পূর্ণেই তুমি সন্তুষ্ট হইয়া থাকো।…আর্য ও অনার্য অসংবদ্ধতাকে হিন্দুধর্ম নামক এক নামে অভিহিত করিয়া আমাদের চিরকালীন জিনিস বলিয়া গৌরব করিতেছি; ইহার ভয়ঙ্কর ভারে আমাদের জাতি কত যুগযুগান্তর ধরিয়া ধূলি-লুণ্ঠিত… শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিরা গর্ব করিয়া থাকেন যে, ধর্মের এমন অদ্ভুত বৈচিত্র্য জগতের আর কোথাও নাই…হিন্দুসমাজেই উচ্চ নীচ নির্বিচারে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু বিচারই মানুষের ধর্ম। উচ্চ ও নীচ, শ্রেয় ও প্রেয়, ধর্ম ও স্বভাবের মধ্যে তাহাকে বাছাই করিয়া লইতেই হইবে।…আমাদের দুর্গতির কারণ আমাদের ধর্মের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও নাই।" ('ধর্মের অধিকার', ১৯১২)

"বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সামাজিক আচারকে আমরা কোনো মতেই শাস্ত্রসীমার মধ্যে খাপ খাওয়াইয়া রাখিতে পারিব না। এমন অবস্থায় আমাদের দেশেও প্রচলিত ধর্মশিক্ষার সহিত অন্য শিক্ষার প্রাণান্তিক বিরোধ ঘটিতে বাধ্য।" ('ধর্মশিক্ষা', ১৯১২)

এই ১৯১২ সালেই কিন্তু 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদের হিন্দু সংজ্ঞার অন্তর্গত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল ব্রাহ্মধর্ম হিন্দু-ধর্মেরই সংস্কৃত রূপ, কিছু অহিন্দু ব্রাহ্ম হলেও সেই আদি উৎসকে অস্বীকার করা চলে না।

১৯১২ সালের অন্য অনেক লেখায় তিনি ইওরোপাগত আদর্শকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। যেমন:

"য়ুরোপে দেশের জন্য, মানুষের জন্য, জ্ঞানের জন্য, প্রেমের জন্য, হৃদয়ের

স্বাধীন আবেগে, সেই দুঃখকে, সেই মৃত্যুকে আমরা প্রতিদিনই বরণ করিতে দেখিয়াছি।" ('যাত্রার-পূর্ব-পত্র')

"য়ুরোপকে তাহার প্রাণশক্তি রক্ষা করিতেছে। তাহা কোনো একটা জায়গায় আটকা পড়িয়া বসিয়া থাকে না। চলা তাহার ধর্ম—গতির বেগে সে আপনার বাধাকে কেবলই আঘাত করিয়া ক্ষয় করিতেছে।" ('ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রী')

"একথা বলিয়া কোনো লাভ নাই, মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিবার পক্ষে আমাদের সনাতন সমাজ সকল সমাজের সেরা…গোড়াতেই নিজের এই মোহটাকে কঠিন আঘাতে ছিন্ন করিয়া ফেলা চাই।…আমাদের নিজের সমাজই আমাদের নিজের মনুষ্যত্বকে পীড়িত করিয়াছে।" ('লক্ষ্য ও শিক্ষা')

১৯১৪ সালে এল 'বলাকা' তার গতির বন্দনা নিয়ে। তার মধ্যে ধ্বনিত হল এগিয়ে চলার ডাক…"আমরা চলি সমুখ পানে, কে আমাদের বাঁধবে।" কবিতা অবশ্য কবিতাই, কিন্তু কবির একটা দৃষ্টিভঙ্গি তার মধ্যেও ধরা পড়ে, কখনও প্রচ্ছন্নভাবে, 'বলাকা'য় প্রকাশ্যে।

কবিতার থেকে প্রবন্ধেতে নেমে 'লোকহিতে' আমরা দেখি (১৯১৪): "সামাজিকতার ক্ষেত্রে যাহাকে আমরা ভাই বলিয়া আপন বলিয়া মানিতে না পারি দায়ে পড়িয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভাই বলিয়া তাহাকে বুকে টানিবার নাট্যভঙ্গি করিলে সেটা কখনই সফল হইতে পারে না।…নিরন্তর সংকট হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্যই আমাদের দরকার হইয়াছে নিম্ন-শ্রেণীয়দের শক্তিশালী করা।" সমাজের পুনর্গঠন ছাড়া, অতীতকে পূজা করে এই পরিবর্তন অবশ্য সম্ভব নয়।

এই পর্ব শেষ করা যাক 'ঘরে-বাইরে'-র উল্লেখে। এর তারিখ হল ১৯১৫-১৯১৬—

"স্ত্রী! ওটা কি একটা যুক্তি! ওটা কি একটা সত্য! ওই কথাটার মধ্যে একটা আস্ত মানুষকে আগাগোড়া পুরে ফেলে কি তালা বন্ধ করে রাখা যায়?…ধর্মের ধুয়ো দেশের ধুয়ো দুটিকেই পুরোদমে একসঙ্গে চালাচ্ছি—ভগবদ্গীতা এবং বন্দেমাতরম্ আমাদের দুইই চাই—তাতে দুটোর কোনোটাই যে স্পষ্ট হতে পারছে না…আমার ভারতবর্ষ কেবল ভদ্রলোকেরই ভারতবর্ষ নয়…ভারতবর্ষ যদি সত্যকার জিনিস হয় তাহলে ওর মধ্যে মুসলমান আছে।

…নিজের ধর্ম আমরা রাখতে পারি, পরের ধর্মের উপর আমাদের হাত নেই। …মুসলমানকেও নিজের ধর্মমতে চলতে দিতে হবে।…কেবল গোরুই যদি অবধ্য হয় আর মোষ যদি অবধ্য না হয় তবে ওটা ধর্ম নয়, ওটা অন্ধ সংস্কার। …এই যে মুসলমানদের অস্ত্র করে আজ আমাদের উপর হানা সম্ভব হচ্ছে, এই অস্ত্রই যে আমরা নিজের হাতে বানিয়েছি…"

প্রাচ্যাভিমানী হয়তো বলবেন,এর মধ্যে অনেক কিছু আমরাও বলে থাকি। ব্যক্তিবিশেষ তা বলতে পারেন, কিন্তু উনিশ শতকের বাংলা দেশে প্রাচ্যপ্রত্যয়ের ঐতিহাসিক প্রকাশের অমূর্ত অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট্ রূপটির সঙ্গে এই সব বিশ্বাস খাপ খায় না ; দুয়ের মধ্যে পরস্পরবিরোধ অগ্রাহ্য করা ন্যায়সঙ্গতভাবে অসম্ভব। শুধু ন্যায়ের তর্ক নয়, আজকের দিনে স্বাধীন ভারতেও কি এ বিরোধ অবসান হয়েছে ? প্রাচ্যাভিমান আজও সুপ্রতিষ্ঠিত, অথচ দেশের গতি পশ্চিমী সভ্যতার দিকে।

॥ দশ ॥

জাগরণ একটা প্রক্রিয়া বলে কোনো না কোনো সময়ে তাতে ছেদ টানতে হবে। ইওরোপে রেনেসাঁসের প্রভাব আজ পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে থাকলেও ষোল সতরো শতকে আমরা তার সীমারেখা নির্দেশ করি। বাংলার রেনেসাঁসকেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে টেনে আনবার সার্থকতা দেখি না, যদিও তার জের আজ পর্যন্ত অপ্রতিহত। রামমোহনে যার সূত্রপাত, ঠিক এক শতাব্দী পরে তার যবনিকা পড়লে আপত্তি করা যায় না।

তার পরেও শতাব্দীর এক পাদ কাল জুড়ে রবীন্দ্র-রচনা উৎসারিত হয়েছিল, রবীন্দ্র-প্রতিভা সেতুবন্ধন করেছে দুই যুগের মধ্যে। এই সময়কার রবীন্দ্রনাথের লেখা সম্বন্ধে শুধু এই কথাই বলব যে 'গোরা-অচলায়তন-বলাকা-ঘরে বাইরে'র পর্বের দৃষ্টি থেকে তিনি আর মুখ ফেরান নি।

শেষ পর্ব সূচনা করেছিল 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' (১৯১৭)। সেখানে আছে : "এদেশে বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যার একটা আপস হইয়া গেছে,…গাছতলায় বসিয়া জ্ঞানী বলিতেছে—'যে-মানুষ আপনাকে সর্বভূতের মধ্যে ও সর্বভূতকে আপনার মধ্যে এক করিয়া দেখিয়াছে সেই সত্যকে দেখিয়াছে', অমনি সংসারী ভক্তিতে গলিয়া তার ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া দিল। ওদিকে সংসারী তার ঘর-দালানে

বসিয়া বলিতেছে, 'যে-বেটা সর্বভূতকে যতদূর সম্ভব তফাতে রাখিয়া না চলিয়াছে তার ধোবা-নাপিত বন্ধ', আর জ্ঞানী আসিয়া তার মাথায় পায়ের ধূলা দিয়া আশীর্বাদ করিয়া গেল, 'বাবা বাঁচিয়া থাকো'।···বুড়ী এদের মনটাকেই আফিম খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়াছে। কিন্তু অবাক হইতে হয় যখন দেখি, এখনকার কালের শিক্ষিত যুবকেরা, এমন কি কালেজের তরুণ ছাত্ররাও এই বুড়ীতন্ত্রের গুণ গাহিতেছেন।"

'রাশিয়ার চিঠি'তে (১৯৩০) নূতনের আবিষ্কারের আনন্দ এত সুপরিচিত যে তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। 'কালান্তরে' (১৯৩৩) স্বীকৃতি আছে: "বর্তমান যুগের চিত্তের জ্যোতি পশ্চিম দিগন্ত থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে মানব-ইতিহাসের সমস্ত আকাশ জুড়ে উদ্ভাসিত···প্রাচীন পাণ্ডিত্যের অন্ধ অনুবর্তনায় সে আপনাকে ভোলাতে চায় নি···য়ুরোপের সংস্রব একদিকে আমাদের সামনে এনেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণবিধির সার্বভৌমিকতা, আর এক দিকে ন্যায়-অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনো শাস্ত্রবাক্যের নির্দেশে, কোন চিরপ্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে, কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হতে পারে না।" 'সভ্যতার সংকটে'(১৯৪১) পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কশাঘাত করেছিলেন পশ্চিমী দৃষ্টিকে নয়, ভারতে ব্রিটিশ শাসনে তার বিকৃতিটাকে, ইংরেজ রাজত্বের মঙ্গলময় রূপের প্রতি প্রাচীন বিশ্বাসকে। তা নয়তো পশ্চিমের সৃষ্টি নব রাশিয়া ও নবীন জাপানের অগ্রগতির সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতের দুরবস্থার তুলনার উপর জোর দিতেন না।

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনে পশ্চিমীদৃষ্টির জয়যাত্রা রইল অব্যাহত। তাঁর প্রগতিশীলতার একটা বড়ো লক্ষণ এই যে বার্ধক্যের চিরায়ত পশ্চাদ্‌গমন তাঁকে স্পর্শ করল না। পরিণত জীবনের শেষার্ধেরও বেশী জুড়ে বিরাজ করল ভবিষ্যতের উপযোগী পশ্চিমী আদর্শের প্রতি আন্তরিক প্রীতি।

রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা

চিন্মোহন সেহানবিশ

> "যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সঙ্গত। যেমন এ কথা বলা চলে না যে, ব্রাহ্মণ আদি চারিবর্ণ সৃষ্টির আদিকালেই ব্রহ্মার মুখ থেকে পরিপূর্ণ স্বরূপে প্রকাশ পেয়েছে, যেমন স্বীকার করতেই হবে আর্যজাতির সমাজে বর্ণভেদের প্রথা কালে কালে নানা রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে পরিণত, তেমনি করেই অন্তত আমার সম্বন্ধে জানা চাই যে রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়নি, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই-সমস্ত পরিবর্তন-পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহ একটা ঐক্যসূত্র আছে। সেইটিকে উদ্ধার করতে হলে রচনার কোন্ অংশ মুখ্য, কোন্ অংশ গৌণ, কোন্‌টা তৎসাময়িক, কোন্‌টা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান, সেইটে বিচার করে দেখা চাই। বস্তুত সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে গেলে পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব করে তবে তাকে পাই।" ('রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত', "কালান্তর", রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪শ খণ্ড, ৪৩৭ পৃষ্ঠা)

রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা নিশ্চয়ই নিছক রাষ্ট্রনীতিগত নয়, তবু তাঁর এই হুঁশিয়ারি সে-ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। যে সুদীর্ঘ আশি বছর ব্যেপে তাঁর জীবনের পরিসর তার পরিধির ভিতরে বিপুল ও গভীর পরিবর্তন ঘটে গেছে সারা পৃথিবীতে। তাঁর সদাজাগ্রত চৈতন্য প্রত্যক্ষ করেছে সেই রূপান্তরের নানা পর্যায়, অবশ্য তার নিজস্ব বিশিষ্ট ভঙ্গিতে, যুগসন্ধিকালের দ্বন্দ্ব ও জটিলতার ছাপও পড়েছে তাঁর আন্তর্জাতিক চিন্তায়। তাই রচনার সন তারিখ ও ধারাবাহিকতার খেয়াল না রেখে তাঁর বিক্ষিপ্ত কয়েকটি লেখার আলোচনায়

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা পরিমাপের চেষ্টা, সংক্ষেপে হলেও ঐতিহাসিকভাবেই করা সঙ্গত।

আরো একটি জটিলতা আছে এইখানে: একে তো সাধারণভাবে, আন্তর্জাতিকতার ধারণার মধ্যেই রয়েছে জাতীয়তার পরোক্ষ স্বীকৃতি, তার উপরে বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতা তাঁর দেশাত্মবোধের সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক নানা ভাবনার সূত্রে এত নিবিড়ভাবে গ্রথিত যে একেবারে স্বতন্ত্র দুই খাতে বিচারের প্রয়াস খুবই কৃত্রিম হয়ে দাঁড়ায়—একটির আলোচনায় অন্য প্রসঙ্গটিও এসে পড়ে স্বতঃই। তাছাড়া ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের সম্পর্কও তো আন্তর্জাতিক কিন্তু আমাদের জাতীয়তার প্রসঙ্গ বেমালুম না তুলে ইঙ্গ-ভারত সম্পর্কের আলোচনা সম্ভব কি আদৌ?

তবু বিচারের সুবিধার খাতিরে কিছুটা মনগড়া হলেও একটা ভেদরেখা টানতেই হবে এ ক্ষেত্রে—যদিও জাতীয়তার প্রসঙ্গ থেকে থেকেই এসে পড়বে সে রেখা পেরিয়ে। মোটের উপর ইঙ্গ-ভারত সম্পর্কের যে ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য থেকে উদ্ভব হয়েছে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের বিশিষ্ট রূপটির, তার বিশদ ব্যাখ্যানে আমরা এখানে যাব না—আমাদের বিবেচ্য শুধু তার সাধারণ রূপ। তাছাড়া ব্রিটেন বাদে অন্য দেশের অথবা আন্তর্জাতিক সমস্যা, মতবাদ বা আন্দোলনের প্রতি মনোভাবের প্রসঙ্গ তো রয়েছেই। আর একটি কথা—আলোচনার সুবিধার খাতিরে এখানে রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তার রাষ্ট্রনৈতিক দিকটির উপরেই জোর দেওয়া হবে বিশেষ করেই।

'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ "ছেলেবেলায় ইংরেজ গবর্মেণ্টের চিরন্তন জুজু" রুশীয়েরা "তিব্বত ভেদ করিয়া হিমালয়ের কোন-একটা ছিদ্রপথ দিয়া যে··· সহসা ধূমকেতুর মতো প্রকাশ পাইবে" এমন আশঙ্কা লোকমুখে আলোচিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন কৌতুকভরে। এর মধ্যে কৌতুক বাদে এইটুকুই শুধু নজর করার যে নাবালক ভারতবাসীদের সেদিন ঐ জুজুর ভয় দেখাতেন তাদের অভিভাবকেরাই এবং অবস্থাগতিকে আমাদেরও তখন দুনিয়াকে দেখতে হত অনেকখানি ইংরেজের চোখেই। তবু ১৮৭৮ সালে 'কবিকাহিনীতে' যখন ১৭ বছরের তরুণ কবিকে আক্ষেপ করতে দেখি :

"কি দারুণ অশান্তি এ মনুষ্যজগতে,
রক্তপাত, অত্যাচার, পাপ কোলাহল
দিতেছে মানব-মনে বিষ মিশাইয়া!

কত কোটি কোটি লোক, অন্ধকারাগারে
অধীনতা-শৃঙ্খলেতে আবদ্ধ হইয়া
ভরিছে স্বর্গের কর্ণ কাতর ক্রন্দনে…
সামান্য নিজের স্বার্থ করিতে সাধন
কত দেশ করিতেছে শ্মশান অরণ্য,
কোটি কোটি মানবের শান্তি স্বাধীনতা
রক্তময়-পদাঘাতে দিতেছে ভাঙ্গিয়া,
তবুও মানুষ বলি গর্ব করে তারা,
তবু তারা সভ্য বলি করে অহঙ্কার !"

তখন বিশ্বব্যাপী শোষণ ও অত্যাচার সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক অনুভূতির পরিচয় মেলে কিছুটা। কিন্তু অবস্থা বর্তমানে যতই গ্লানিময় হোক না কেন তরুণ কবির স্থির বিশ্বাস—

"সেদিন আসিবে গিরি, এখনিই যেন
দূর ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে
যেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবদ্ধ
মিলিবেক কোটি কোটি মানব হৃদয়।
প্রকৃতির সব কার্য অতি ধীরে ধীরে,
এক এক শতাব্দীর সোপানে সোপানে,
পৃথ্বী সে শান্তির পথে চলিতেছে ক্রমে,
পৃথিবীর সে অবস্থা আসেনি এখনো,
কিন্তু একদিন তাহা আসিবে নিশ্চয়।"

কাব্য হিসেবে এ উদ্দামতা অকিঞ্চিৎকর হতে পারে, তবু রচনাকালের কথা মনে রাখলে তরুণ কবির এই বিশ্বজোড়া ইউটোপিয়া-রচনা আশ্চয ঠেকে না কি ?

কবির এই চেতনা আরো বাস্তবনিষ্ঠ ও প্রখর হয়ে ওঠে কিছুদিনের মধ্যেই। ঐ ১৮৭৮ সালেই তিনি সিভিলিয়ান মেজদাদার হাতে উপযুক্ত তালিমের পর বিলাত রওনা হন ব্যারিস্টার হওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু "ঐশ্বর্য ও রাষ্ট্রীয় প্রতাপের উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত" ইংলণ্ডের উজ্জ্বল পরিবেশে সেদিন একজন ভারতীয় তরুণের পক্ষে যে মানসিক প্রতিঘাত প্রত্যাশিত ছিল তার ব্যতিক্রম দেখা গেল তাঁর ক্ষেত্রে। ১৮৭৯ ও ১৮৮০ সালে 'ভারতীতে'

প্রকাশিত 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র'গুলি থেকে বোঝা যায় বিলাতী সমাজজীবনের দ্রুত লয়, মানস-দিগন্তের প্রসার, বস্তুনিষ্ঠা ও বৈজ্ঞানিকতা, শৃঙ্খলাবোধ, স্ত্রীস্বাধীনতা (বিশেষত শেষোক্তের ক্ষেত্রে তাঁর সাগ্রহ বর্ণনা সম্ভবত বেশ কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছিল তাঁর আগ্রহ ও অন্য অভিভাবকদের) প্রভৃতির দিক তাঁকে সেদিন আকৃষ্ট করেছিল যথেষ্টই কিন্তু অভিভূত করতে পারে নি তরুণ কবিকে। কারণ উজ্জ্বলতার ঠিক পাশাপাশিই তিনি লক্ষ্য না করে পারলেন না পরদেশশাসনের অনিবার্য আনুষঙ্গিক কলঙ্ক : "এখানকার গলিতে গলিতে যে জন জেন্‌স্ টমাস-গণ কিলবিল করছে, যাদের মা বাপ বোনকে একটা কসাই একটা দরজী ও একজন কয়লা-বিক্রেতা ছাড়া আর কেউ চেনে না, তারা ভারতবর্ষের যে অঞ্চলে পদার্পণ করে সে অঞ্চলে ঘরে ঘরে তাদের নাম রাষ্ট্র হয়ে যায় যে রাস্তায় তারা চাবুক হস্তে ঘোড়ায় চড়ে যায় (হয়তো সে চাবুক কেবলমাত্র ঘোড়ার জন্যেই ব্যবহার হয় না) সে রাস্তা-সুদ্ধ লোক শশব্যস্ত হয়ে তাদের পথ ছেড়ে দেয়। তাদের এক একটা ইঙ্গিতে ভারতবর্ষে এক-একটা রাজার সিংহাসন কেঁপে ওঠে—এ রকম অবস্থায় সে ভেকদের পেট উত্তরোত্তর ফুলতে ফুলতে যে হস্তীর আকার ধারণ করবে আমি তো তাতে বিশেষ অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পাইনে।" ('য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' রবীন্দ্রশতবর্ষ পূর্তি সংস্করণ, ৫২ পৃষ্ঠা)

ঠিক এর উল্টোপিঠেই রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করলেন আর এক গ্লানি—বিলাতের 'ইঙ্গবঙ্গ' সমাজের মর্মান্তিক হীনমন্যতা ও হাস্যকর নকলনবিশি (এ প্রসঙ্গে 'য়ুরোপ-প্রবাসীর' পঞ্চম পত্রটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ ইঙ্গ-ভারত সম্পর্ক সমকক্ষের মধ্যে না হয়ে একের উপরে অন্যের আধিপত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুন দু তরফেই যে মনুষ্যত্বের বিড়ম্বনা ঘটছিল তার কোনোটিই তরুণ কবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় নি সেদিন।

'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' পড়তে পড়তে হঠাৎ আমাদের মনে পড়ে যায় যে বর্তমান কালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবেশ ভিক্টোরীয় যুগে এবং সে যুগধর্মে তিনিও তখন বেশ কিছুটা আচ্ছন্ন। গ্ল্যাডস্টোনের বাগ্মিতায় তাই তাঁকে মুগ্ধ হতে দেখি, ব্রাইট সম্পর্কে তো তিনি রীতিমতো সশ্রদ্ধ, তাঁর ধারণা Conservative-দের তুলনায় Liberal-রা 'কতকটা reasonable'. তবু এসবের পাশাপাশি এ'ও তাঁর নজর এড়ায় না যে "হৌসে Irish member-দের ভারী যন্ত্রণা; সে বেচারীরা যখন বক্তৃতা করতে ওঠে তখন হৌসে যে

অরাজকতা উপস্থিত হয় সে আর কী বলব!" (আইরিশ সদস্যরা সেদিন ভারতবর্ষ সম্পর্কে ও জুলুদের প্রতি ইংরেজ সৈন্যদের অত্যাচারের কৈফিয়ত দাবির চেষ্টা করছিলেন বলে পত্রে উল্লেখ আছে)। আর সে দৃশ্য দেখার পর যখন তাঁর মন্তব্য শুনি "আমার স্বভাবতই আইরিশ মেম্বরদের প্রতি টান" তখন তাঁর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যে স্বাভাবিক এবং তার অবস্থিতি যে যথাস্থানেই সে-সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ থাকে না কিছুমাত্র।

আইরিশ সদস্যদের এই দুর্গতির কারণ-নির্দেশের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণদৃষ্টির সন্ধান মেলে: "মনে করো আইরিশদের অনুগ্রহ করে পার্লামেণ্টে স্থান দেওয়া রয়েছে, আইরিশরা সেই অনুগ্রহ পেয়েই যদি শান্ত ছেলেগুলির মতে হৌসে বসে থাকত, তাদের অস্তিত্ব আছে কিনা আছে যদি জানা না যেত, তা হলে অনুগ্রহকর্তারা সন্তুষ্ট থাকতেন। কিন্তু তারাও যদি অন্যান্য মেম্বরদের মতো বাদানুবাদ করতে থাকে, নিজের মত প্রকাশ করে, অন্য লোকের মতো প্রতিবাদ করে, তা হলে সকলের চটে ওঠা খুব স্বাভাবিক। ইন্‌ডিয়া কৌন্‌সিলে যদি একদল ভারতবর্ষীয় মেম্বর থাকে, আর তারা যদি জুজুর মতো বসে না থাকে, সকল কথাতেই 'হাঁ' না দিয়ে যায়, আর সংকুচিত স্বরে কিছু বলতে গিয়ে অমনি গবর্মেণ্টের নীরব চোখ-রাঙানি দেখে থতমত খেয়ে যদি না বসে পড়ে, কিম্বা গবর্মেণ্টের উৎসাহজনক পিঠ-থাবড়া খেয়ে আহ্লাদে যদি গলে না পড়ে, তা হলে তাদের কী দুর্দশা হয় মনে করে দেখো দেখি। তা হলে দুদিন বাদেই তাদের ঘাড়ে হাতটি দিয়ে বলা হয়, 'বেরোও, বেরোও বাপুগণ!" ('য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', ৪৭ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ প্রভুর অধীনস্থ সব প্রজারই এক হাল। এর থেকে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত টানলেন এই ভাবে: "তাঁদের মত বটে যে, সকলকে সমভাবে দর্শন করা উচিত; কিন্তু সমভাবে দর্শন করা তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তাঁদের মত যতক্ষণ কার্যক্ষেত্রে না নাবে ততক্ষণ 'তাঁরা সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করতে পারবেন' এই কল্পনার উপর বিশ্বাস করে দশ জনকে সমবেত করলেন; কিন্তু যেই তাঁরা তাঁদের সঙ্গে সমান ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন অমনি দেখলেন তাঁদের বুকের ভিতরে লাগে।" 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' ৪৯ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ আজ থেকে ৮২ বছর আগে গণতন্ত্র ও পার্লামেণ্টারী শাসনের খাস

লীলাক্ষেত্রে বসে ১৮ বছরের তরুণ অন্তত কিছুটা আঁচ করেছেন গণতন্ত্র ও সাম্রাজ্যরক্ষার মধ্যকার অনিবার্য স্বার্থ-সংঘাতের।

দু বছর পর, ১৮৮১ সালে রবীন্দ্রনাথ 'চীনে মরণের ব্যবসায়' প্রবন্ধে ঐ সময়ে চীনে ইংরেজ যে নৃশংস ও অসমবাণিজ্য চালাচ্ছিল আফিং-এর, তার প্রতিবাদে তীব্র ভাষায় লিখলেন, "একটি সমগ্র জাতিকে অর্থের লোভে বলপূর্বক বিষপান করান হইল। এমনতর নিদারুণ ঠগীবৃত্তি কখনো শুনা যায় নাই। চীন কাঁদিয়া কহিল: 'আমি অহিফেন খাইব না।' ইংরাজ বণিক কহিল 'সে কি হয়?' চীনের হাত দুটি বাঁধিয়া তার মুখের মধ্যে কামান দিয়া অহিফেন ঠাসিয়া দেওয়া হইল; দিয়া কহিল 'যে অহিফেন খাইলে তাহার দাম দাও।' বহুদিন হইল ইংরেজরা চীনে এইরূপ অপূর্ব বাণিজ্য চালাইতেছেন। যে জিনিস সে কোনমতেই চাহে না, সেই জিনিস তাহার এক পকেটে জোর করিয়া গুঁজিয়া দেওয়া হইতেছে ও আর এক পকেট হইতে তাহার উপযুক্ত মূল্য তুলিয়া লওয়া হইতেছে। অর্থসঞ্চয়ের এইরূপ উপায়কে ডাকাইতি না বলিয়া যদি বাণিজ্য বলা যায়, তবে সে নিতান্তই ভদ্রতার খাতিরে। ইহা আর কিছু নয়, একটি সবল জাতি দুর্বলতর জাতির নিকটে মরণ বিক্রয় করিয়া কিছু লাভ করিতেছেন।" ('চীনে মরণের ব্যবসায়', "ভারতী", ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ, ৯৩ পৃষ্ঠা)

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বচেতনা শুধু তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক রচনায় নয়, গোড়ার থেকেই গভীর হৃদয়াবেগ-তাড়িত কাব্যেও যে আত্মপ্রকাশ করেছিল তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। 'দূর হতে মহাসাগরের গান শুনে' ঐ সময়ে যে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটে তার উদ্দাম সাধ তাই:

অগাধ বাসনা অসীম আশা
জগৎ দেখিতে চাই।
জাগিয়াছে সাধ চরাচর ময়
প্লাবিয়া বাহিয়া যাই।

যত প্রাণ আছে ঢালিতে পারি,
যত কাল আছে বহিতে পারি,
যত দেশ আছে ডুবাতে পারি,
তবে আর কিবা চাই,
পরাণের সাধ তাই।

(প্রথম প্রকাশ ১৮৮২)

আর 'প্রভাত-উৎসবে' :

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি।
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত,
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি।

(প্রথম প্রকাশ ১৮৮২)

এই যেমন বিশ্বজনীনতার কাব্যিক প্রকাশ তেমনই আবার ১৮৮৪ সালেব 'ডুব দেওয়া' প্রবন্ধে কিছুটা দার্শনিকভাবে তিনি লিখলেন . "বিশ্বের প্রত্যেক বিঘা প্রত্যেক কাঠাতেই বিশ্ব বর্তমান। একদিনে তাহা আয়ত্ত হয় না। প্রত্যহ অধিকার বাড়িতে থাকে। যিনি দশ বৎসরে এক স্থানের কিছুই অধিকার করিতে পারিলেন না তিনি বিশ্বকে অধিকার করিবেন কি করিয়া বিশ্ব সর্বত্রই অসীম গভীর এবং অসীম প্রশস্ত। অতএব বিশ্বের এক কাঠা জমিকে যথার্থ ভালবাসিতে গেলে বিশ্বজনীনতা থাকা চাই।" ('আলোচনা', রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, ১২ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ কবির বিশ্বজনীনতা তাঁর গভীর দেশাত্মবোধের বিরোধী নয় এবং তা এমন একটি সত্য যাকে আশ্রয় করে দেশাত্মবোধেরই মতো হৃদয়োচ্ছ্বাস সম্ভব ; দ্বিতীয়ত, কি দেশাত্মবোধ, কি বিশ্বজনীনতা কোনো ক্ষেত্রেই আমাদেব অধিকার স্বতঃই আয়ত্তাধীনে আসে না, সে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয় আপন চেষ্টায়—রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালীন এই ধরনের চিন্তাব সার এসব রচনায় বীজাকারে নিহিত।

দ্বিতীয় ইওরোপ-যাত্রা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বারের জের টেনে ১৮৯১ সালে প্রকাশিত 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারিতে' লেখেন :

"...অপ্রতিহত ক্ষমতার দম্ভ জাতীয় চরিত্রের মূল আক্রমণ করে। যে স্বাধীনতাপ্রিয়তার ভিত্তির উপর তোমার জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত, তলে তলে সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তার বিশুদ্ধতা নষ্ট করে। সেই জন্য ইংলণ্ডবাসী ইংরেজের কাছে শোনা যায় ভারতবর্ষীয় ইংরেজ একটা জাতই স্বতন্ত্র ; কেবলমাত্র বিকৃত যকৃৎই তার একমাত্র কারণ নয় ; যকৃতের চেয়ে মানুষেব আরো উচ্চতর অন্তরিন্দ্রিয় আছে সেটাও নষ্ট হয়ে যায়।" ('য়ুরোপযাত্রীব ডায়ারি' রচনাবলী ১ম খণ্ড ৬১৪ পৃষ্ঠা)

এই 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র এক খসড়ায় (১৮৯০, সেপ্টেম্বর ১৯) রবীন্দ্রনাথ আরো কয়েকটি কথা বলেন যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিলাতের চোখ-ঝলসানো জাঁকজমকের অন্য পিঠে যে একটা অন্ধকারময় দুঃখের দিক আছে তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন: "ভেবে দেখলে এর একটা অন্ধকার দিক আছে—Song of the Shirt পড়লে তা টের পাওয়া যায়। এই সুখসমৃদ্ধির অন্তরালে কী অসহ্য দারিদ্র্য আপনার জীবনপাত করছে সেটা আমাদের চোখেই পড়ে না; কিন্তু প্রকৃতির খাতায় উত্তরোত্তর তার হিসেব জমা হচ্ছে। প্রকৃতিতে উপেক্ষিত ক্রমে আপনার প্রতিশোধ নেবেই।… সভ্যতা আপনাকে রক্ষা করতে চায় তো প্রতিবেশীকে আপনার সমান করে তুলুক। দুটো শক্তি যত একসঙ্গে সাম্য রক্ষা করে কাজ করে ততই মঙ্গল—যেমন আকর্ষণ বিকর্ষণ, স্বার্থ এবং পরার্থ, আপনার উন্নতি ও চতুষ্পার্শ্বের উন্নতি—নইলে চতুষ্পার্শ্ব তার প্রতিশোধ তোলে, বর্বরতা সভ্যতাকে ধ্বংস করে। আমার তো সেইজন্যে মনে হয়—আশ্চর্য নেই যে ভবিষ্যতে কাফ্রিরা ইওরোপ জয় করবে, কৃষ্ণ অমাবস্যা দিনের আলোকে গ্রাস করবে…যেখানে অন্ধকার জমা হচ্ছে, বিপদ সেইখানেই গোপন বল সঞ্চয় করছে—সেইখানেই প্রলয়ের গুপ্ত জন্মভূমি।" (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫৬ মাঘ-চৈত্র ১৫৮ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ প্রকৃতির ক্ষেত্রে যেমন তেমনই মানবসমাজেও একটা স্থির, ভারসাম্যের অবস্থা, একটি natural order of things আছে। তার থেকে বিচ্যুতি যখন প্রকট হয়ে ওঠে তখন প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নেয় অনিবার্যভাবেই। সে প্রতিশোধের রূপ যে বর্বরতার হাতে সভ্যতার ধ্বংসসাধন ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে এখানে অবশ্য তার কোনো আভাস পাওয়া যায় না। কিন্তু শোষণের উপরে প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার দুর্বলতা কোথায়, তার বিপদ কোন্‌খানে এ বিষয় তাঁর বক্তব্য নজর করার মতো—বিশেষ করে রচনাকালের কথা মনে রাখলে। এই সামাজিক ভারসাম্যবিচ্যুতি ও তার ফলাফলের কথা আরো পরিচ্ছন্নভাবে তাঁর লেখায় এসেছে পরবর্তী দিনে (যেমন ১৯১৯ সালে প্রকাশিত 'বাতায়নিকের পত্রে')।

বর্তমান সভ্যতার অন্ধকার দিক সম্পর্কিত চিন্তা যে এ-সময়ে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ আলোড়িত করেছিল তা বোঝা যায় যখন দেখি ১৮৯১ সালে প্রকাশিত 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' প্রবন্ধে ইওরোপীয় সমাজ, পরিবার, বিশেষ করে সে সমাজ বা পরিবারে নারীর স্থান সম্পর্কে আলোচনার শুরুতে আবার তিনি এই

সমস্যার অবতারণা করেছেন—এমনকি ঐ Song of the shirt ও কাফ্রিদের ইওরোপ জয়ের প্রসঙ্গও তুলেছেন আগের মতো। মানবিক সম্পদের দিক থেকে যে এই সভ্যতা ক্রমে রিক্ত হয়ে আসছে 'স্তূপাকার বাহ্যবস্তুর' আড়ালে, সে কথা প্রকাশ পেয়েছে প্রবন্ধের এই জায়গাটিতে :

"…য়ুরোপীয় সভ্যতা হয়তো বা তলে তলে জড়ত্বের এক প্রকাণ্ড মরুভূমি সৃজন করছে ; গৃহ, যা মানুষের স্নেহপ্রেমের নিভৃত নিকেতন, কল্যাণের চির উৎসভূমি, পৃথিবীর আর সমস্তই লুপ্ত হয়ে গেলেও যেখানে একটুখানি স্থান থাকা মানুষের পক্ষে চরম আবশ্যক, স্তূপাকার বাহ্যবস্তুর দ্বারা সেইখানটা উত্তরোত্তর ভরাট করে ফেলছে, হৃদয়ের জন্মভূমি জড় আবরণে কঠিন হয়ে উঠছে।" ('প্রাচ্য ও প্রতীচ্য', 'সমাজ', রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা)।

আধুনিক সভ্যতার বিশ্লেষণ এখানে নিপুণ কিন্তু ঐ সভ্যতার সঙ্গে যখন তিনি আমাদের সমাজের তুলনা করেন : "আর আমাদের সংকীর্ণ নদীটি নিতান্ত ক্ষীণস্রোত ধারণ ক'রে অবশেষে মধ্যপথে পারিবারিক ঘন শৈবালজালের মধ্যে জড়ীভূত হয়ে আচ্ছন্নপ্রায় হয়ে গেছে। কিন্তু তারও একটি শোভা সরসতা শ্যামলতা আছে। তার মধ্যে বেগ নেই, বল নেই, কিন্তু মৃদুতা স্নিগ্ধতা সহিষ্ণুতা আছে" (ঐ, ২৪৪ পৃষ্ঠা)—তখন সেই তুলনার ভিতরে সাবেকী idyllic relations-এর প্রতি তাঁর পক্ষপাত পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সে পক্ষপাতের কারণ সম্ভবত ঐ সম্পর্কগুলি হাল আমলের যে cash nexus-এর দাপটে বিপন্ন তার ভয়াবহ রিক্ততাই। দিশেহারা হয়ে তাই তাঁকে ঐ প্রবন্ধে লিখতে দেখি : "…যে-সভ্যতা পরিবার-বন্ধনের অনুকূল, সে সভ্যতার মধ্যে কি নাইহিলিজম নামক অতো বড়ো একটা সর্বসংহারক হিংস্র প্রবৃত্তির জন্মলাভ সম্ভব হয়। সোশ্যালিজম কি কখনও পিতামাতা ভ্রাতাভগ্নী পুত্রকলত্রের মধ্যে এসে পড়ে নখদন্ত বিকাশ করতে পারে।" ('প্রাচ্য ও প্রতীচ্য', রচনাবলী ১২শ খণ্ড, ২৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা)।

নাইহিলিজম-সোশ্যালিজমের সমীকরণ, দুটিকেই বর্তমান মরু সভ্যতার অবাঞ্ছিত ফলজ্ঞান, ধনিক সভ্যতাকে নিছক 'ইওরোপীয়' বিবেচনা, তথাকথিত প্রাচ্য সমাজব্যবস্থার 'মৃদুতা স্নিগ্ধতা সহিষ্ণুতার' প্রতি দরদ—এ সব লক্ষণ থেকে বোঝা যায় যে কবির দোটানা তখনও পর্যন্ত কোনো স্থির নিষ্পত্তির ঘাটে এসে পৌছয় নি। নূতনের প্রতি আকর্ষণকে মাঝে মাঝে ছাপিয়ে উঠছে পুরাতনের প্রতি মমতা, তার সঙ্গে নাড়ির যোগ।

অথচ সাবেকী বা বনেদীর প্রতি বীতরাগ যে কবিকে মনে মনে অস্থির করে তুলছে তার প্রমাণও মেলে ঐ সময়কার রচনায়। 'দুরন্ত আশা' (রচনাকাল ১৮৯০ সাল) রচনা প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতিতে' তিনি লিখেছেন : "...চারিদিকে পাড়ি আছে এবং ঘাট আছে, কালো জলের উপর প্রাচীন বনস্পতির শীতল কালো ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে ; স্নিগ্ধ পল্লবরাশির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কোকিল পুরাতন পঞ্চমস্বরে ডাকিতেছে—কিন্তু এ তো বাঁধাপুকুর, এখানে স্রোত কোথায়, ঢেউ কই, সমুদ্র হইতে কোটালের বান ডাকিয়া আসে কবে।...যে মৃদু নিশ্চেষ্টতার মধ্যে মানুষ কেবলি মধ্যাহ্নতন্দ্রায় ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে, সেখানে মানুষের জীবন আপনার পূর্ণ পরিচয় হইতে আপনি বঞ্চিত থাকে...আপনার সম্বন্ধে, আপনার চারিদিকের সম্বন্ধে বড়ো একটা অধৈর্য ও অসন্তোষ আমাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিত ; আমার প্রাণ বলিত— 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন' !"

অন্যদিকে ধনতন্ত্রী সমাজের সমস্যাও যে ঐ সময়ে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ-ভাবেই ভাবিত করছে তার পরিচয় পাওয়া যায় 'স্ত্রী মজুর', 'কর্মের উমেদার', 'ক্যাথলিক সোশ্যালিজম' ও 'সোশ্যালিজম'—এই চারটি প্রবন্ধে। (এর মধ্যে প্রথম তিনটি প্রকাশিত হয় ১৮৯১ সালে এবং শেষেরটি পরের বছরে) 'স্ত্রী-মজুর' প্রবন্ধে তিনি কলকারখানায় নারী শ্রমিক নিয়োগজনিত সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা প্রসঙ্গের আলোচনা শেষ করছেন এই প্রশ্নে "দেখা যাইতেছে য়ুরোপে আজকাল প্রধান সমস্যা এই—জিনিসপত্র, না মনুষ্যত্ব, কাহার দাম বেশী" ; 'কর্মের উমেদারে' তিনি লিখেছেন : "য়ুরোপে.. অবস্থা উত্তরোত্তর গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। লোহার কলের সঙ্গে সঙ্গে রক্তমাংসের মানুষকে সমান খাটিতে হইতেছে। কেবল বণিক সম্প্রদায় লাভ করিতেছেন এবং ধনী সম্প্রদায় আরামে আছেন।" কিন্তু তাঁর ধারণা : "য়ুরোপের মানুষকে যন্ত্রের তলায় পিষিয়া ফেলা সহজ ব্যাপার নহে।...য়ুরোপীয় প্রকৃতি কিছুদিন এইরূপ উপদ্রব সহ্য করিয়া অবশেষে বিদ্রোহ উপস্থিত করে।... য়ুরোপের মনুষ্যত্ব এইরূপ জীবন্ত এবং প্রবল থাকাতেই সহজে কোন বিকারের আশঙ্কা হয় না। কোনোরূপ বাড়াবাড়ি ঘটিলেই আপনিই তাহার সংশোধনের চেষ্টা জাগিয়া ওঠে। রাজা প্রজার স্বাধীনতায় একান্ত হস্তক্ষেপ করিলে যথাসময়ে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়া ওঠে—শাস্ত্র ও পুরোহিত ধর্মের ছদ্মবেশে মানবের স্বাধীন বুদ্ধিকে শৃঙ্খলিত করিবার চেষ্টা করিলে ধর্মবিপ্লব উপস্থিত হয়।" তাই

সমস্যার জটিলতা সত্ত্বেও তাঁর ভরসা এই যে "…মানুষ যেখানে স্বাধীন এবং স্বাধীনতাপ্রিয় সেখানে সত্বরই হউক, বিলম্বেই হউক, সংশোধনের পথ মুক্ত আছে" আর তার সঙ্গে তিনি তুলনা করছেন আমাদের অবস্থা : "যাহারা আপনার ধর্মবুদ্ধি এবং সংসারবুদ্ধি, দেহ এবং মনের প্রত্যেক স্বাধীনতাই বহুদিন হইতে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া জড়বৎ বসিয়া আছে, গ্রন্থবৎ আচার পালন করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কোনো একটা নূতন বিপৎপাত হইলে স্বাধীন প্রতিকার চেষ্টা প্রবল হইয়া উঠে না, উত্তরোত্তর তাহার চরম ফল ফলিতে থাকে—জ্বর আরম্ভ হইলে বিকারে গিয়া দাঁড়ায়।" ('কর্মের উমেদার', "সমাজ", রচনাবলী ১২শ খণ্ড, ৪৬৮-৬৯ পৃষ্ঠা)। অর্থাৎ এবারের তুলনায়, পাল্লা অন্যদিকেই যেন ভারী।

'ক্যাথলিক সোশ্যালিজমে' রবীন্দ্রনাথ সোশ্যালিস্ট তত্ত্বের সঠিকতা সম্পর্কে কিছু বলেন নি কিন্তু ইওরোপের রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় মেলে ঐ প্রবন্ধে, যেমন : "এতকাল এই সোশ্যালিজম মত প্রায় নাস্তিকতার সহচর স্বরূপে ছিল। প্রায় সমস্ত সোশ্যালিস্ট পত্রই নাস্তিকতার গোঁড়ামি প্রচার করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি একটা পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। রোমান-ক্যাথলিক ধর্মমণ্ডলী এই মতের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করিতেছে।…রোমান-ক্যাথলিক মণ্ডলীর অধিপতি স্বয়ং পোপ লিয়ো অল্পদিন হইল তীর্থযাত্রী একদল ফরাসী মজুরদের সম্বোধন করিয়া আপনার অনুকূল মত প্রকাশ্র করিয়াছেন।"

"ইহা একটা লক্ষণস্বরূপে ধরা যাইতে পারে। রোমান-ক্যাথলিক সম্প্রদায় প্রায়ই প্রবল পক্ষকে আশ্রয় করিয়া বললাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। রোমের মোহন্তটি য়ুরোপের নাড়ি টিপিয়া বসিয়া আছেন। সোশ্যালিজমের আসন্ন উন্নতি ও ব্যাপ্তি নিশ্চিত অনুমান না করিলে তাঁহারা যে সহসা ইহার প্রতি প্রকাশ্য প্রসন্নতা দেখাইতেন ইহা তেমন সম্ভবপর বোধ হয় না; তাঁহারা এমন বালুকার পরে কখনই চরণক্ষেপ করিতেন না যাহা দুই দণ্ডে ধ্বসিয়া যাইবে।" ('সাধনা', মাঘ, ১২৯৮—সাময়িক সারসংগ্রহ—২৪৯-৫০ পৃষ্ঠা)।

'সোশ্যালিজম' প্রবন্ধে কিছুটা নৈর্ব্যক্তিকভাবে প্রসঙ্গটির আলোচনার চেষ্টা সত্ত্বেও লেখকের সহানুভূতি কিন্তু সংশয়াতীত। বর্তমান সমাজের অন্তর্বিরোধের দিক সম্পর্কে আলোচনা করে প্রবন্ধের উপসংহার টানা হয়েছে এইভাবে : "সোশ্যালিজম সকলের মধ্যে ধনের সমবিভাগ করিয়া দিয়া পুনশ্চ সকলকে

একতন্ত্রের মধ্যে বাঁধিতে চাহে এবং এই উপায়ে সকলকে যথাসম্ভব স্বাধীনতার অধিকারী করিতে চাহে, মানব সমাজে ঐক্য এবং স্বাধীনতার সামঞ্জস্য ইহার উদ্দেশ্য।" ('সাধনা', জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯, ৯১ পৃষ্ঠা)

কিন্তু এর থেকে সিদ্ধান্ত করা অনুচিত যে অতঃপর সোশ্যালিজম সম্পর্কে তাঁর প্রত্যয় একেবারে নিঃসংশয় হয়ে উঠল। শুধু তত্ত্বের দিক থেকে একটা সামাজিক ন্যায়ের উপরে যে সোশ্যালিজমের প্রতিষ্ঠা এমন একটা বোধের কথাই বলা চলে। কিন্তু তার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে যে তাঁর সংশয় আছে তা বোঝা যায় 'ছিন্নপত্রের' এই চিঠি থেকে: "সোসিয়ালিস্টরা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধন বিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানি নে—যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তা হলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভারী হতভাগ্য! কেন না, পৃথিবীতে যদি দুঃখ থাকে তো থাক, কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু একটু ছিদ্র একটু সম্ভাবনা রেখে দেওয়া উচিত যাতে সেই দুঃখমোচনের জন্যে মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম চেষ্টা করতে পারে, একটা আশা পোষণ করতে পারে।"

('ছিন্নপত্রাবলী', ১০মে ১৮৯৩, ২০৪ পৃষ্ঠা)।

অর্থাৎ সম্ভব হলে সোশ্যালিজম হওয়াই উচিত—তার জন্য অবিশ্রাম চেষ্টা করতে হবে 'মানুষের উন্নত অংশকে'। তবে এই 'উন্নত অংশ' নিশ্চয়ই মার্কসবাদ-কথিত 'প্রলেটারিয়াট' নয়।

কিন্তু অবস্থাগতিকে যে ব্যাপারে সংশয় পোষণের কোন যো রইল না তা হচ্ছে বিদেশী আধিপত্যের চরিত্র সম্পর্কে। একদিন সন্ধ্যায় খাবার টেবিলে জনৈক ইংরেজ প্রিন্সিপাল ভারতীয় গৃহকর্তার মুখের উপরে অম্লান মুখে বলেছিলেন: "sacredness of life সম্পর্কে ভারতীয়দের কোনো ধারণা নেই"—সে কথা মনে পড়ায় জ্বলে উঠে রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে লিখলেন "যারা আমেরিকার Red Indian-দের উচ্ছন্ন করে দিলে, যারা নিঃসহায় দুর্বল অস্ট্রেলিয়ানদের মেয়েদের পর্যন্ত জন্তু শিকারের মতো বিনা দোষে বিনা কারণে গুলি করে মারত, যারা আমাদেব দেশী লোককে খুন করলে স্বজাতীয় বিচারকের কাছে দণ্ডযোগ্য হয় না, তারা নিরীহ করুণ-প্রকৃতি হিন্দুদের কাছে sacredness of life এবং high standard of morals preach করতে আসে?" ('ছিন্নপত্রাবলী', ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩, ১৭০ পৃষ্ঠা)।

১৮৯৩ সালে প্রকাশিত 'রাজনীতির দ্বিধা' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ লিখলেন: "য়ুরোপীয় জাতি য়ুরোপে যত সভ্য, যত সদয়, যত ন্যায়পর, বাহিরে

ততটা নহে…। যাহারা খ্রীস্টানদের নিকটে খ্রীস্টান অর্থাৎ গালে চড় খাইলে সময়বিশেষে অন্য গালটিও ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হয় তাহারাই স্থানান্তরে গায়ে পড়িয়া অখ্রীস্টানের এক গালে চড় মারিয়া তাহাকে অন্য গাল ফিরাইতে বলে এবং অখ্রীস্টান যদি দুর্বুদ্ধিবশত উক্ত অনুরোধ পালনে ইতস্তত করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে কান ধরিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিয়া তাহার ঘরের মধ্যে নিজের চৌকি টেবিল ও ক্যাম্পখাট আনিয়া হাজির করে।

"সভ্য খ্রীষ্টান আমেরিকায় কিরূপ প্রলয়ব্যাপার এবং অস্ট্রেলিয়ায় কিরূপ নিদারুণ লোকসংহার উপস্থিত করিয়াছিল সেই অপেক্ষাকৃত পুরাতন কথা পাড়িবার আবশ্যক দেখি না। দক্ষিণ আফ্রিকায় ম্যাটাবিলি যুদ্ধের বৃত্তান্ত ভালো করিয়া পর্যালোচনা করিয়া দেখিলেই অখ্রীষ্টানের গালে খ্রীষ্টানী চড কাহাকে বলে কতকটা বুঝিতে পারা যায়।" (রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, ৪০৪ পৃষ্ঠা)

ঐ প্রবন্ধে ইংরেজের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে আফ্রিকার বীর নেতা, লবেঙ্গুলার অপমৃত্যুর উল্লেখ আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় উনিশ শতকের হাইটির দাসবিদ্রোহের বিপ্লবী নেতা টুসাঁ ল্যুডারতুরে-র ও একেবারে হাল আমলে কঙ্গোনেতা প্যাট্রিস লুমুম্বার কাহিনী। রবীন্দ্রনাথের জীবনীকার, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে এই লবেঙ্গুলার কাহিনীই 'এবার ফিরাও মোরে' রচনার অন্যতম প্রত্যক্ষ প্রেরণা। (রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

'রাজনীতির দ্বিধা'য় আর একবার পরিচয় মেলে গণতন্ত্র ও সাম্রাজ্যরক্ষার মধ্যেকার বিরোধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সজাগ দৃষ্টির। এও তাঁর নজর এড়ায় না যে "আয়র্লণ্ড যখন ব্রিটেনিয়ার নিকট কোনো অধিকার প্রার্থনা করে তখন সে যেমন একদিকে খুনের ছুরিতে শান দিতে থাকে তেমনি অন্যদিকে ইংলণ্ডের ধর্মবুদ্ধিকে আপন দলে লইতে চেষ্টা করে। ভারতবর্ষ যখন বিদেশী স্বামীর দ্বারে আপন দুঃখ নিবেদন করিতে সাহসী হয় তখন সেও ইংরেজের ধর্মবুদ্ধিকে আপন সহায় করিবার জন্য ব্যগ্র হয়।" (রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠা)

এই 'ধর্মবুদ্ধি' আসলে ব্রিটেনের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ছাড়া আর কিছু নয়।

১৮৯৩ সালে প্রকাশিত 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আয়ার্লণ্ড ও ভারতের সঙ্গে ইংরেজের বিরোধের মাত্রা যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি

পাচ্ছে তার উল্লেখ করেছেন। এর কারণ উভয়পক্ষের বৈষয়িক স্বার্থ সংঘাত। ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত 'প্রসঙ্গ কথায়' দেখা যায় যে ঐ স্বার্থবুদ্ধি জাতিদ্বেষের সঙ্গে জড়িত: "ইংল্যাণ্ডপ্রবাসী জর্মান, ইতালীয় ও পোলীয় ইহুদিগণের প্রতি ইংরেজ অধিবাসীদের মনে যে শত্রুতার উদ্রেক করে তাহা যে কেবলমাত্র সুমহৎ জাতীয়ভাবের প্ররোচনায় তাহা বলিতে পারি না—উহার মধ্যে স্বার্থহানির আশঙ্কাই প্রবলতর। একে বিজাতীয় তাহার উপরে স্বার্থের সংঘর্ষ—এইরূপ স্থলে খ্রীষ্টীয় ধর্মনীতি এবং ন্যায়-অন্যায়ের উচ্চতর আদর্শ টেকাই কঠিন হয়। ইহাতে যে অন্ধতা আনয়ন করে, উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতারশ্মি তাহা ভেদ করিয়া উঠিতে পারে না।" (রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, ৫৫৯ পৃষ্ঠা)

ইংরেজের বৈষয়িক স্বার্থবুদ্ধি ও জাতিবিদ্বেষ যে মিশে গেছে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এ কথা বলতে গিয়ে তিনি ঐ প্রবন্ধেই লেখেন: "বুলগেরীয় ও আর্মানিদের প্রতি তুরস্কের অত্যাচার, ক্যুবানদের প্রতি স্পেনের কঠোরতা সম্বন্ধে পার্লামেন্টের সভ্যগণ প্রবলপক্ষের প্রতি উৎসাহ-করতালি বর্ষণ করে না। কিন্তু ভারতবর্ষীয়দের প্রতি হেস্টিংসের ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহাদের নীতিবোধ যে এমন সহসা সবেগে বিপর্যস্ত হইয়া যায় তাহার কারণ স্বার্থজনিত অন্ধতা এবং পরজাতি, বিশেষত প্রাচ্য পরজাতির প্রতি তাঁহাদের স্বাভাবিক সুগভীর অবজ্ঞাপরতা।" (রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, ৫৬০ পৃষ্ঠা)

এই জাতিবিদ্বেষ সম্পর্কে ঐ প্রবন্ধে তিনি আরো লিখলেন. "ইংরেজের এই পরবিদ্বেষ, বিশেষত প্রাচ্যবিদ্বেষ, নেটাল অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উপনিবেশে কিরূপ নখদন্ত বিকাশ করিয়া উঠিয়াছে তাহা কাহারও অগোচর নাই। অথচ ইহাও দেখা যাইতেছে, ইংরেজ ভারতীয় সৈন্যকে আফ্রিকার দুর্গম অরণ্যের মধ্যে রক্তপাত করাইতে কুণ্ঠিত নহেন। তখন এক রাজ্ঞীর প্রজা এক সাম্রাজ্যের অধিবাসী এমন সকল সৌভ্রাত্র্যমধুমাখা কথা শুনা যায়। ইংরেজ মহারাণীর অধিকার বিস্তারে প্রাণপাত করিতে ভারতবাসীর কানো বাধা নাই কিন্তু সেই অধিকারে স্থানলাভ করা তাহার পক্ষে নির্বাধ নহে।"' (রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, ৫৬১ পৃষ্ঠা)।

১৯০০ সালের বুয়ার যুদ্ধ ও চীনে বক্সার বিদ্রোহ দমনের উল্লেখও মেলে ঐ জাতিবিদ্বেষের সূত্রেই। ১৯০১ সালে লেখা 'সমাজভেদ' প্রবন্ধে কথাটা এইভাবে এল: "সভ্যতার ভিন্নতা আছে,—সেই বৈচিত্র্যই বিধাতার

অভিপ্রেত। এই ভিন্নতার মধ্যে জ্ঞানোজ্জ্বল সহৃদয়তা লইয়া পরস্পর প্রবেশ করিতে পারিলে, তবেই এই বৈচিত্র্যের সার্থকতা। যে শিক্ষা ও অভ্যাসে এই প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়, তাহা বর্বরতার সোপান।…যে আদর্শ অন্য আদর্শের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, তাহা আদর্শই নহে।

"সম্প্রতি য়ুরোপে এই অন্ধবিদ্বেষ সভ্যতার শান্তিকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। রাবণ যখন স্বার্থান্ধ হইয়া অধর্মে প্রবৃত্ত হইল, তখন লক্ষ্মী তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। আধুনিক য়ুরোপের দেবমণ্ডপ হইতে লক্ষ্মী যেন বাহির হইয়া আসিয়াছেন। সেইজন্যেই বোয়ার-পল্লীতে আগুন লাগিয়াছে, চীনে পাশবতা লজ্জাবরণ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং ধর্মপ্রচারকগণের নিষ্ঠুর উক্তিতে ধর্ম উৎপীড়িত হইয়া উঠিতেছে।" ('সমাজভেদ', "স্বদেশ", রচনাবলী ১১শ খণ্ড, ৪৮৮-৮৯ পৃষ্ঠা)

দু বছর পর 'ধর্মবোধের দৃষ্টান্তে' রবীন্দ্রনাথ স্বার্থবুদ্ধি ও জাতিবিদ্বেষের সংমিশ্রণে সারা পৃথিবী জুড়েই যে নৃশংসতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার সম্পর্কে লিখলেন: "…যেখানে স্বার্থবোধ প্রবল সেখানে দয়াধর্ম রক্ষা করার চেষ্টাকে য়ুরোপ দুর্বলতা বলিয়া ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যুদ্ধের সময় বিরুদ্ধ-পক্ষের সর্বস্ব জ্বালাইয়া দেওয়া, তাহাদের অনাথ শিশু ও স্ত্রীলোকদিগকে বন্দী করিবার বিরুদ্ধে কথা কহা 'সেন্টিমেন্টালিটি'। য়ুরোপে সাধারণত অসত্য-পরায়ণতা দূষণীয়, কিন্তু পলিটিক্সে একপক্ষ অপর পক্ষকে অসত্যের অপবাদ সর্বদাই দিতেছে। গ্ল্যাডস্টোনও এই অপবাদ হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। এই কারণেই চীনযুদ্ধে য়ুরোপীয় সৈন্যের উপদ্রব বর্বরতারও সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল এবং কংগো-প্রদেশে স্বার্থোন্মত্ত বেলজিয়ামের ব্যবহার পৈশাচিকতায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। দক্ষিণ-আমেরিকায় নিগ্রোদের প্রতি কিরূপ আচরণ চলিতেছে, তাহা নিউইয়র্কে প্রকাশিত 'পোস্ট' সংবাদপত্র হইতে…বিলাতি ডেলিনিউজে সংকলিত হইয়াছে। তুচ্ছ অপরাধের অছিলায় নিগ্রো স্ত্রীপুরুষকে পুলিসকোর্টে হাজির করা হয়—সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট তাহাদিগকে জরিমানা করে, সেই জরিমানা আদালতে উপস্থিত শ্বেতাঙ্গেরা শুধিয়া দেয় এবং এই সামান্য টাকার পরিবর্তে তাহারা সেই নিগ্রোদিগকে দাসত্বে ব্রতী করে। তাহার পর হইতে চাবুক, লৌহশৃঙ্খল ও অন্যান্য সকলপ্রকার উপায়েই তাহাদিগকে অবাধ্যতা ও পলায়ন হইতে রক্ষা করা হয়।…ডেলিনিউজ বলিতেছেন, রাশিয়ায় ইহুদীহত্যা, কংগোয় বেলজিয়ামের অত্যাচার প্রভৃতি

লইয়া প্রতিবেশীদের প্রতি দোষারোপ করা দুরূহ হইয়াছে।" (রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, ৪৯৩-৯৪ পৃষ্ঠা)

রবীন্দ্র-মানস সর্বদাই বিচিত্র টানাপোড়েনে জটিল। তাই অন্য দিকগুলির মতো তাঁর আন্তর্জাতিক চিন্তাক্ষেত্রেও পর্বভাগের চেষ্টা খুবই দুরূহ। কারণ নূতন পর্বও পুরাতনের জের টেনে চলে বেশ কিছুটা, আবার পুরনো পর্বে নূতন চিন্তা বীজাকারে নিহিত থাকে অনেক সময়ে। তবু উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত একটা পর্ব সম্ভবত চিহ্নিত করা যায় যার প্রধান লক্ষণগুলি হচ্ছে: বিদেশী আধিপত্যের নৃশংসতা সম্পর্কে তীব্র অনুভূতি; সেই নৃশংসতার পিছনে বৈষয়িক স্বার্থবুদ্ধির অস্তিত্ব এবং বৈষয়িক স্বার্থ ও জাতিবিদ্বেষের সংমিশ্রণে সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের ভয়াবহতা বৃদ্ধি সম্পর্কে চেতনা; দুই দেশের সম্পর্ক অসম ভিত্তিতে ঘটলে মানবিক দিক থেকে দু'পক্ষেরই অনিবার্য অবনতি সম্পর্কে ধারণা আর পাশ্চাত্য জাতিগুলির ঘোষিত গণতান্ত্রিক নীতির সঙ্গে সাম্রাজ্যরক্ষার স্বার্থের ক্রমাগত সংঘাত বৃদ্ধি এবং মানবিক সম্পদের দিক থেকে বর্তমান সভ্যতার রিক্ততা ক্রমেই প্রকট হয়ে ওঠা সম্পর্কে প্রাথমিক বোধ। এ সবের পাশাপাশি প্রাচ্যদেশের সাবেকী সমাজের প্রতি বেশ কিছুটা মমতাও জড়ানো রয়েছে এই পর্বে, হয়তো বা সে মমতা কিছুটা স্ফীতও হয়ে উঠেছে ঐ সময়ে জাতীয় চিন্তার ক্ষেত্রে 'আত্মশক্তির' পরে জোর দেওয়ার তাগিদে।

দ্বিতীয় পর্বের সূচনা ধরা যেতে পারে বিশ শতকের গোড়া থেকে। ১৯০১ সালে প্রকাশিত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতায়' একটি নতুন চেতনার উন্মেষ দেখা গেল এইভাবে: "স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধী য়ুরোপীয় সভ্যতার সীমায় সীমায় সেই বিরোধ উত্তরোত্তর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবী লইয়া ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি পড়িবে, তাহার পূর্বসূচনা দেখা যাইতেছে।" ('ভারতবর্ষ', রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড, ৪২০-২১ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ শুধু দুর্বলের উপরে প্রবলের অত্যাচার বা শোষণ নয়—সেই শোষণের এক্তিয়ার নিয়ে প্রবলে প্রবলে সংঘাত। এ চিন্তা আরো পরিচ্ছন্ন রূপ নিল ঐ বছরেই রচিত দুটি কবিতায়। এর মধ্যে—

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে
অস্ত গেল,—হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিনী

কবিতায় কবি হিংসার কারণ নির্দেশ করছেন এইভাবে :

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম…

এবং 'প্রলয়মন্থন ক্ষোভে' যে 'ভদ্রবেশী বর্বরতা' জেগে উঠেছে তার সম্পর্কেই বলেছেন :

জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।

এই পরিণতিও তিনি প্রত্যক্ষ করছেন মানস-চক্ষে, দ্বিতীয় কবিতায় :

স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে। অকস্মাৎ
পরিপূর্ণ স্ফীতি মাঝে দারুণ আঘাত
বিদীর্ণ বিকীর্ণ করি চূর্ণ করে তারে
কাল ঝঞ্ঝা-ঝঙ্কারিত দুর্যোগ-আঁধারে।

তাই অবস্থার চরিত্র তাঁর মতে হচ্ছে এই :

ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।

১৯০১ সালে 'বিরোধমূলক আদর্শ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঐ 'জাতিপ্রেম' সম্পর্কে লিখলেন : "…মিথ্যা দ্বারাই হউক, ভ্রমের দ্বারাই হউক, নিজেদের কাছে নিজেকে বড়ো করিয়া প্রমাণ করিতেই হইবে এবং সেই উপলক্ষে অন্য নেশনকে ক্ষুদ্র করিতে হইবে, ইহা নেশনের ধর্ম, ইহা প্যাট্রিয়টিজমের প্রধান অবলম্বন। গায়ের জোর, ঠেলাঠেলি, অন্যায় ও সর্বপ্রকার মিথ্যাচারের হাত হইতে নেশন-তন্ত্রকে উপরে তুলিতে পারে, এমন সভ্যতার নিদর্শন তো আমরা এখনও য়ুরোপে দেখিতে পাই না।" ('বিরোধমূলক আদর্শ', রচনাবলী ১০ম খণ্ড, ৫৯৪ পৃষ্ঠা)।

বাইরের মারমুখো আচরণ সত্ত্বেও আসলে যে 'জাতিপ্রেম' সামাজিক স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নয় এ কথাটাও তাঁর কাছে ধরা পড়ল সেদিন : "…বিনাশের চেহারা অনেক সময় ছদ্মবেশী। অনেক সময় পরিপূর্ণ সম্পদ তাহার মুখোসের মতো। কথিত আছে, ক্ষয়কাশে রোগীর কপোলে রক্তিম-লাবণ্য ফুটিয়া ফুটিয়া উঠে। সম্প্রতি উত্তরোত্তর ব্যাপ্যমান মিলিটারিজ্মের রক্তিমায় য়ুরোপের গণ্ডস্থল যে টকটকে হইয়া উঠিতেছে, সে কি স্বাস্থ্যের

লক্ষণ? তাহার ন্যাশানালত্বের ব্যাধি, অতিমেদস্ফীতির ন্যায় তাহার হৃদয়কে, তাহার মর্মস্থানকে, তাহার ধর্মনীতিকে আক্রমণ করিতেছে, ইহা কি আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাইতেছি না?" ('বিরোধমূলক আদর্শ', রচনাবলী ১০ম খণ্ড, ৫৯৫ পৃষ্ঠা)

এই ন্যাশনালত্বের ব্যাধির প্রতিঘাতে আবার প্রথম পর্বের একটি লক্ষণের কিছুটা পুনরাবৃত্তি দেখা গেল—আবার তুলনায় বোধ হতে লাগল ভারতীয় বা প্রাচ্য সমাজ বুঝি সামাজিক ঐক্যের সমস্যার সঠিক সমাধান দিতে পেরেছে। ১৯০২ সালে 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে' রবীন্দ্রনাথ লিখলেন: "...হয় পরকে কাটিয়া-মারিয়া-খেদাইয়া নিজের সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করা, নয় পরকে নিজের বিধানে সংযত করিয়া সুগৃহীত শৃঙ্খলার মধ্যে স্থান করিয়া দেওয়া, এই দুই রকম হইতে পারে। য়ুরোপ প্রথম প্রণালীটি অবলম্বন করিয়া সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে বিরোধ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে—ভারতবর্ষ দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়া সকলকেই ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে আপনার করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে।" ('ভারতবর্ষের ইতিহাস', "ভারতবর্ষ", রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড, ৩৮৩ পৃষ্ঠা)

কথাটার মধ্যে যে ফাঁক আছে সে উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের এ পর্বের শেষ সীমান্তে এসে ঘটেছিল। কিন্তু একদিকে ধনিক সমাজের সর্বগ্রাসী রূপ ও অন্যদিকে স্বদেশের ক্ষেত্রে 'আত্মশক্তির' পরে একান্ত বিশ্বাস তাঁকে তখন ঐ সিদ্ধান্তের ঘাটে ঠেলে তুলেছিল। তাই 'নববর্ষে' শান্তিনিকেতন আশ্রমে তিনি এমন কথাও বললেন যে: "...য়ুরোপীয় ভ্রমণকারী, নিজেদের দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীয়দের হিসাবে আমাদের দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীয়দের বিচার করে—ভাবে, তাহাদের দুঃখ ও অপমান ইহাদের মধ্যেও আছে। কিন্তু তাহা একেবারেই নাই। ভারতবর্ষে কর্মবিভেদ শ্রেণীবিভেদ সুনির্দিষ্ট বলিয়াই, উচ্চশ্রেণীয়েরা নিজের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য নিম্নশ্রেণীকে লাঞ্ছিত করিয়া বহিষ্কৃত করে না।" ('নববর্ষ', "ভারতবর্ষ", রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা)

এ তুলনার ভিতরে ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে মুগ্ধদৃষ্টির পরিচয় পাই এ পর্বের শেষভাগেই তা বহুলাংশে অপসারিত হয়। কিন্তু এ সময়ে কয়েকটি লেখায় এর পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। দিল্লীর দরবারের উদ্যোগকালে ১৯০· সালে লিখিত 'অত্যুক্তি'তে তিনি লিখলেন: "...ভারতবর্ষীয় সভ্যতায় বিনাশপ্লাবনের বেগ কোনোকালে ছিল না। ক্ষমতা ও স্বার্থ বিস্তার ভারতবর্ষীয় সভ্যতার

ভিত্তি নহে। য়ুরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি তাহাই।" ('ভারতবর্ষ', রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, ৪৫৩ পৃষ্ঠা)

'চীনেম্যানের চিঠি'রও সুর একই, শুধু চীনের সঙ্গে ভারতের সামাজিক সাদৃশ্য থেকে তিনি সেখানে সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, "ভারতবর্ষের সভ্যতা এশিয়ার সভ্যতার মধ্যে ঐক্য পাইয়াছে।" ('ভারতবর্ষ', রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড, ৪০৩ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ একদিকে ইওরোপ, অন্যদিকে এশিয়া। একদিকে রাষ্ট্র ও জাতি, অন্যদিকে সমাজ।

১৯০৪ সালে প্রকাশিত 'সফলতার সদুপায়ে' রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য গভীরতর। সেখানে ভারতে ইংরেজ-শাসন প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বুঝতে পারছেন যে "অধীন দেশকে দুর্বল করা, তাহাকে অনৈক্যের দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা, দেশের কোনো স্থানে শক্তিকে সঞ্চিত হইতে না দেওয়া, সমস্ত শক্তিকে নিজের শাসনাধীনে নির্জীব করিয়া রাখা—এ বিশেষভাবে কোন্ সময়কার রাষ্ট্রনীতি…যে-সময়ে পীড়িতের জন্য, দুর্বলের জন্য, দুর্ভাগ্যের জন্য দেশের করুণা উচ্ছ্বসিত হয় না, ক্ষুধিত ইম্পীরিয়ালিজম স্বার্থজাল বিস্তার করাকেই মহত্ত্ব বলিয়া গণ্য করিতেছে; যে-সময়ে বীর্যের স্থান বাণিজ্য অধিকার করিয়াছে এবং ধর্মের স্থান অধিকার করিয়াছে স্বাদেশিকতা—ইহা সেই সময়কার রাষ্ট্রনীতি।" ('সফলতার সদুপায়', 'আত্মশক্তি', রচনাবলী ৩য় খণ্ড, ৫৫৯-৬০ পৃষ্ঠা)

এই ইম্পীরিয়ালিজমের পক্ষ থেকে ভারতকে যে আহ্বান জানানো হচ্ছে সে-সম্পর্কে ঐ প্রবন্ধে তিনি লিখলেন: "কর্জন সাহেব…অত্যন্ত সহজ কথার মতো বলিয়াছিলেন, তোমরা আপনাদিগকে ইম্পীরিয়াল তন্ত্রের মধ্যে বিসর্জন দিয়া গৌরববোধ করিতে পার না কেন?…আমরা অস্ট্রেলিয়ায় তাড়িত, নাটালে লাঞ্ছিত, স্বদেশেও কর্তৃত্ব-অধিকার হইতে কতদিকেই বঞ্চিত, এমন স্থলে ইম্পীরিয়াল বাসরঘরে আমাদিগকে কোন্ কাজের জন্য নিমন্ত্রণ করা হইতেছে। কর্জন সাহেব আমাদের সুখদুঃখের সীমানা হইতে বহু উর্ধ্বে বসিয়া ডাকিতেছেন, ইহারা এত নিতান্তই ক্ষুদ্র, তবে ইহারা কেন ইম্পীরিয়ালের মধ্যে একেবারে বিলুপ্ত হইতে রাজি হয় না…? এ কেমনতর—যেমন একটা যজ্ঞে যেখানে বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, সেখানে যদি একটা ছাগশিশুকে সাদরে আহ্বান করিবার জন্য মাল্য সিন্দুর হস্তে লোক আসে এবং এই সাদর ব্যবহারে ছাগের একান্ত সংকোচ দেখিয়া তাহাকে বলা হয়—এ কী আশ্চর্য,

এত বড়ো মহৎ যজ্ঞে যোগ দিতে তোমার আপত্তি!" ('সফলতার সদুপায়' 'আত্মশক্তি', রচনাবলী ৩য় খণ্ড, ৫৬৮ পৃষ্ঠা)।

আপত্তি যে কেন তা উপমা বাদেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে পরের কয়েকটি লাইনে : "ইম্পীরিয়ালতন্ত্র নিরীহ তিব্বতে লড়াই করিতে যাইবেন, আমাদের অধিকার তাহার খরচ জোগানো; সোমালিল্যাণ্ডে বিপ্লব নিবারণ করিবেন, আমাদের অধিকার প্রাণদান করা; উষ্ণপ্রধান উপনিবেশে ফসল উৎপাদন করিবেন, আমাদের অধিকার সস্তায় মজুর জোগান দেওয়া। বড়োয়-ছোটোয় মিলিয়া যজ্ঞ করিবার এই নিয়ম।" (ঐ, রচনাবলী ৩য় খণ্ড, ৫৬৯ পৃষ্ঠা)

মনে রাখা দরকার এই সব রচনার সময়ে সারা বাংলা দেশ স্বদেশীর জোয়ারে তোলপাড় এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সে আন্দোলনের অন্যতম নায়ক। আবেদন-নিবেদন, বন্ধ্যা রাজনীতি বর্জন করে তিনি তখন দেশবাসীকে ডাক দিচ্ছেন আত্মশক্তির পরে দেশাত্মবোধের প্রতিষ্ঠা করতে। 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধে সেই আত্মশক্তিরও তিনি নজির টানলেন বিদেশ থেকে : "আমি যে বিবরণটি পাঠ করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা রুশীয় গবর্মেণ্টের অধীনস্থ বাহ্লীক প্রদেশীয়।.....সেই বাহ্লীক প্রদেশে জর্জীয় আর্মানিগণ যে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা যে কেন আমাদের পক্ষে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইবে না, তাহা জানি না। সেখানে 'একাবৃভেলি' নামধারী একটি জর্জীয় 'ন্যাশানালিস্ট' সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে ইহারা 'কার্স' প্রদেশে প্রত্যেক গ্রাম্য জিলায় স্বদেশীয় বিচারকদের দ্বারা গোপন বিচারশালা স্থাপন করিয়া রাজকীয় বিচারালয়কে নিস্প্রভ করিয়া দিয়াছেন।" ('অবস্থা ও ব্যবস্থা', 'আত্মশক্তি', রচনাবলী ৩য় খণ্ড, ৬১২-১৩ পৃষ্ঠা)

এই আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে সংগ্রাম চালাতে হচ্ছে ইম্পীরিয়ালিজমের সর্বগ্রাসিতার বিরুদ্ধে। ১৯০৫ সালে 'ইম্পীরিয়লিজম' প্রবন্ধে তিনি লিখলেন :

"যাঁহারা ইম্পীরিয়লিজমের খেয়ালে আছেন, তাঁহারা দুর্বলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে অকাতরে নির্মম হইতে পারেন এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই, পৃথিবীর নানাদিকেই তাহার দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে।" ('ইম্পীরিয়লিজম, 'রাজাপ্রজা', রচনাবলী ১০ম খণ্ড, ৪৩২ পৃষ্ঠা) রবীন্দ্রনাথ এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ "রুশিয়া, ফিনল্যাণ্ড-পোল্যাণ্ডকে নিজের বিপুল কলেবরের সহিত একেবারে বেমালুম মিশাইয়া লইবার জন্য যে" চাপ দিচ্ছে তার উল্লেখ করেছেন। আর ভারতবর্ষের ইম্পীরিয়লিজম প্রবন্ধে লিখেছেন : "নিজেদের নিশ্চিন্ত একাধিপত্যের জন্য

একটি বৃহৎ দেশের অসংখ্য লোককে নিরস্ত্র করিয়া তাহাদিগকে চিরকালের জন্য পৃথিবীর জনসমাজে সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও নিরুপায় করিয়া তোলা যে কতোবড়ো অধর্ম, কী প্রকাণ্ড নিষ্ঠুরতা, তাহা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই ; কিন্তু এই অধর্মের গ্লানি হইতে আপনার মনকে বাঁচাইতে হইলে একটা বড়ো বুলির ছায়া লইতে হয়।" ('ইম্পীরিয়লিজম', "রাজাপ্রজা", রচনাবলী ১০ম খণ্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা)।

সেই বুলি হচ্ছে 'ইম্পীরিয়লিজম'। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের এই ইম্পীরিয়লিজমের ধারণায় অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ মূল কথা নয়। অবশ্য বিদেশী আধিপত্যের সঙ্গে যে বৈষয়িক স্বার্থ বিশেষভাবেই জড়িত সে-কথা যে রবীন্দ্রনাথ জানেন তার পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। তবু তাঁর ইম্পীরিয়লিজমের বিশ্লেষণে বৈষয়িক স্বার্থের চাইতে এই সময়ে যে ভাবের দিকটাই বড়ো—প্রবন্ধের আলোচনা এবং এই প্রসঙ্গে 'নেশা' 'খেয়াল' 'বায়ুগ্রস্ততা' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ থেকেই তা বোঝা যায়।

১৯০৮ সালে 'পথ ও পাথেয়'তে বোয়ার-যুদ্ধে "শত্রুপক্ষের মনে ভয় উদ্রেক করিয়া দিবার জন্য তাহাদের গ্রামপল্লী উৎসাদিত করিয়া, ঘর-দুয়ার জ্বালাইয়া, খাদ্যদ্রব্য লুটপাট করিয়া নির্বিচারে বহুতর নিরপরাধ নরনারীকে নিরাশ্রয় করিয়া দেওয়া যুদ্ধব্যাপারের একটা অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে" ('রাজা-প্রজা', রচনাবলী ১০ম খণ্ড, ৪৫০ পৃষ্ঠা)—এ কথা স্পষ্টভাবে বলা হলেও ঐ প্রবন্ধের অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ প্রবল প্রতীচ্যের সমস্ত অত্যাচার সত্ত্বেও আমাদের পক্ষে তার শিক্ষার প্রতি বিমুখ হওয়া যে অসম্ভব সে কথাও লিখলেন পরিষ্কার ভাবে : "...য়ুরোপের মহাক্ষেত্রে মানবশক্তি প্রাণের প্রাবল্যে, বিজ্ঞানের কৌতুহলে, পণ্যসংগ্রহের আকাঙ্ক্ষায় যখন বিশ্বাভিমুখী হইয়া বাহির হইল তখন তাহারও একটি বৃহৎ প্রবল ধারা এই ভারতবর্ষে আসিয়াই বিধাতার আহ্বান বহন করিয়া আমাদিগকে আঘাতের দ্বারা জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে। ... শ্বেত ও কৃষ্ণ, মুসলমান ও খ্রীষ্টান, পূর্ব ও পশ্চিম কেহ আমাদের বিরুদ্ধ নহে ...।" ('রাজাপ্রজা', রচনাবলী ১০ম খণ্ড, ৪৫২-৫৩ পৃষ্ঠা)।

অর্থাৎ একদিকে ধনিক সভ্যতার নির্মমতা ও রিক্ততার প্রতি বিতৃষ্ণায় এবং অন্যদিকে জাতীয় ক্ষেত্রে আত্মশক্তির উপরে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠ করার তাগিদে যে প্রতীচ্য সমাজ সম্পর্কে অধৈর্য এবং প্রাচ্য সমাজ সম্পর্কে পক্ষপাতের ঘোর দেখা দিয়েছিল—'পথ ও পাথেয়'তে তার প্রতিবাদী সুর মৃদুভাবে হলেও শোনা গেল।

সেই সুর আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল ঐ বছরেই ‘পূর্ব ও পশ্চিম’ প্রবন্ধে : “য়ুরোপের প্রদীপের মুখে শিখা এখন জ্বলিতেছে। সেই শিখা হইতে আমাদের প্রদীপ জ্বালাইয়া লইয়া আমাদিগকে কালের পথে আর-একবার যাত্রা করিয়া বাহির হইতে হইবে। বিশ্বজগতে আমরা যাহা পাইতে পারি, তিন হাজার বৎসর পূর্বেই আমাদের পিতামহেরা তাহা সমস্তই সঞ্চয় করিয়া চুকাইয়া দিয়াছেন, আমরা এমন হতভাগ্য নহি এবং জগৎ এত দরিদ্র নহে ; আমরা যাহা করিতে পারি, তাহা আমাদের পূর্বেই করা হইয়া গেছে, এ কথা যদি সত্য হয়, তবে জগতের কর্মক্ষেত্রে আমাদের প্রকাণ্ড অনাবশ্যকতা লইয়া আমরা তো পৃথিবীর ভার হইয়া থাকিতে পারিব না…।” (‘পূর্ব ও পশ্চিম’, ‘সমাজ’, রচনাবলী ১২শ খণ্ড, ২৬৩-৪ পৃষ্ঠা)।

যে উগ্র জাতিপ্রেম নিজ দেশের মারাত্মক দুর্বলতা সম্পর্কে অন্ধ এবং অন্য দেশের সদ্‌গুণের প্রতিও অন্তঃসারশূন্যতা রবীন্দ্রনাথ শুধু অন্য দেশের ক্ষেত্রে নয়, জাতীয় আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এ দেশের ক্ষেত্রেও ইতিমধ্যে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। সে উপলব্ধির গভীরতা আমরা বুঝি যখন দেখি সমাজবিষয়ক প্রবন্ধে শুধু নয়, তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্যেও তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯০৯ সালে প্রকাশিত ‘গোরা’য় তাই তিনি গোরার জবানীতে বলছেন : “…আমি একটি নিষ্কণ্টক নির্বিকার ভাবের ভারতবর্ষ গড়ে তুলে সেই অভেদ্য দুর্গের মধ্যে আমার ভক্তিকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রক্ষা করবার জন্যে এতদিন আমার চারিদিকের সঙ্গে কী লড়াই না করেছি। আজ এক মুহূর্তে আমার সেই ভাবের দুর্গ স্বপ্নের মতো উড়ে গেছে। আমি একেবারে ছাড়া পেয়ে হঠাৎ একটা বৃহৎ সত্যের মধ্যে এসে পড়েছি।” (‘গোরা’, রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫৬৯ পৃষ্ঠা)

এই “বৃহৎ সত্যের মধ্যে”, ভারত থেকে মহাভারতের উপলব্ধির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ উত্তীর্ণ হলেন। সে মহাভারত একদিকে ভারতীয়, অন্যদিকে বিশ্বজাগতিক। ‘গীতাঞ্জলি’র গানেও প্রকাশ পেল এই নব উপলব্ধি। কবির নিমন্ত্রণ এল “জগতের আনন্দ যজ্ঞে”, তাঁর চিত্ত জাগ্রত হল “এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে” এবং উদাত্ত কণ্ঠে তিনি সেই ‘ভারত ভাগ্যবিধাতার’ জয়গান করলেন যাঁর সিংহাসনপাশে পূর্বপশ্চিম এসে মেলে। এখন থেকে ইওরোপকে শুধু ইওরোপ বলেই আর দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হল না কোনমতেই। উপলব্ধির দিক থেকে এই উত্তরণ-প্রক্রিয়াকে রবীন্দ্রনাথ

বর্ণনা করেছেন এই ভাবে : "জাগরণের প্রথম মুহূর্তে আমরা আপনাকে অনুভব করি, পরক্ষণেই চারিদিকের সমস্তকে অনুভব করিতে থাকি। আমাদের জাতীয় উদ্বোধনের প্রথম আরম্ভেই আমরা যদি নিজেদের পার্থক্যকেই প্রবলভাবে উপলব্ধি করিতে পারি তবে ভয়ের কারণ নাই—সেই জাগরণই চারিদিকের বৃহৎ উপলব্ধিকেও উন্মেষিত করিয়া তুলিবে। আমরা নিজেকে পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিব।" ('হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়', "পরিচয়", রচনাবলী ১৮শ খণ্ড, ৪৮১ পৃষ্ঠা)

আর বিশ্বের সংস্পর্শে ভারতবর্ষের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে ১৯১১ সালে 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারায়' তার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি প্রকাশ করলেন অনেকখানি নিজের মনের অবস্থাই : "নদীতে বাঁধের উপর বাঁধ বাড়িয়াছিল, কতকাল হইতে তাহাতে আর স্রোত খেলিতেছিল না, আজ কোথায় তাহার প্রাচীর ভাঙ্গিয়াছে—তাই আজ এই স্থির জলে আবার যেন মহাসমুদ্রের সংস্রব পাইয়াছি, আবার যেন বিশ্বের জোয়ার ভাটার আনাগোনা আরম্ভ হইয়াছে। এখনই দেখা যাইতেছে আমাদের সমস্ত নব্য উদ্‌যোগ সজীব হৃৎপিণ্ড চালিত রক্তস্রোতের মতো একবার বিশ্বের দিকে ছুটিতেছে একবার স্বাজাতিকতা তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতেছে। একবার সে সর্বত্বের প্রতি লোভ করিয়া নিজত্বকে ছাড়িতে চাহিতেছে, আবার সে দেখিতেছে নিজত্বকে ছাড়িয়া রিক্ত হইলে কেবল নিজত্বই হারানো হয় সর্বত্বকে পাওয়া যায় না। জীবনের কাজ আরম্ভ হইবার এই তো লক্ষণ। এমনি করিয়া দুই ধাক্কার মধ্যে পড়িয়া মাঝখানের সত্য পথটি আমাদের জাতীয় জীবনে চিহ্নিত হইয়া যাইবে এবং এই কথা উপলব্ধি করিব যে, স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্বজাতিকে ও সর্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়,—এই কথা নিশ্চিতরূপেই বুঝিব যে আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।" ('পরিচয়', রচনাবলী, ১৮শ খণ্ড, ৪৫১ পৃষ্ঠা)

১৯১২ সালে প্রকাশিত 'যাত্রার পূর্বপত্র' দিয়ে রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তার এই পর্ব শেষ করা যেতে পারে। ঐ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : "য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তুগত, তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই, এই একটা বুলি চারিদিকে প্রচলিত হইয়াছে। যে কারণেই হউক, এইরূপ জনশ্রুতি যখন

প্রচার লাভ করিতে আরম্ভ করে তখন তাহার আর সত্য হওয়ার প্রয়োজন থাকে না।…

"এ কথা গোড়াতেই মনে রাখা দরকার মানবসমাজে যেখানেই আমরা যে-কোনো মঙ্গল দেখি-না কেন, তাহার গোড়াতেই আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। অর্থাৎ, মানুষ কখনোই সত্যকে কল দিয়া পাইতে পারে না, তাহাকে আত্মা দিয়াই লাভ করিতে হয়। য়ুরোপে যদি আমরা মানুষের কোনো উন্নতি দেখি তবে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে, সে উন্নতির মূলে মানুষের আত্মা আছে কখনোই তাহা জড়ের সৃষ্টি নহে।…" ('পথের সঞ্চয়', রচনাবলী ২৬শ খণ্ড, ৪৬২ পৃষ্ঠা)

এর সঙ্গে ১৮৯১ সালে প্রকাশিত 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের' এই কথাগুলির তুলনা করলে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ নিজেকে অতিক্রম করে কতটা অগ্রসর হয়েছেন: "বেগবতী মহানদী নিজে বালুকা সংগ্রহ করে এনে অবশেষে নিজের পথরোধ করে বসে। য়ুরোপীয় সভ্যতাকে সেই রকম প্রবল নদী বলে এক-একবার মনে হয়। তার বেগের বলে, মানুষের পক্ষে যা সামান্য আবশ্যক এমন সকল বস্তুও চতুর্দিক থেকে আনীত হয়ে রাশিকৃত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সভ্যতার প্রতিবর্ষের আবর্জনা পর্বতাকার হয়ে উঠছে।…যদি আমার আশঙ্কা সত্য হয় তবে য়ুরোপীয় সভ্যতা হয়তো বা তলে তলে জড়ত্বের এক প্রকাণ্ড মরুভূমি সৃজন করছে।"

এ কথাগুলির ভিতরে সত্য অবশ্যই আছে—বিশেষ করে রচনাকালের হিসাবে এই বিশ্লেষণ সত্যই আশ্চর্যরকম তীক্ষ্ণ—কিন্তু এ বিচার কিছুটা একপেশে। তার তুলনায় দ্বিতীয় পর্বশেষের রচনা অনেক বেশী পরিণত।

সাধারণভাবে দ্বিতীয় পর্বের (মোটের উপর ১৯০১ থেকে ১৯১২-১৩ সাল পর্যন্ত) লক্ষণগুলি এই: প্রবল জাতিগুলির স্বার্থ যে পরস্পরবিরোধী এবং সেই বিরোধী স্বার্থের টানে পৃথিবী নিয়ে টানাটানি কাড়াকাড়ি যে উত্তরোত্তর তীব্র হয়ে উঠবে সে-সম্পর্কে চেতনা, এই স্থূল স্বার্থপুষ্টির চেষ্টাকেই যে 'ন্যাশনালিজম' বা 'জাতিপ্রেমের' আড়ালে প্রচ্ছন্ন রাখা হয় সে-সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা, বৃহৎ জাতিগুলি যে দুর্বলদের গ্রাসের জন্য ইম্পিরিয়ালিজমের আশ্রয় নেয় সে-সম্পর্কে অনুভূতি, যে উগ্র জাতিপ্রেম নিজ জাতিকে একান্ত করে, সারা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চায়—একদিকে 'my country right or wrong' নীতিতে বিশ্বাস করে অন্যদিকে জাতিবিদ্বেষে প্রশ্রয় দেয়

তার দুর্লক্ষণ থেকে আমাদের জাতীয় আন্দোলনও মুক্ত নয় এই বোধ। এ সবের পাশাপাশি দ্বিতীয় পর্বের গোড়ার দিকে দেখা যায় পাশ্চাত্ত্যবিমুখতার ঝোঁক (প্রথম পর্বের চাইতে অনেক বেশী তীব্র আকারে) এবং তার তাগিদে ও স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনায় সামাজিক দিক দিয়ে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা ইম্পিরিয়ালিজমের আলোচনায় তার অর্থনৈতিক ভিত্তির চাইতে ভাবগত দিকের পরেই জোর। তবে এই পর্বের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ যে ভারতবর্ষকে একান্ত করে দেখার প্রবৃত্তিকে অতিক্রম করেন, ইওরোপের যথার্থ সত্তাটিকে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেন এবং বিশ্ববোধের ভিত্তিতে মহাভারতের ভাবরূপ রচনায় ব্রতী হন—সে কথাও আমরা জেনেছি।

তৃতীয় পর্বের সূচনা ধরা যেতে পারে ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধার সময় থেকে। ঐ বছরেই 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত 'লডাইয়ের মূল' প্রবন্ধটি নবপর্বের সূচক। ঐ প্রবন্ধে জার্মান সামরিকতাবাদের উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি বললেন যে এখন যুদ্ধ বেধেছে "ক্ষত্রিয়ে ও বৈশ্যে এবং ইহার পরে আর একটা লডাই সামনে রহিল, যে বৈশ্য শূদ্রে, মহাজনে মজুরে—কিছুদিন হইতে তার আয়োজন চলিতেছে। সেইটা চুকিলেই বর্তমান মন্বর পালা শেষ হইয়া নূতন মন্বন্তর পডিবে।" ('লড়াইয়ের মূল', "কালান্তর", রচনাবলী ২৪ খণ্ড, ২৭০ পৃষ্ঠা)।

বর্তমানের যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ে ও বৈশ্যে এ-কথা বলেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হলেন না। তিনি ধরতে চাইলেন তার মূল কোথায়। তাঁর মতে "সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজক যুগের পতন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া গেছে। এক সময়ে জিনিসই ছিল বৈশ্যের সম্পত্তি, এখন মানুষ তার সম্পত্তি হইয়াছে। এ-সম্বন্ধে সাবেক কালের সঙ্গে এখনকার কালের তফাত কি বুঝিয়া দেখা যাক। সে-আমলে যেখানে রাজত্ব রাজাও সেইখানেই, জমাখরচ সব একজায়গাতেই। কিন্তু এখন বাণিজ্যপ্রবাহের মতো রাজত্বপ্রবাহের দিনরাত আমদানি রপ্তানি চলিতেছে। ইহাতে পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটা নূতন কাণ্ড ঘটিতেছে—তাহা এক দেশের উপর আর এক দেশের রাজত্ব এবং সেই দুই দেশ সমুদ্রের দুই পারে।" ('লডাইয়ের মূল', "কালান্তর", রচনাবলী ২৪ খণ্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা)

রবীন্দ্রনাথের মতে "য়ুরোপের সেই প্রভুত্বের ক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা। এখন মুশকিল হইয়াছে জার্মানীর। তার ঘুম ভাঙিতে বিলম্ব হইয়াছিল। সে ভোজের শেষ বেলায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত। ক্ষুধা যথেষ্ট,

মাছেরও গন্ধ পাইতেছে অথচ কাঁটা ছাড়া আর বড়ো কিছু বাকি নাই। এখন রাগে তার শরীর গমগম করিতেছে। সে বলিতেছে আমার জন্য যদি পাত পাড়া না হইয়া থাকে আমি নিমন্ত্রণপত্রের অপেক্ষা করিব না আমি গায়ের জোরে যার পাই তার পাত কাড়িয়া খাইব।" (ঐ, রচনাবলী ২৪ খণ্ড, ২৭১-২৭২ পৃষ্ঠা)

জার্মান সামরিকতাবাদের পিছনে রয়েছে এই স্বার্থবুদ্ধি। অর্থাৎ আসলে লড়াই ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে নয়, বৈশ্যে বৈশ্যেই—তবে একদল বৈশ্যকে ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণ করতে হচ্ছে অবস্থাগতিকে।

জার্মান সামরিকতাবাদের বিরুদ্ধে অন্য সাম্রাজ্যবাদীরা যে দস্যুবৃত্তির অভিযোগ আনছে তার কপটতা উদ্‌ঘাটিত করলেন রবীন্দ্রনাথ এইভাবে: "আজ ক্ষুধিত জার্মানীর বুলি এই যে, প্রভু এবং দাস দুই জাতের মানুষ আছে। প্রভু সমস্ত আপনার জন্য লইবে, দাস সমস্তই প্রভুর জন্য জোগাইবে··· য়ুরোপের বাহিরে যখন এই নীতির প্রচার হয় তখন য়ুরোপ ইহার কটুত্ব বুঝিতে পারে নাই। আজ তাহা নিজের গায়ে বাজিতেছে।" (ঐ, রচনাবলী ২৪ খণ্ড, ২৭২ পৃষ্ঠা)

তারপর প্রবন্ধটির শেষ লাইনে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ যেখানে গিয়ে পৌঁছল সন তারিখের বিচারে সত্যই তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লাইনটি এই: "কিন্তু জার্মান-পণ্ডিত যে-তত্ত্ব আজ প্রচার করিতেছে এবং যে-তত্ত্ব আজ মদের মতো জার্মানীকে অন্যায় যুদ্ধে মাতাল করিয়া তুলিল সে তত্ত্বের উৎপত্তি তো জার্মান-পণ্ডিতের মগজের মধ্যে নহে, বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে।" (ঐ, রচনাবলী ২৪ খণ্ড, ২৭২ পৃষ্ঠা)

যে-সময়ে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব পুরোপুরি ব্রিটিশরাজের সহায়তায় তৎপর, বড জোর এই সুযোগে তাড়াতাড়ি লক্ষ্ণৌ-চুক্তি-রূপী গোঁজামিলের চাপ দিয়ে কিছু অধিকার আদায়ের চেষ্টায় ব্যাপৃত, 'সন্ত্রাসবাদীদের' একাংশ যেখানে 'শত্রুর শত্রু-আমাদের বন্ধু' এই বুদ্ধিতে জার্মানীর সঙ্গে চক্রান্তে লিপ্ত, পশ্চিমের দেশগুলিতে বিরোধীপক্ষীয় 'সোশাল-ডেমোক্র্যাসী' যখন শ্রমিক-শোভন আন্তর্জাতিকতা বিসর্জন দিয়ে নিজ নিজ ধনিক সরকারের লেজুড়ে পরিণত, রাসেল, মোরেল-এর মতো মুষ্টিমেয় সৎবুদ্ধিজীবী যখন চরম শান্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিবেকগত আপত্তি জানাবার ফলে হয় কারারুদ্ধ নয়তো বা রোমাঁ রলাঁর মতো দেশ থেকে নির্বাসিত ও যুদ্ধের ঊর্ধ্বে অবস্থানের

কষ্টকল্পনায় মগ্ন—সারা পৃথিবীতে যখন লেনিন, কার্ল লিবক্রেখট, রোজা লুক্সেমবুর্গ ও মুষ্টিমেয় 'জিমারভাল্ড বামপন্থীরাই' শুধু যুদ্ধের স্বরূপ জেনে বিপ্লবের পথ ধরে দেন নিঃসংশয়ে—তখন মহাযুদ্ধের ও বিশ্বের গতি নির্ধারক রাজনীতির আবর্ত থেকে দূরে একজন বাঙালী কবি যে লড়াইয়ের মূল খুঁজে পাবেন জাতিবিশেষের জঙ্গী প্রবৃত্তির ভিতরে নয়, বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে অর্থাৎ সাধারণভাবে য়ুরোপীয় সমাজব্যবস্থার ভিতরেই—এ কি কম আশ্চর্যের কথা। 'লড়াইয়ের মূল' সে-দিক থেকে সত্যই তৃতীয় পর্বের দিগ্‌দর্শনী। সমাজচিন্তা যে ঐ সময়ে তাঁর মনকে বিশেষ আলোড়িত করছিল তা বোঝা যায় ঐ ১৯১৪ সালেই 'লোকহিত' প্রবন্ধে যখন রবীন্দ্রনাথকে লিখতে দেখি : "ধনের ধর্মই অসাম্য। জ্ঞান ধর্ম কলাসৌন্দর্য পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করিলে বাড়ে বই কমে না, কিন্তু ধন জিনিসটাকে পাঁচজনের কাছ হইতে পোষণ করিয়া লইয়া পাঁচজনের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা না করিলে সে টেঁকে না। এইজন্য ধনকামী নিজের গরজে দারিদ্র্য সৃষ্টি করিয়া থাকে। তাই ধনের বৈষম্য লইয়া যখন সমাজে পার্থক্য ঘটে তখন ধনীর দল সেই পার্থক্যকে সমূলে ঘুচাইতে ইচ্ছা করে না, অথচ সেই পার্থক্যটা যখন বিপদ-জনক হইয়া উঠে তখন বিপদটাকে কোনো মতে ঠেকো দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে চায়।" (লোকহিত, "কালান্তর", রচনাবলী ২৪শ খণ্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা)

আমাদের দেশের সঙ্গে পশ্চিমের জনসাধারণের তফাত কোথায় সে-কথা রবীন্দ্রনাথ এইভাবে দেখলেন : "এখন ও-দেশে লোক সাধারণ 'কেবল সেন্সস-রিপোর্টের তালিকাভুক্ত নহে, সে একটা শক্তি। সে আর ভিক্ষা করে না, দাবি করে। এই জন্য তাহার কথা দেশের লোকে আর ভুলিতে পারিতেছে না; সকলকে সে বিষম ভাবাইয়া তুলিয়াছে। আমাদের দেশে লোক সাধারণ এখনো নিজেকে লোক বলিয়া জানে না, সেইজন্য জানান দিতেও পারে না। তাহাদের নিজের অভাব ও বেদনা তাহাদের নিজের কাছে বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত। তাহাদের একার দুঃখ যে একটি বিরাট দুঃখের অন্তর্গত এইটি জানিতে পারিলে তবে তাহাদের দুঃখ সমস্ত সমাজের পক্ষে একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইত।" (ঐ, রচনাবলী ২৪শ খণ্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা)

পশ্চিমের অস্থির গতিশীল জীবনের তুলনায় ভারতের সনাতনত্ব ও স্থবিরতা এ-সময়ে কবির কাছে বিশেষ ভাবেই দুঃসহ বোধ হচ্ছিল। তাই একদিকে উৎসারিত হল বলাকার কবিতায় গতিময়তার জয়গান এবং

অন্যদিকে 'বিবেচনা ও অবিবেচনা'র মতো প্রবন্ধ। আসলে আমাদের সমাজের 'ঐ যে প্রবীণ, ঐ যে পরম পাকা' যার চক্ষু-কর্ণ 'দুইটি ডানায় ঢাকা' তাদের বিরুদ্ধেই তিনি 'বিবেচনা ও অবিবেচনায়' লিখলেন : "যাঁহারা দেশকে ঠাণ্ডা করিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহারা অনেকদিন একাধিপত্য করিয়াছেন।...কিন্তু দেশের নবযৌবনকে তাঁহারা আর নির্বাসিত করিয়া রাখিতে পারিবেন না। তাঁহারা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া থাকুন, আর বাকি সবাই পথেঘাটে বাহির হইয়া পড়ুক। সেখানে তারুণ্যের জয় হউক।" ('কালান্তর', রচনাবলী ২৪শ খণ্ড ২৬০ পৃষ্ঠা)। সনাতনত্বের বিরুদ্ধে তারুণ্যের জয় ঘোষণা করে বললেন :

"ঘুচিয়ে দে ভাই পুঁথি-পোড়োর কাছে
পথে চলার বিধিবিধান যাচা।
আয় প্রমুক্ত, আয়রে আমার কাঁচা।"

এই স্বচ্ছ উদার দৃষ্টির ফলেই এখন তিনি অনায়াসে বলতে পারলেন :

"হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে,
হেরিনু আজিকে নিমেষে
মিলে গেছে ওগো বিশ্বদেবতা
মোর সনাতন স্বদেশে।"

এদিকে যুদ্ধের প্রচণ্ডতা বাড়ছে দিনের পর দিন। তবু কবির বোধ হচ্ছে 'লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোলের' 'মাঝে পথ চিরে চিরে নতুন সমুদ্রতীরে তরী নিয়ে পাড়ি' দিতেই হবে। এও বোঝা যাচ্ছে যে—

"পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা,
আর চলিবে না।"

যুদ্ধের যন্ত্রণা, লাঞ্ছনাকে তিনি খাটো করে দেখলেন না কিন্তু তা সত্ত্বেও বললেন এ সর্বনাশের জন্য :

"ওরে ভাই, কার নিন্দা করো তুমি। মাথা কর নত।
এ আমার এ তোমার পাপ।"

সে পাপকে তিনি চিহ্নিত করলেন এইভাবে :

"বহুদিন হতে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়,—
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত ক্ষোভ,

জাতি অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান।"

আর্ত বিশ্ববাসীর সঙ্গে একযোগে তাই কবির জিজ্ঞাসা :

"বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা।
স্বর্গ কি হবে না কেনা।
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন।"

এ প্রশ্নের সদুত্তর নিশ্চিত করার জন্য কবি এবারে যুদ্ধে নামলেন—সমস্ত পাপের মধ্যে যেটি মূল সেই 'ন্যাশনালিজম' বা 'জাতিপ্রেমের' বিরুদ্ধে। ১৯১৫ সালের ১১ই জুলাই এণ্ড্রুস সাহেবের কাছে লেখা এক চিঠিতে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ পেল এইভাবে : "Will Europe never understand the genesis of the present war, and realise that the true cause lies in her own growing scepticism towards her own ideals—those ideals that have helped her to be great?" (*Letters to a friend*)

অর্থাৎ ন্যাশনালিজম ঐ সব আদর্শের বিরোধী। ঐ চিঠিতে আর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য : "...weakness is heinous because it is a menace to the strong and the surest cause of downfall for others than those who own it. It is a moral duty for every race to cultivate strength, so as to be able to help the world's balance of power to remain even. We are doing England the greatest disservice possible by making it easy for her to despise us and yet to rule ; to feel very little sympathy for us and yet to judge us"

অর্থাৎ,দুর্বলকে প্রবলের সমকক্ষ হয়ে উঠতে হবে শুধু নিজের নয় সমগ্রের, এমনকি প্রবলের স্বার্থেও। এই চিন্তা আরো জোরালো ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল কিছুদিন পরে—যথাস্থানে আমরা তা দেখবো।

জাপানে, আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বক্তৃতা দেন, পরের বছর সেগুলি Nationalism গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। কবি সেখানে প্রকাশ্য সংগ্রামে অবতীর্ণ 'nationalism'-এর পাপের বিরুদ্ধে। তিনি লিখলেন :

"This European war of Nations is the war of retribution.

Man, the person, must protest for his very life against the heaping up of things where there should be the heart, and systems and policies where there should flow living human relationship. The time has come when, for the sake of the whole outraged world, Europe should fully know in her own person the terrible absurdity of the thing called the Nation.

"The Nation has thriven long upon mutilated humanity." (*Nationalism. p.* 43-44)

এই 'ন্যাশনালিজম' যে-কি আমরা আগেই তা কিছুটা দেখেছি। এর বিভীষিকার দিক সম্পর্কে এবারে তিনি জলন্ত ভাষায় লিখলেন :

"The Nation, with all its paraphernalia of power and prosperity, its flags and pious hymns, its blasphemous prayers in the churches and the literary mock thunders of its patriotic bragging cannot hide the fact that the Nation is the greatest evil for the Nation, that all its precautions are against it. . Its one wish is to trade on the feebleness of the rest of the world. For this the Nation has had and still has its richest pastures in Asia". (*Nationalism, p.* 29-30)

রবীন্দ্রনাথের মতে "In this war the death-throes of the Nation have commenced. Suddenly, all its mechanism going mad, it has begun the dance of the Furies,, shattering its own limbs, scattering them into the dust

"Those who have any faith in Man can not but fervently hope that the tyranny of the Nation will not be restored to all its former teeth and claws, to its far-reaching iron arms and its immense inner cavity, all stomach and no heart " (*Nationalism, p.* 44-45)

অর্থাৎ তাঁর মতে 'ন্যাশনালিজম' ব্যাপারটিই মানবতাবিরোধী—তবে তার আয়ু শেষ হয়ে আসছে কিছুদিনের মধ্যেই। তিনি তার উদ্ভব নির্দেশ করলেন এইভাবে : "...greed of wealth and power can never have a limit, and compromise of self-interest can never attain the final spirit of reconciliation. They must go on breeding jealousy and suspicion to the end—the end which only comes through some sudden catastrophe or a spiritual rebirth". (*Nationalism p.* 11-12)

কবির সংগ্রাম সেই spiritual rebirthএর জন্যই। কিন্তু তার জন্য গোড়াতেই লক্ষ্য স্পষ্ট হওয়া দরকার। সে লক্ষ্য সম্পর্কে তিনি লিখলেন: "Neither the colourless vagueness of cosmopolitanism, nor the fierce self-idolatry of nation-worship, is the goal of human history". (*Nationalism*, *p*. 5)

আন্তর্জাতিকতা ও জাতীয়তা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা বুঝবার পক্ষে এই লাইনটি মহামূল্যবান। এও লক্ষণীয় যে 'ন্যাশানালিজমের' বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে এবারে আর তিনি প্রতীচ্যবিমুখ হয়ে একান্তভাবে ভারতবর্ষের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন না। তিনি লিখলেন: "...the west is necessary to the East. We are complementary to each other because of our different outlooks upon life which have given us different aspects of truth. Therefore if it be true that the spirit of the West has come upon our fields in the guise of a storm it is nevertheless scattering living seeds that are immortal." (*Nationalism*, *p*. 15)

জাপানের বক্তৃতাতেও তিনি বললেন, "I must not hesitate to acknowledge where Europe is great, for great she is without doubt।" ইওরোপের মহত্ত্ব কোথায়, তার পিছনেও যে আত্মিক শক্তি বর্তমান—এ সব কথার বিশদ উল্লেখের পর তিনি লিখলেন: "Europe is supremely good in her beneficence where her face is turned to all humanity; and Europe is supremely evil in her maleficent aspect where her face is turned only upon her own interest..." (*Nationalism*, *p*. 67)

জাপান প্রসঙ্গে এবার রবীন্দ্রনাথের লেখায় সংশয় দেখা গেল কিছুটা: "The whole world waits to see what this great eastern nation is going to do with the opportunities and responsibilities she has accepted from the hands of the modern time. If it be a mere reproduction of the West, then the great expectation she has raised will remain unfulfilled." (*Nationalism*, *p*. 55)

অর্থাৎ প্রশ্ন আর আগেকার মতো 'প্রাচ্য বনাম প্রতীচ্যের' নয়। কারণ শুধু যে জাপানের লক্ষণ উদ্বেগজনক তাই নয়—এ ব্যাপারও তাঁর চোখে পড়েছে যে: "...Those who have made the gain of money their highest end are unconsciously selling their life and soul to rich persons or to the combinations that represent money. ...In the

so-called free countries the majority of the people are not free, they are driven by the minority to a goal which is not even known to them. (*Nationalism, p.* 121) অর্থাৎ সমস্যার জটিলতা কবির কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে ক্রমশই।

স্বভাবতই 'ন্যাশনালিজমের' বক্তব্য সাম্রাজ্যবাদীদের মনঃপূত হয়নি। আমেরিকায় একটি কাগজে স্পষ্টই লেখা হল: "Such sickly saccherine mental poison with which that Tagore would corrupt the minds of the youth of our great united states"—এ-সব বরদাস্ত করা হবে না। রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: "'ন্যাশনালিজম' গ্রন্থ ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয়, ফরাসীদেশে ইহার অনুবাদ হয় অনেক পরে। শোনা যায়, যুদ্ধের মধ্যে ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে টাইপ করা কপি সৈনিকদের মধ্যে চালাচালি হইত।" (রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড, ৪৩৪ পৃষ্ঠা) এর থেকে 'Nationalism' সাম্রাজ্যবাদীদের মনে না ধরার আসল কারণটি পরিষ্কার হয় সকলের কাছে।

এ-সময়ে কবি একদিকে যেমন 'জাতি-প্রেম'-রূপী বিভীষিকার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছেন প্রাণপণে তেমনই অন্যদিকে আয়োজন করছেন নতুন দুনিয়ার উপযোগী ব্যবস্থা গড়ে তোলার—অবশ্য তাঁর মতো করে। ১৯১৬ সালের ১১ই অক্টোবর রথীন্দ্রনাথকে তিনি লিখলেন: "...শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে—ঐখানে সার্বজাতিক মনুষ্যত্ব চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে—স্বাজাতিক সঙ্কীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসচে—ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। ঐ জায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত ভূগোল বৃত্তান্তের অতীত করে তুলব এই আমার মনে আছে—সর্বমানবের প্রথম জয়ধ্বজা ঐখানে রোপণ হবে। পৃথিবী থেকে স্বাদেশিক অভিমানের নাগপাশ বন্ধন ছিন্ন করাই আমার শেষ বয়সের কাজ।" (চিঠিপত্র, ২য় খণ্ড, ৫৫-৫৬ পৃষ্ঠা)

পরের চিঠিতে তিনি লিখলেন: "বাংলা দেশের চিত্ত সর্বকালে সর্বদেশে প্রসারিত হোক, বাংলা দেশের বাণী সর্বজাতি সর্বমানবের বাণী হোক।... আমরা যত দুঃখ যত দারিদ্র্য যত-অপমানই পাই না কেন মাথায় করে নেব—এই সমস্ত দুঃখ অপমান আমাদের মাথার মাণিক হয়ে উঠবে যদি আমরা জানব

ইতিহাসের সর্বোচ্চ সিদ্ধিকে স্বীকার করতে পারি। বিধাতা আমাদের দেশছাড়া করে দিয়েছেন। কেন? আমরা সর্বদেশের বৈরাগী হব—আমরা মানব বিধাতার রাজপথে মহামানবের গান গেয়ে বেড়াব।" (চিঠিপত্র, ২য় খণ্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা)

রবীন্দ্রনাথের এই "স্বাদেশিক অভিমানের নাগপাশ বন্ধন ছিন্ন করার" পণ থেকে অবশ্যই মনে করার কারণ নেই যে অতঃপর দেশাত্মবোধের নিবিড় অনুভূতি তাঁর মন থেকে মুছে গেল নিঃশেষে। কবির পূর্বাপর বৃত্তান্ত যিনি জানেন তাঁর পক্ষে অমন আজগুবি ধারণার প্রশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয় কোনো ক্রমেই। যা ঘটল তা হচ্ছে দেশাত্মবোধের দিগন্ত আরো প্রসারিত হল—আন্তর্জাতিকতার রঙে রঙে রঙিন হওয়ার ফলে দেশাত্মবোধ আরো যেন গভীর হয়ে উঠল আগের থেকে।

ইওরোপীয় শক্তিগুলির 'জাতিপ্রেমের' বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হলেও রবীন্দ্রনাথের মনে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মৌলিক পার্থক্য সম্পর্কে যে আগের মতো নিশ্চিত প্রত্যয় এ-সময়ে দেখা যায় নি তার কারণ শুধু জাপানের মতিগতি নয়, ভারতের জাতীয় আন্দোলনেরও কিছু কিছু লক্ষণ। ১৯১৬ সালে 'ঘরে বাইরে'তে নিখিলেশের জবানীতে যখন তিনি লিখলেন: "...আমার পণ এই যে, কোনো একটা উত্তেজনার কড়া মদ খেয়ে উন্মত্তের মতো দেশের কাজে লাগব না।... আজ সমস্ত দেশের ভৈরবীচক্রে মদের পাত্র নিয়ে আমি যে বসে যাইনি এতে সকলেরই অপ্রিয় হয়েছি। দেশের লোক ভাবছে আমি খেতাব চাই কিংবা পুলিসকে ভয় করি; পুলিস ভাবছে ভিতরে আমার কুমতলব আছে বলেই বাইরে আমি এমন ভালোমানুষ। তবু আমি এই অবিশ্বাস ও অপমানের পথেই চলেছি।

"কেন না, আমি এই বলি, দেশকে সাদাভাবে সত্যভাবে দেশ বলেই জানে, মানুষকে মানুষ বলেই শ্রদ্ধা করে, যারা তার সেবা করতে উৎসাহ পায় না, চীৎকার করে মা বলে দেবী বলে মন্ত্র পড়ে, যাদের কেবল সম্মোহনের দরকার হয় তাদের সেই ভালোবাসা দেশের প্রতি তেমন নয়, যেমন নেশার প্রতি।" (ঘরে-বাইরে, রচনাবলী ৮ম খণ্ড, ১৭০-৭১ পৃষ্ঠা)—তখন ঐ কথার ঝাঁঝ থেকে আমরা সচরাচর তখনকার দিনের জাতীয় আন্দোলনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বীতরাগের কথাই অনুমান করি। কিন্তু যে ব্যাপারটি তাঁকে এতটা অধীর ও বিচলিত করেছিল তা হচ্ছে এই বোধ যে জাতীয় আন্দোলনের

ঐ দুর্লক্ষণগুলি আসলে একধরনের আন্তর্জাতিক দুষ্প্রবৃত্তিরই স্বদেশী সংস্করণ মাত্র।

১৯১৬-এর আর একটি লেখা অন্য দিক থেকে মূল্যবান। জাপান যাত্রা-পথে এক জাহাজঘাটে চীনা মজুরদের কাজের নৈপুণ্য দেখে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ লিখলেন: "কাজের শক্তি, কাজের নৈপুণ্য এবং কাজের আনন্দকে এমন পুঞ্জীভূতভাবে একত্র দেখতে পেয়ে আমি মনে মনে বুঝতে পারলুম, এই বৃহৎজাতির মধ্যে কতখানি ক্ষমতা সমস্ত দেশ জুড়ে সঞ্চিত হচ্ছে।...

"যে-সাধনায় মানুষ আপনাকে আপনি ষোলো-আনা ব্যবহার করবার শক্তি পায়, তার কৃপণতা ঘুচে যায়, নিজেকে নিজে কোনো অংশে ফাঁকি দেয় না, সে যে মস্ত সাধনা। চীন সুদীর্ঘকাল সেই সাধনায় পূর্ণভাবে কাজ করতে শিখেছে...চীনের এই শক্তি আছে বলেই আমেরিকা চীনকে ভয় করেছে; কাজের উদ্যমে চীনকে সে জিততে পারে না, গায়ের জোরে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়।" ('জাপানযাত্রী', রচনাবলী ১৯শ খণ্ড, ৩৩১-৩২ পৃষ্ঠা)

আশ্চর্য ঠেকে যখন এ-সবের থেকে তাঁকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে দেখি: "এই এতবড়ো একটা শক্তি যখন আমাদের আধুনিক কালের বাহনকে পাবে, অর্থাৎ যখন বিজ্ঞান তার আয়ত্ত হবে, তখন পৃথিবীতে তাকে বাধা দিতে পারে এমন কোন শক্তি আছে?...এখন যে-সব জাতি পৃথিবীর সম্পদ ভোগ করছে তারা চীনের সেই অভ্যুত্থানকে ভয় করে, সেই দিনকে তারা ঠেকিয়ে রাখতে চায়।" ('জাপানযাত্রী', রচনাবলী ১৯শ খণ্ড, ৩৩২ পৃষ্ঠা)

এ-ধরনের অদূরদর্শী প্রতিবন্ধকতা নয়, পূর্ব-পশ্চিমের যে মিলন সত্যই সকল পক্ষেরই কাম্য তার রূপ রবীন্দ্রনাথের মতে নিম্নরূপ: "পূর্ব-পশ্চিমের যদি মিলন ঘটে তবে একটা মহৎ আইডিয়ালের উপর হইবে। তাহা নিছক অনুগ্রহের উপরে হইবে না। এবং কামান বন্দুক এবং রণতরীর উপরও হইবে না।...আমাদিগকে নিজের শক্তিতেই পরের শক্তির সঙ্গে সন্ধি করিতে হইবে। সেই শক্তি ধার-করা শক্তি, ভিক্ষা-করা শক্তি না হউক। তাহা সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য দুঃখ সহিবার অপরিসীম শক্তি হউক।" ('ছোটো ও বড়ো', 'কালান্তর', রচনাবলী ২৪শ খণ্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা)

পূর্ব-পশ্চিমের সত্যকার মিলনের জন্য পশ্চিমের তরফেও যে আমূল রূপান্তর অপরিহার্য সে-কথা রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত করলেন এইভাবে: "বিজ্ঞান যেখানে সর্বসাধারণের দুঃখ এবং অভাব মোচনের কাজে লাগে, যেখানে তার দান

বিশ্বজনের কাছে গিয়া পৌঁছায়, সেইখানেই বিজ্ঞানের মহত্ত্ব পূর্ণ হয়। কিন্তু যেখানে সে বিশেষ ব্যক্তি বা জাতিকে ধনী বা প্রবল করিয়া তুলিবার কাজে বিশেষ করিয়া নিযুক্ত সেইখানেই তার ভয়ংকর পতন।...ইহাতে আজ জগতের সর্বত্র এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির সম্বন্ধ দুর্বলের দিকে দলন-বন্ধনের দ্বারা ভারগ্রস্ত এবং প্রবলের দিকে হিংস্রতার অন্তহীন প্রতিযোগিতায় উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছে।...তথাপি, আশা করি, য়ুরোপের এতদিনের তপস্যার ফল আজ বস্তুলোভের ভীষণ দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া...ধূলা হইয়া যাইবে না। আজিকার দিনের প্রচণ্ড সংকটের বিপাকে য়ুরোপ আর-কোনো একটা নূতন প্রণালী, আর-একটা নূতন রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।" (স্বাধিকার প্রমত্ত: 'কালান্তর', রচনাবলী ২৪শ খণ্ড, ৩৯৭ পৃষ্ঠা)

তাই রাশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লবের ৮ মাস পরে, ১৯১৮ সালের জুলাই মাসের 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় যখন রবীন্দ্রনাথের 'At the Cross Roads' প্রবন্ধে এই কথাগুলি পড়ি তখন তাঁর চিন্তাসূত্র সহজেই ধরতে পারা যায়: 'We know very little of the history of the present revolution in Russia, and with the scanty materials in our hands we cannot be certain if she, in her tribulations, is giving expression to man's indomitable soul against prosperity built upon moral nihilism. All that we can say is that the time to judge has not yet come, especially as Real Politik is in such a sorry plight itself. No doubt if modern Russia did try to adjust herself to the orthodox tradition of Nation-worship, she would be in a more comfortable situation to-day, but this tremendousness of her struggle and hopelessness of her tangles do not, in themselves, prove that she has gone astray. It is not unlikely that, as a nation, she will fail; but if she fails with the flag of true ideals in her hands, then her failure will fade, like the morning star, only to usher in the sunrise of the new age." (At the Cross Roads, *Modern Review*, July 1918, p. 3-4)

যেখানে সঠিক তথ্যের একান্ত অভাব, সমস্ত খবরের উৎস যেখানে প্রাতিকূল মহলেই, সেখানে আন্তর্জাতিক অবস্থা সম্পর্কে শুধু সাধারণ ধারণা সম্বল করেই রুশ বিপ্লব সম্পর্কে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সেদিন সম্ভব হল তার কারণ তাঁর আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বচ্ছ, মানবিক ও যুক্তিনির্ভর। রুশ বিপ্লবের প্রতিপক্ষকে তিনি হাড়েহাড়েই চিনতেন, তাই বিপ্লবের

প্রতি তাদের মনোভাব ও আচরণ থেকে আসল ব্যাপার সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয় নি।

ইতিমধ্যে যুদ্ধ থেমে গেছে। শান্তিপ্রতিষ্ঠার পাকা ব্যবস্থার জন্যই নাকি বিভিন্ন দেশের রাজনীতিবিদেরা নানা সলাপরামর্শ শুরু করেছেন। গোড়ার থেকেই রবীন্দ্রনাথের কাছে এ সব হাঁকাহাঁকি খুবই ফাঁকা, এমনকি কপট বোধ হচ্ছিল। ১৯১৯ সালে 'বাতায়নিকের পত্রে' তিনি লিখলেন: "আর-কিছু না বুঝি একটা কথা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে; এত আগুনেও কলিযুগের অন্ত্যেষ্টিসংকার হল না, মন বদল হয়নি। কলিযুগের সেই সিংহাসনটা আজ কোন্‌খানে? লোভের উপরে। পেতে চাই, রাখতে চাই, কোনোমতেই কোথাও একটুও কিছু ছাড়তে চাইনে।" (বাতায়নিকের পত্র, 'কালান্তর', রচনাবলী ২৪শ খণ্ড, ৩০১-২ পৃষ্ঠা)

সেই লোভ যে সর্বব্যাপী সে-সম্পর্কে লিখলেন: "কর্মিক ধনিকদের মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ, একরাজ্য অন্যরাজ্যের মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ, আবার রাজা ও প্রজার মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ। তাই শেষকালে দাঁড়ায় এই, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।" (ঐ ৩০৩ পৃষ্ঠা)

যুদ্ধের সময় সমস্ত বিভীষিকা সত্ত্বেও যাঁর অটল প্রত্যয় ছিল যে অমন অগ্নিপরীক্ষার পর হয়তো মন ফিরবে সমাজের, যুদ্ধ থামার অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বুঝেছেন যে "ভোগেরই জন্যে, লাভেরই জন্যে যাদের দশ আঙুল অজগর সাপের দশটা লেজের মতো কিলবিল করছে তারা শান্তি চায় বটে কিন্তু সে ফাঁকি দিয়ে; দাম দিয়ে নয়। যে-শান্তিতে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষীরসর বাটি চেটে নিরাপদে খাওয়া যেতে পারে সেই শান্তি।" (ঐ, ৩০৫ পৃষ্ঠা)

শোষণের লোভই যে এই বিপত্তি ঘটাচ্ছে বারবার সে-কথা আবার বললেন তিনি জোরালো ভাবে: "যে দুর্বল সবলের পক্ষে সে তেমনি ভয়ঙ্কর, হাতির পক্ষে যেমন চোরাবালি। এই বালি বাধা দিতে পারে না বলেই সম্মুখের দিকে অগ্রসর করে না, কেবলই নিচের দিকে টেনে নেয়।……যে-জায়গায় হাওয়া হালকা সেই জায়গাই হচ্ছে ঝড়ের কেন্দ্র। এইজন্য য়ুরোপের বড়ো বড়ো ঝড়ের আসল জন্মস্থান এশিয়া আফ্রিকা।" (ঐ, ৩০৬ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ রাজনীতির ভাষায় ঔপনিবেশিক স্বার্থসংঘাতই হচ্ছে মহাযুদ্ধের উৎস। তাই স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে শুধু যে দেশ স্বাধীন হয় তাই নয়,

মহাযুদ্ধের পথেও কাঁটা পড়ে। দুর্বলকে প্রবলের সমকক্ষ হতে হবে তা শুধু নিজের স্বার্থেই নয়, পৃথিবীর দিকে তাকিয়েই।

যুদ্ধান্তের জটিলতায় রবীন্দ্রনাথের মন যখন বিষণ্ণ তখন রলাঁ তাঁকে একটি চিঠি লিখলেন, পৃথিবীর বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে এক "মুক্ত চিন্তার ঘোষণায়" (Declaration of Independence of thought) স্বাক্ষরদানের অনুরোধ জানিয়ে। সেই ঘোষণায় ছিল এই সুদৃঢ় অঙ্গীকার: We honour Truth alone, Truth free, without frontiers, without limits, without prejudices of race and caste. We are not indeed uninterested in humanity. It is for her that we labour, but for her in all her entirety."

রবীন্দ্রনাথ সানন্দে সাড়া দিলেন আহ্বানে এই কথা জানিয়ে: "When my mind was steeped in the gloom of thought that the lesson of the late war had been lost, and that people were trying to perpetuate their hatred and anger into the same organised menace for the world which threatened themselves with disaster, your letter came and cheered me with the message of hope....It is enough for me to know that the higher conscience of Europe had been able to assert itself in one of her choicest spirits through the ugly clamour of passionate politics; and I gladly hasten to accept your invitation to join the ranks of those free souls, who, in Europe, have conceived the project of a Declaration of Independence of Thought." (*Modern Review*, July, 1919)

রলাঁর সঙ্গে গভীর যোগ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যে কত ফলপ্রদ হয়েছিল কিছু পরেই আমরা তার পরিচয় পাব।

১৯২০ সালের ২৬শে জুলাই রবীন্দ্রনাথ সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশে জাতীয় আন্দোলন দমনের জন্য ভারতীয় সৈন্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদজ্ঞাপক একটি সভায় এই বাণী পাঠান: "The use of mercenary troops for utilitarian purposes is degrading to all parties concerned, and it grieves my heart as an Indian to see that members of a subject race which has been deprived of its right to carry arms for its own self-protection, are being turned into fighting automatons for the imperialist aggrandisement of a nation whose possessions are already too burdensome for its moral integrity and physical strength." (*Modern Review*, September, 1920 p. 354)

পাঁচ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে এই সৈনিকবৃত্তি, দাস্য-বৃত্তিকেই 'শূদ্রধর্ম' নাম দিয়ে পরম আক্ষেপে লেখেন: "প্রথমবার যখন জাপানের পথে হংকঙের বন্দরে আমাদের জাহাজ লাগল দেখলুম, সেখানে ঘাটে একজন পাঞ্জাবি পাহারাওয়ালা অতি তুচ্ছ কারণে একজন চৈনিকের বেণী ধরে তাকে লাথি মারলে। আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। নিজের দেশে রাজভৃত্যের লাঞ্ছনধারী কর্তৃক স্বদেশীর এ রকম অত্যাচার-দুর্গতি অনেক দেখেছি, দূর সমুদ্রতীরে গিয়েও তাই দেখলুম। দেশবিদেশে এরা শূদ্রধর্ম পালন করছে।...চীনের কাছ থেকে ইংরেজ যখন হংকঙ কেড়ে নিতে গিয়েছিল তখন এরাই চীনকে মেরেছে। চীনের বুকে এদেরই অস্ত্রের চিহ্ন অনেক আছে—সেই চীনের বুকে যে-চীন আপন হৃদয়ের মধ্যে ভারতবর্ষের বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন ধারণ করেছিল, সেই ইৎসিং হিউয়েন সাঙের চীন।" (শূদ্রধর্ম, 'কালান্তর', রচনাবলী ২৪শ খণ্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠা)

১৯২০-২১ সালে এণ্ড্রুস সাহেবকে লেখা তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি চিঠিতে ধনিক সভ্যতার উত্তরোত্তর মানবিক দৈন্যবৃদ্ধি এবং ঘনায়মান প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দ্বন্দ্বজনিত উদ্বেগ ফুটে উঠেছে বারবার। ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টে জালিয়ানওয়ালাবাগ সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে কখনও তিনি আক্ষেপ করছেন: "the poison has gone further than we expected, and it has attacked the vital organs of the British nation. I feel that our appeal to their higher nature will meet with less and less response everyday." (২২শে জুলাইয়ের চিঠি, ১৯২০, *Letters to a friend*)

কখনও আয়ার্ল্যাণ্ডের দুঃখের দিনে তার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন: "Things that are happening in Ireland are ugly. The political lies that are accompanying them are stupendous..." (১০ই এপ্রিলের চিঠি, *Letters to a friend*),

কখনও নিউইয়র্ক থেকে লিখছেন: "In this country I live in the dungeon of the Castle of Bigness. My heart is starved. . Here I feel everyday what a terrible nightmare it is for the human soul to bear this burden of the monster Arithmatic. It incessantly drives its victims and yet leads them nowhere. It raises storms of battle which are for sowing broadcast the seeds of future conflict." (১৩ই ডিসেম্বরের চিঠি, *Letters to a friend*)

কখনও আর্তস্বরে বলছেন: To me humanity is rich and large and

many sided. Therefore I feel deeply hurt when I find that, for some material gain, man's personality is mutilated in the Western World...The same process of repression and curtailment of humanity is often advocated in our country under the name of patriotism. Such deliberate impoverishment of our nature seems to me a crime" (১৪ই জানুয়ারীর চিঠি—*Letters to a friend*)

কখনও তীব্র বেদনায় আমেরিকা থেকে লিখছেন : "The whole world is suffering from this call of Deivl-worship...and I cannot tell you how deeply I am suffering, being surrounded in the country by endless ceremonials of this hideously profane cult. Everywhere there is an antipathy against Asia vented by a widespread campaign of calumny. Negroes are burnt alive, sometimes, merely because they tried to exercise their right to vote given to them by law. Germans are reviled. Conditions in Russia are deliveratelv misrepresented." (৮ই ফেব্রুয়ারির চিঠি. *Letters to a friend*)

সমাজব্যবস্থা সম্পর্কেও এ সময়ে তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টির পরিচয় মেলে ১৯২১ সালে 'বঙ্গবাণীতে' প্রকাশিত 'সমবায়' প্রবন্ধে, বিশেষ করে এই অংশটিতে : "ডিমক্রাসির লক্ষ্য এই যে, প্রত্যেক প্রজার মধ্যে যে আত্মশাসনের ইচ্ছা ও শক্তি আছে তারই সমবায়ের দ্বারা রাষ্ট্রশাসন শক্তিকে অভিব্যক্ত করে তোলা। আমেরিকার যুক্তরাজ্য এই ডিমক্রাসির বড়াই করে থাকে। কিন্তু যেখানে মূলধন ও মজুরির মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে সেখানে ডিমক্রাসি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য। কেননা, সকল-রকম প্রতাপের প্রধান বাহক হচ্ছে অর্থ। সেই অর্থ-অর্জনে যেখানে ভেদ আছে সেখানে রাজপ্রতাপ সকল প্রজার মধ্যে সমানভাবে প্রবাহিত হতেই পারে না। তাই য়ুনাইটেড স্টেট্স-এ রাষ্ট্রচালনার মধ্যে ধনের শাসনের পদে পদে পরিচয় পাওয়া যায়। টাকার জোরে সেখানে লোকমত তৈরি হয়, টাকার দৌরাত্ম্যে সেখানে ধনীর স্বার্থের সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা দলিত হয়। একে জনসাধারণের স্বায়ত্তশাসন বলা চলে না।" (সমবায় নীতি, ১৭-১৮ পৃষ্ঠা)

এ অবস্থা থেকে রবীন্দ্রনাথ পরিত্রাণের পথ দেখলেন এইভাবে : "...যথেষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতাকে সর্বসাধারণের সম্পদ করে তোলবার মূল উপায় হচ্ছে ধন-অর্জনে সর্বসাধারণের শক্তিকে সম্মিলিত করা।" (ঐ, ১৮ পৃষ্ঠা)

১৯২৪ সালে চীনদেশে Civilisation and Progress বিষয়ক এক বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ আফগানিস্তানের এক মাশুদ উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকায় কয়েক জন ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিকের অভিজ্ঞতার বিবরণ দেন। এ বৈজ্ঞানিকেরা তাদের স্বগোত্রীয়দের সঙ্গে মিলে মাশুদদের গ্রামের উপরে মুহুর্মুহু বোমা বর্ষণ করছিল। হঠাৎ বিমানের কলকব্জা বিগড়ে যাওয়ায় তারা ঐ মাশুদ গ্রামেই নামতে বাধ্য হয়। সেখানে উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত আতিথেয়তার নীতি অনুযায়ী মাশুদেরা তাদের রক্ষা করে যদিও একটু আগে তারাই মাশুদ-হত্যায় মেতেছিল বিমান থেকে এবং তখনও তাদের সঙ্গীরা ধ্বংসলীলা চালাচ্ছিল চারিদিকে। ঘটনাটির উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বলেন progress-এর মাপ-কাঠিতে খাটো হলেও ঐ পশ্চাৎপদ মাশুদেরা civilisation-এর দিক দিয়ে সত্যই অগ্রসর—এ কথা মানতেই হবে।

১৯২৬ সাল এক দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে খুবই জরুরি—আন্তর্জাতিক চিন্তার বিবর্তনের মাপকাঠিতে ততটা নয়, যতটা আন্তর্জাতিক বাস্তবতা সম্পর্কে হাতেকলমে অভিজ্ঞতা অর্জনের দিক থেকে। উগ্র জাতীয়তাবাদের অত্যুগ্র বিরোধী, মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ কেন যে সেদিন মুসোলিনির আমন্ত্রণ রক্ষা করতে ইটালি গিয়েছিলেন আজ তা সকলের কাছেই আশ্চর্য ঠেকে। যথাসময়ে নিরসনের তেমন চেষ্টা না হওয়ায় বহুদিন ধরে এ-সম্পর্কিত বিস্ময় অনেকের মনে দানা বেঁধে উঠেছিল। আমাদের দেশে এ-সম্পর্কে কিছু তথ্য হালে কোন কোন গ্রন্থ বা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সব দেখেশুনে বোধ হয় ব্যাপারটা ঘটেছিল এইভাবে—দেশ-বিদেশের অসংখ্য পত্র-পত্রিকার অবিশ্রাম প্রচারের দরুন কবির কাছে ইটালির ঘটনা মহাযুদ্ধে পর্যুদস্ত একটি দেশের নবজাগরণ রূপেই প্রতিভাত হয়েছিল সেদিন। কি তত্ত্ব, কি বাস্তব অভিজ্ঞতা কোনো দিক দিয়েই তিনি তলিয়ে মূল্যায়ন করেন নি ফ্যাসিজ্‌মের। তাছাড়া ইতিহাস পাঠকালে চমকপ্রদ ব্যক্তিত্বের আকর্ষণও ছিল কিছুটা। এমন অবস্থায় তুচি, ফরজিকির মতো ভারতবিদ্‌দের পাণ্ডিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁদের মারফত আমন্ত্রণ, স্বয়ং মুসোলিনি কর্তৃক বিশ্বভারতীকে ইটালীয় চিরায়ত সাহিত্যগ্রন্থাদি উপহার প্রভৃতি ঘটনা আমন্ত্রণরক্ষার পথ প্রশস্ত করেছিল যথেষ্টই। তবু ফ্যাসিজমের তত্ত্ব সম্পর্কে যে মনে খটকা ছিল, তা বোঝা যায় ইটালিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারকালে সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে বারবার অস্বীকৃতি থেকে। তারপর যখন কানাঘুষো শুনলেন যে তাঁর বক্তব্য

সঠিকভাবে ভাষান্তরিত বা প্রকাশিত হচ্ছে না এবং নজরবন্দী ক্রোচে বা ডিউক স্কটির সঙ্গে সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ মুক্ত বা স্বচ্ছন্দ নয় তখন থেকেই তাঁর মন বিরূপ হতে থাকে। এই প্রক্রিয়াই চরমে পৌছায় র‍ঁলার সঙ্গে যোগাযোগ এবং তাঁরই মারফত সিনোরা মালভাডোরি প্রমুখ মুসোলিনি কর্তৃক নির্বাসিত বিশিষ্ট ইটালিয়ানদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থার ফলে। রবীন্দ্রনাথ তখন এণ্ড্রুজ সাহেবের কাছে চিঠি ও 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান', 'হিন্দু' প্রভৃতি পত্রিকায় বিবৃতি মারফত ফ্যাসিজম ও তাঁর ইটালিয়ান আমন্ত্রণকারীদের সম্পর্কে তাঁর পরিষ্কার ও দ্বিধাহীন বক্তব্য উপস্থিত করেন। এ বক্তব্য ভারতবর্ষে যে বহুল প্রচারিত হয় নি তার কারণ সম্ভবত তখনকার দিনে বহু পত্র-পত্রিকার ফ্যাসিজমের প্রতি সপ্রশংস দৃষ্টি।

সমস্ত ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে—"...I am more solicitous of your glory than of your repose. I did not like it that the monsters should be able to abuse your name in history....The future will show you that I have acted as a vigilant and faithful guardian"—('রবীন্দ্রনাথের প্রতি চিঠি,' ৩৫ পৃষ্ঠা)—রলাঁর এই কথা রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে খুবই যথার্থ এবং এই 'সতর্ক ও বিশ্বস্ত অভিভাবকত্বের' জন্য ভারতবাসী তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ।

কিন্তু অন্যদিকে উগ্র 'জাতিপ্রেম', বর্ণবৈষম্য এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ-অত্যাচার সম্পর্কে আমরা এতাবৎ রবীন্দ্রনাথের যে মতামত দেখলাম তার নিরিখে কোনো সংশয়ের কিছুমাত্র অবকাশ নেই যে তাঁর পক্ষে সজ্ঞানে ফ্যাসিজমের প্রশ্রয়দান সম্ভব নয় আদৌ। এণ্ড্রুজ সাহেবকে সে কথাই তিনি লেখেন পরিষ্কারভাবে : "...the methods and the principles of Fascism concern all humanity and it is absurd to imagine that I could ever support a movement which ruthlessly suppresses freedom of expression, enforces observances that are against conscience, and walks through a blood-stained path of violence and stealthy crime. I have said over and over again that the aggressive spirit of Nationalism and Imperialism, religiously cultivated by most of the nations of the West, is a menace to the whole world." (*Manchester Guardian*, August 5, 1926)

এই চিঠি এবং ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত অন্যান্য বিবৃতির ফলে ফ্যাসিস্ট মহলে যে অচিরেই রবীন্দ্রনাথের নিন্দার বান ডাকল তা বলাই বাহুল্য।

১৯২৭ সালে বিখ্যাত ফরাসী মনীষী ও সাম্যবাদী নেতা আঁরি বারবুস রলাঁর সঙ্গে মত-বিনিময়ের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুণীদের কাছে একটি আবেদন ("স্বাধীন আত্মাদের প্রতি") পাঠান, তাঁদের অনুমোদনের জন্য। তার মূল সুর ছিল ফ্যাসিজম্-বিরোধিতার। রবীন্দ্রনাথ সেই আবেদনে সমর্থন জানিয়ে যে জবাব লিখেছিলেন তা অবিস্মরণীয় (*Viswa Bharati Quarterly* ,July, 1927, p. 192-95 দ্রষ্টব্য)। এই উত্তরের মধ্যে দ্বিধাহীনভাবে ফ্যাসিজ্‌ম্-বিরোধিতা প্রকাশিত হওয়া ছাড়াও প্রকট হয়ে উঠেছিল ফ্যাসিজমের অন্তর্নিহিত জরাগ্রস্ত অবস্থা সম্পর্কে তাঁর দৃঢ়প্রত্যয়।

ধনিক সভ্যতার একদিকে দুর্বার শিল্পগত শক্তি এবং অন্যদিকে অকথ্য শোষণ ও অন্তর্নিহিত দৈন্য এই সময়েই আত্মপ্রকাশ করে 'রক্তকরবী'র রূপকে। ১৯২৮ সালে 'যাত্রীর' ভিতরে প্রকট হয় ঐ সভ্যতার ক্রূরতা, দুর্নিবার গতিবেগ ও চরম উদ্দেশ্যহীনতা: "আজ সকল পক্ষই বিষের সন্ধানে উঠেপড়ে লেগেছে; যুদ্ধকালে নিরস্ত্র পুরবাসীদের প্রতি আকাশ থেকে অগ্নিবাণ বর্ষণ নিয়ে প্রথম শোনা গেল ধর্মবুদ্ধির নিন্দাবাণী। আজ দেখি, ধার্মিকেরা স্বয়ং সামান্য কারণে পল্লীবাসীদের প্রতি কথায় কথায় পাপবজ্র সন্ধান করছে। গত যুদ্ধের সময় শত্রুর সম্বন্ধে নানা উপায়ে সজ্ঞানে সচেষ্টভাবে সত্য গোপন ও মিথ্যা প্রচারের শয়তানী অস্ত্র ব্যবহার প্রকাণ্ডভাবে চলল। যুদ্ধ থেমেছে কিন্তু সেই শয়তানি আজও থামে নি।" ('যাত্রী', রচনাবলী ১৯শ খণ্ড, ৪৯২ পৃষ্ঠা)

রবীন্দ্রনাথ রচনাটি শেষ করেছেন এই কবিতাটি দিয়ে:

রথীরে কহিল গৃহী উৎকণ্ঠায় উর্ধ্বস্বরে ডাকি
"থামো, থামো কোথা তুমি রুদ্রবেগে রথ যাও হাঁকি,
সম্মুখে আমার গৃহ।"
রথী কহে, "ঐ মোর পথ,
ঘুরে গেলে দেরি হবে, বাধা ভেঙে সিধা যাবে রথ।"
গৃহী কহে, "নিদারুণ ত্বরা দেখে মোর ডর লাগে—
কোথা যেতে হবে বলো।"
রথী কহে, "যেতে হবে আগে।"
"কোন্‌খানে" শুধাইল।
রথী বলে, "কোনোখানে নহে,
শুধু আগে।"

"কোন্ তীর্থে, কোন্ সে মন্দিরে" গৃহী কহে।
"কোথাও না, শুধু আগে।"……

(ঐ, ৪১২-১৩.পৃষ্ঠা)

রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তার তৃতীয় পর্ব এইখানেই শেষ করা চলে। এর প্রধান লক্ষণগুলি হচ্ছে: যুদ্ধের সর্বব্যাপী আশঙ্কা সম্পর্কে সচেতনতা; ঔপনিবেশিক শোষণের অধিকার নিয়েই যে যুদ্ধ বাধে এই বোধ; জাতি-বিশেষের দুষ্টবুদ্ধির মধ্যে নয়, সমগ্র ধনিকসভ্যতার ইতিহাসের গভীরেই যে লড়াইয়ের মূল খুঁজতে হবে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা; উগ্র 'জাতিপ্রেম'রূপী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সুতীব্র অনুভূতি; আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠপট থেকে বিচ্ছিন্ন করে জাতীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য এই বোধ; সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুটা বাস্তব চিন্তা এবং ফ্যাসিজমের মানবতা-বিরোধী চরিত্র সম্পর্কে প্রাথমিক চেতনা। 'জাতিপ্রেমের' অর্থনৈতিক ভিত্তির দিকেও এ পর্বে কিছুটা নজর পড়েছে, যদিও এ প্রসঙ্গের আলোচনা মূলত ভাবগত। আর তাই যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় কলিযুগের অন্ত্যেষ্টিসৎকার আপনা থেকেই ঘটে যাবে এমন একটা সহজ বিশ্বাস এ পর্বের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে বসেছিল— যদিও বাস্তব অভিজ্ঞতায় ঠেকে সে ধারণা তিনি অতিক্রম করেন যুদ্ধ থামার অব্যবহিত পরেই।

চতুর্থ পর্বের সূচনা ধরা যায় ১৯৩০ সালে কবির সোভিয়েত ভ্রমণের সময় থেকে। আমরা দেখেছি সোশ্যালিজমের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে গোড়ার দিকে (যেমন 'ছিন্নপত্রের' যুগে) রবীন্দ্রনাথের মনে সংশয় ছিল যথেষ্ট, যদিও সোশ্যালিজম সম্ভব না হলে যে দুর্গত মানুষের পক্ষে কোনো আশাই আর থাকে না এ বেদনাও ছিল সেই সঙ্গেই। কখনও বা ধনিক সভ্যতার নৃশংসতায় দিশেহারা হয়ে এমন কথাও তিনি ভেবেছেন যে সোশ্যালিজম হয়তো ঐ সভ্যতারই একটা পাল্টা হিংস্র সংস্করণ, নিহিলিজম সোশ্যালিজম ক্যাপিটালিজম সবেরই মূলে আছে লোভ ও হিংসা। ১৯২২ সালে 'সমবায়' সম্পর্কিত 'বঙ্গবাণী'র রচনায়ও এই সুর পরিস্ফুট; যেমন: "ধর্মের উপদেশ ব্যর্থ হয়েছে বলেই, সকল সমাজেই ধন ও দৈন্যের দ্বন্দ্ব একান্ত হয়ে রয়েছে বলেই, যাঁরা এই অকল্যাণকর ভেদকে সমাজ থেকে দূর করতে চান তাঁদের অনেকেই জবরদস্তির দ্বারা লক্ষ্যসাধন করতে চান।…এ সমস্ত চেষ্টা বর্তমান যুগে পশ্চিম মহাদেশে প্রায় সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ হচ্ছে,

পশ্চিমের মানুষের গায়ের জোরটা বেশি, সেইজন্যেই গায়ের জোরের উপর তার আস্থা বেশি ; কল্যাণসাধনেও সে গায়ের জোর না খাটিয়ে থাকতে পারে না। তার ফলে অর্থও নষ্ট হয়, ধর্মও নষ্ট হয়। রাশিয়ায় সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতিতে তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।" ('সমবায় নীতি' ১৬ পৃষ্ঠা)

১৯২৬ সালে 'রায়তের কথা'য় আরো বেপরোয়াভাবে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : "রাশিয়ার জার-তন্ত্র ও বলশেভিক-তন্ত্র একই দানবের পাশমোড়া দেওয়া। যাদের রক্তের তেজ বেশি, এক-এক সময়ে মাথায় বিপরীত রক্ত চড়ে গিয়ে তাদের পাগলামি দেখা দেয়…" (রায়তের কথা, 'কালান্তর', রচনাবলী ২৪শ খণ্ড, ৪২৬ পৃষ্ঠা)

কিন্তু এ ধরনের চিন্তার পাশাপাশি সোভিয়েত সম্পর্কে যে সঠিক খবর পাওয়া যাচ্ছে না, বিরুদ্ধ শক্তি যে তার সম্পর্কে অবাধে মিথ্যা কুৎসা রটাচ্ছে এই বোধও যে তাঁর মনে বরাবর ছিল তার প্রমাণও আমাদের যথেষ্ট মিলেছে আর সেই বিরুদ্ধ পক্ষ সম্পর্কে যে তাঁর মনোভাব কি ছিল তা তো আমরা জানি। ঐ বোধ ছিল বলেই নিজের চোখে সোভিয়েত দর্শনের ইচ্ছা তাঁর অনেক দিনের। ১৯২৬ সালে লুনাচারস্কি-র নিমন্ত্রণ শারীরিক অসুস্থতার দরুণ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি ১৯২৯ সালেও তাই। ১৯৩০ সালেও শরীর ভালো ছিল না— অনেকে যে রাশিয়াভ্রমণ থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করতেও চেষ্টা করেন 'রাশিয়ার চিঠিতেই' তার উল্লেখ আছে। তবু কেন যে তিনি সেবার সোভিয়েত দর্শনে বদ্ধপরিকর ছিলেন তার "কারণ মনে মনে ভাবছিলুম, ধনশক্তিতে দুর্জয় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাঙ্গণদ্বারে রাশিয়া আজ নির্ধনের শক্তিসাধনার আসন পেতেছে সমস্ত পশ্চিম মহাদেশের ভ্রূকুটি কুটিল কটাক্ষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, এটা দেখবার জন্যে আমি যাবো না তো কে যাবে। ওরা শক্তিশালীর শক্তিকে ধনশালীর ধনকে বিপর্যস্ত করে দিতে চায়, তাতে আমরা ভয় করব কিসের, রাগই করব বা কেন। আমাদের শক্তিই বা কী, ধনই বা কত। আমরা তো জগতের নিরন্ন নিঃসহায়দের দলের।" ('রাশিয়ার চিঠি', রচনাবলী ২০শ খণ্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা)

সোভিয়েতে গিয়ে প্রথমেই যে কথা তাঁর মনে হল তা হচ্ছে "অন্য কোনো দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলেছে।" (ঐ, ২৭৩ পৃষ্ঠা) কথাটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি অবতারণা করলেন 'সভ্যতার পিলসুজের' তুলনা—বাংলা

ভাষায় যা প্রায় প্রবচন হয়ে দাঁড়িয়েছে ইতিমধ্যে, আর তারপরেই অকুণ্ঠভাবে জানলেন : "আমি অনেকদিন এদের কথা ভেবেছি, মনে হয়েছে, এর কোনো উপায় নেই। একদল তলায় না থাকলে আর একদল উপরে থাকতেই পারে না, অথচ উপরে থাকার দরকার আছে। উপরে না থাকলে নিতান্ত কাজের সীমার বাইরে কিছু দেখা যায় না..." (ঐ, ২৭৩ পৃষ্ঠা)

এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের "এ জন্মের তীর্থ দর্শনের" সত্যকার তাৎপর্য বোঝা যায়। তীর্থদর্শনের পর আর এবার শুধু জবরদস্তি বা গায়ের জোরের কথাই বলা সম্ভব হল না, 'কল্যাণসাধনের' ক্ষেত্রে 'গায়ের জোর খাটানো'র ফলে 'অর্থও নষ্ট হয় ধর্মও নষ্ট হয়'—একথা তো একেবারেই নয়। বরঞ্চ বললেন "শুধু যদি একটা ভীষণ ভাঙচুরের কাণ্ড হত তাতে তেমন আশ্চর্য হতুম না, কেন না নাস্থানাবুদ করবার শক্তি এদের যথেষ্ট আছে; কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, বহুদূরব্যাপী একটা ক্ষেত্র নিয়ে এরা একটা নূতন জগৎ গড়ে তুলতে কোমর বেঁধে লেগেছে।" (ঐ, ২৭৮ পৃষ্ঠা) তাছাড়া উগ্র 'জাতি-প্রেমের' প্রতি একান্তই বিরূপ তাঁর মন এ ঘটনা প্রত্যক্ষ না করেও পারল না যে "এদের এখানকার বিপ্লবের বাণী···বিশ্ববাণী। আজ পৃথিবীতে অন্তত এই একটা দেশের লোক স্বাজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে।" (ঐ, ২৭৯ পৃষ্ঠা) এই প্রসঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বিচিত্র ও বহুভাষী জাতিগুলির মধ্যে ভেদবুদ্ধির অভাব, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি সব দিক থেকেই সর্বজাতির, প্রতিটি মানুষের অগ্রগতি এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে "ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব" তাঁকে আকৃষ্ট করল প্রবলভাবে।

কিন্তু এর থেকে মনে করা ভুল যে সোভিয়েত শাসনবিধি সম্পর্কে অতঃপর রবীন্দ্রনাথের আর কোনো সংশয় রইল না। একথা যে ঠিক নয় "রাশিয়ার চিঠি" পড়লেই তা বোঝা যায়। "এ দেশে জবরদস্ত লোকের একনায়কত্ব চলছে", "ডিক্‌টেটরশিপ একটা মস্ত সম্পদ", "সর্বসাধারণের বিচারবুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালবার একটা প্রবল প্রয়াস সুপ্রত্যক্ষ"—এমন ধরনের কথা সেখানে যথেষ্ট আছে। কিন্তু সেখানেও এ-কথা তাঁর নজর এড়াচ্ছে না যে "রাশিয়ার অবস্থা যুদ্ধকালের অবস্থা; অন্দরে বাহিরে শত্রু। তাই ওদের নির্মাণকার্যে ভিতরটা যত শীঘ্র পাকা করা চাই, এজন্যে বলপ্রয়োগে ওদের কোনো দ্বিধা নেই" (ঐ, ৩৪৩ পৃষ্ঠা) বা ডিক্‌টেটরশিপের "সম্পদ" প্রসঙ্গে এই কথা : "এর নঙর্থক দিকটা

জবরদস্তির দিক, সেটা পাপ। কিন্তু সদর্থক দিকটা দেখেছি সেটা হল শিক্ষা, জবরদস্তিব একেবারে উলটো” (ঐ ৩৪১ পৃষ্ঠা) এবং সেই শিক্ষা প্রসঙ্গে “একটা সুবিধার কথা এই যে, যদিও সোভিয়েত মূলনীতি সম্বন্ধে এরা মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অতি নির্দয়ভাবে পীড়ন করতে কুণ্ঠিত হয়নি তথাপি সাধারণভাবে শিক্ষার দ্বারা চর্চার দ্বারা ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তিকে বাড়িয়েই চলেছে…। মনকে একদিকে স্বাধীন করে অন্যদিকে জুলুমের বশ করা সহজ নয়। ভয়ের প্রভাব কিছুদিন কাজ করে, কিন্তু সেই ভীরুতাকে ধিক্কার দিয়ে শিক্ষিত মন একদিন আপন চিন্তাস্বাতন্ত্র্যের অধিকার জোরের সঙ্গে দাবি করবেই।… এইখানেই পরিত্রাণের রাস্তা রয়ে গেল।” (ঐ, ৩২৮ পৃষ্ঠা) আর সর্বশেষে যখন কবি এ-কথা বলেন যে “অসম্ভব নয় যে, বর্তমান রুগ্ন যুগে বলশেভিক নীতিই চিকিৎসক ; কিন্তু চিকিৎসা তো নিত্যকালের হতে পারে না বস্তুত ডাক্তারের শাসন যেদিন ঘুচবে সেইদিনই রোগীর শুভদিন” তখন সম্ভবত বলশেভিক তত্ত্বের সঙ্গেও তাঁর অবনিবনার কিছুই থাকবে না—emphasis-এর ইতরবিশেষ ছাড়া।

সব মিলিয়ে সোভিয়েত ভ্রমণ যে রবীন্দ্রনাথকে নানাদিক থেকে গভীর-ভাবে নাড়া দিয়েছিল তা বোঝা যায় তার ঠিক পরেই তাঁর আমেরিকা যাত্রার বিবরণ এবং রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীকে লেখা অন্যান্য চিঠি থেকে (রচনাবলী ২০শ খণ্ড, ৩৫২-৫৩ দ্রষ্টব্য)।

সোভিয়েতের প্রভাব তাঁর মনে যে স্থায়ী রূপ নিয়েছিল তার প্রমাণ এর পরেও অনেক মেলে। ১৯৩১ সালে একটি প্রবন্ধ তিনি লেখেন ; “…খেজুরগাছ তালগাছ বিধাতার দান, তাড়িখানা মানুষের সৃষ্টি। তালগাছকে মারলেই নেশার মূল মরে না। যন্ত্রের বিষদাঁত যদি কোথাও থাকে, তবে সে আছে আমাদের লোভের মধ্যে। রাশিয়া এই বিষদাঁতটাকে সজোরে ওপড়াতে লেগেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে যন্ত্রকে সুদ্ধ টান মারেনি ; উল্টো, যন্ত্রের সুযোগকে সর্বজনের পক্ষে সম্পূর্ণ সুগম করে দিয়ে রোগের কারণটাকেই সে ঘুচিয়ে দিতে চায়।” (‘বাঙালীর কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত’, প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৩৮)।

রাশিয়া ভ্রমণের ফলে সমাজসত্যের গভীরে প্রবেশের সুযোগ যুদ্ধের আশঙ্কা, সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকায় উত্তরোত্তর বিকাশ প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকে স্বচ্ছতর এবং অনুভূতিকে প্রখরতর

করে তোলে। তারই ছায়া পরোক্ষে ঘনিয়ে ওঠে ঐ সময়কার লেখা 'প্রশ্ন', 'মানবপুত্র', 'মৃত্যুঞ্জয়', এমনকি কিছুটা 'শিশু-তীর্থের' মতো কবিতায়, 'রথের রশির' মতো নাটকেও।

১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথ ইরান ও ইরাক ভ্রমণে যান। বাগদাদে তখন ইংরেজরা বিমান থেকে শেখদের গ্রামে প্রতিদিন বোমাবর্ষণ করছিল। ব্রিটিশ বিমানফৌজের ধর্মযাজক সে কথা তাঁকে জানিয়ে যখন তাঁদের বায়ু-অভিযানের তরফ থেকে তাঁর কাছে বাণী চাইলেন তখন রবীন্দ্রনাথ মুক্ত আকাশেও পক্ষী-শাবকদের দাপট সম্পর্কে লিখে পাঠালেন : "If in an evil moment man's cruel history should spread its black wings to invade that realm of divine dreams with its cannibalistic greed and fratricidal ferocity then God's curse will certainly descend upon us for that hideous desecration and the last curtain will be rung down upon the world of man for whom God feels ashamed." ('পারস্যে', রচনাবলী, ২২ খণ্ড, ৪৪০ পৃষ্ঠা)

বাণী পেয়ে বিমানফৌজের পাদ্রি সাহেব খুশী হয়েছিলেন কিনা তা কল্পনা করা চলে সহজেই।

'পারস্যে' রবীন্দ্রনাথ আরো লিখলেন : "আমরা আজ মানুষের ইতিহাসে যুগান্তরের সময়ে জন্মেছি। য়ুরোপের রঙ্গভূমিতে হয়তো-বা পঞ্চম অঙ্কের দিকে পটপরিবর্তন হচ্ছে। এশিয়ার নবজাগরণের লক্ষণ এক দিগন্ত থেকে আর-এক দিগন্তে ক্রমশই ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। মানবলোকের উদয়গিরিশিখরে এই নবপ্রভাতের দৃশ্য দেখবার জিনিস বটে—এই মুক্তির দৃশ্য।" (ঐ, ৪৪৪ পৃষ্ঠা)

এই জাগরণকে কবি স্বাগত জানালেন শুধু এশিয়াবাসী হিসেবে নয়, বিশ্বনাগরিক হিসেবেই, কেননা—"...এশিয়া যদি সম্পূর্ণ না জাগতে পারে তা হলে য়ুরোপের পরিত্রাণ নেই। এশিয়ার দুর্বলতার মধ্যেই য়ুরোপের মৃত্যুবাণ।" (ঐ, ৪৪৫ পৃষ্ঠা)।

এশিয়ার এই নবজাগরণ প্রসঙ্গেই যখন রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : "...এশিয়ার প্রত্যেক দেশ আপন শক্তি প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুসারে আপন ঐতিহাসিক সমস্যার সমাধান করবে, কিন্তু আপন উন্নতির পথে তারা প্রত্যেকে যে প্রদীপ নিয়ে চলবে তার আলোক পরস্পর সম্মিলিত হয়ে জ্ঞানজ্যোতির সমবায় সাধন করবে।" (ঐ, ৫১৫-১৬ পৃষ্ঠা)—তখন আজকের দিনের বান্দুং ঘোষণায় যেন তার প্রতিধ্বনি শুনি।

ওদিকে প্রতিক্রিয়াপন্থার এবং ফ্যাসিজমের উত্তরোত্তর শক্তিসঞ্চয়ে ঐ সময়ে রবীন্দ্রনাথ ক্রমেই উদ্বেগ বোধ করছেন। জ্বলন্ত ভাষায় বর্বরতাকে তিনি ধিক্কার দিলেন 'কালান্তরে' : "আজকাল দেখছি আপনাকে ভদ্র প্রমাণ করবার জন্য সভ্যতার দায়িত্ববোধ যাচ্ছে চলে। অমানবিক নিষ্ঠুরতা দেখা দিচ্ছে প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে।" 'চীনের মর্মস্থানে কামানের গোলা ও আফিমের পিণ্ড একসঙ্গে বর্ষণ', 'পারস্যের কণ্ঠরোধ', 'কঙ্গোয় ইওরোপীয় শাসনের' অবিশ্বাস্য কাহিনী, 'আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোজাতির লাঞ্ছনা', কোরিয়ায়, চীনে 'সভ্য ইওরোপের সর্দারপোড়ো জাপানের' অকথ্য অত্যাচার, 'আয়ার্লণ্ডে রক্তপিঙ্গলের উন্মত্ত বর্বরতা', 'জালিয়ানওয়ালাবাগের বিভীষিকা', ইওরোপের 'উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ফ্যাসিশমের নির্বিচার নিদারুণতা'—কিছুই বাদ পড়ল না তাঁর অভিশাপ-বহ্নি থেকে।

বিক্ষুব্ধ চিত্তে কবি প্রশ্ন করলেন, "এই পেটুক সভ্যতা-সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান হবে কী করে ? অধিকাংশ মানুষকে স্বল্পসংখ্যক মানুষের উদ্দেশে নিজেকে কি চিরকালই উৎসর্গ করতে হবে ?" (শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর প্রতি পত্র, কবিতা, চৈত্র, ১৩৪৯) কিন্তু এবার প্রশ্নের জবাব দিলেন নিজেই : "সভ্যতার এই ভিত্তি বদলের প্রয়াস দেখেছিলুম রাশিয়ায় গিয়ে। মনে হয়েছিল নরমাংসজীবী রাষ্ট্রতন্ত্রের রুচির পরিবর্তন যদি এরা ঘটাতে পারে তবেই আমরা বাঁচব নইলে চোখরাঙানীর ভান করে অথবা দয়ার দোহাই পেড়ে দুর্বল কখনোই মুক্তি লাভ করবে না। নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মানবের নবযুগের রূপ ঐ তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলুম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখিনি। জানি প্রকাণ্ড একটা বিপ্লবের উপরে রাশিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু এই বিপ্লব মানুষের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব।...সর্বমানবের তরফে তাকিয়ে যখন ভাবি তখন এ মনে আপনি আসে যে, নব্য রাশিয়া মানবসভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড়ো মৃত্যুশেল তুলবার সাধনা করচে যেটাকে বলে লোভ। এ প্রার্থনা মনে জাগে যে, তাদের এই সাধনা সফল হোক।" (ঐ)

'নানা ত্রুটি সত্ত্বেও' 'নবযুগের প্রতিষ্ঠাতার' প্রতি কবির সমর্থন সংশয়াতীত।

১৯৩৬ সালে রবীন্দ্রনাথ রলাঁ-বারবুস আয়োজিত বিশ্বশান্তি-সম্মেলনে যে

বাণী পাঠান তার উপসংহার টানেন এই লাইনটি দিয়ে : "We cannot have peace till we deserve it by paying its full price, which is that the strong must cease to be greedy and the weak must learn to be bold." (*Modern Review*, October, 1939, p. 474)

ঐ বছরেই আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ আবার প্রকাশ পেল 'আফ্রিকা' কবিতায়। স্পেনের নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ফ্যাসিজমের সহায়তায় প্রতিক্রিয়াপন্থী ফ্রাঙ্কোর অভিযানও কবির দৃষ্টি এড়াল না। ১৯৩৭ সালের ৩রা মার্চের 'স্টেটসম্যানে' প্রকাশিত তাঁর বিবৃতিতে ছিল তাঁর এই দ্বিধাহীন আহ্বান "In this hour of the supreme trial and suffering of the Spanish people, I appeal to the conscience of humanity. Help the People's-Front in Spain, help the government of the people, cry, in a million voices, halt to reaction, come in your millions to the aid of democracy, to the success of civilization and culture."

ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে তিনি ডাক দিলেন 'দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে, প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে'। লণ্ডনের ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্মেলনকে প্রেরিত বাণীতে ইংরেজেদের স্পষ্ট জানালেন, "When rivalry for colonial exploitation becomes still more acute, the British citizens will find it necessary to arm their Government at home with extraordinary powers to defend their possessions abroad. Then they will suddenly wake up to find that they have forfeited their own liberty and drifted into fascist grip." (*A. B. Patrika*, Oct. 17, 1937)

১৯৩৮ সালে ম্যুনিক বিশ্বাসঘাতকতার ফলে হিটলার কর্তৃক চেকো-স্লোভাকিয়া-গ্রাসের পর রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক লেজানিকে লিখলেন : "It is a tragic revelation that the destiny of all those principles of humanity for which the people of the West turned martyrs for three centuries, rests in the hands of cowardly guardians who are selling it to save their own skins. It turns one cynical to see the democratic peoples betraying their kind when even the bullies stand by each other." (*Hidusthan Standard*, November 10, 1938)

অন্যদিকে ঐ বছরেই প্রকাশিত হল নোগুচির প্রতি তাঁর বিখ্যাত চিঠি দুটি। সেখানে শুধু যে 'এশিয়ার নববিধানের' বুলির আড়ালে চীনের উপরে জাপানী

আক্রমণের নৃশংসতাকে লুকানোর অপচেষ্টাকে তিনি দীর্ণাবদীর্ণ করলেন তাই নয়, যে সব বুদ্ধিজীবীরা এই অপকর্মে আপন আপন সরকারের সহায়তা করছিলেন তাঁদেরও নিন্দা করলেন অকপটে। হিংস্রতার শত্রু হিসাবে তাঁকে যখন নোগুচি চীনকে অস্ত্রসংবরণের অনুরোধ জানাতে বললেন তখন রবীন্দ্রনাথ খোলাখুলি লিখলেন "...how can you expect me to appeal to Chiang-ki-Shek to give up resisting until the aggressors have first given up their aggression?" 'বুদ্ধভক্তি' কবিতাটির পৃষ্ঠপটও এইখানেই পাওয়া যায়।

ঐ বছরেই লেখা 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতায় প্রকাশ পায় 'ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের নিদারুণ' শ্রেণী-সংঘাতের রূপ। অবশেষে ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তীব্র কশাঘাত করলেন চেম্বারলেন দালদিয়েরদের সমগ্র ম্যুনিক তোষণ-নীতিকে: "দেখলুম দূরে বসে ব্যথিত চিত্তে, মহাসাম্রাজ্যশক্তির রাষ্ট্রমন্ত্রীরা নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যের সঙ্গে দেখতে লাগল জাপানের করাল দংষ্ট্রাপংক্তির দ্বারা চীনকে খাবলে খাবলে খাওয়ার, অবশেষে সেই জাপানের হাতে এমন কুশ্রী অপমান বারবার স্বীকার করল যা তার প্রাচ্য সাম্রাজ্যের সিংহাসনচ্ছায়ায় কখনো ঘটেনি। দেখলুম ঐ স্পর্ধিত সাম্রাজ্যশক্তি নির্বিকারচিত্তে এবিসীনিয়াকে ইটালীর হাঁ-করা মুখের গহ্বরে তলিয়ে যেতে দেখল, মৈত্রীর নামে সাহায্য করল জর্মানির বুটের তলায় গুঁড়িয়ে ফেলতে চেকোশ্লোভাকিয়াকে, দেখলুম নন-ইণ্টারভেনশনের কুটিল প্রণালীতে স্পেনের রিপাব্লিককে দেউলে করে দিতে, ম্যুনিক প্যাক্টে নতশিরে হিটলারের কাছে একটা অর্থহীন সই সংগ্রহ ক'রে অপরিমিত আনন্দ প্রকাশ করতে। নিজের সম্মান খুইয়ে এবং ইমান রক্ষা করতে উপেক্ষা করে মুনাফা তো কিছুই হলো না—পদে পদে শত্রুর হস্তকে বলিষ্ঠ ক'রে তুলে আজ নামতে হোলো দারুণ যুদ্ধে।" (প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৪৬)

'জন্মদিনের' কয়েকটি কবিতাতেও সেদিন ফুটে উঠল কবির সংকটচিন্তা।

১৯৪০ সালে ফ্যাসিস্ট প্ররোচনায় ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে সোভিয়েতের যুদ্ধ বাধলে কবির মনে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। 'অপঘাত' কবিতায় তিনি লেখেন 'ফিনল্যাণ্ড চূর্ণ হল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে।' 'অলকা' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধেও ঐ সময়ে লিখলেন "রাশিয়া এই অসমকক্ষ দ্বন্দ্বে জিতলেও তার লজ্জা ঘুচবে না।"

এ সম্পর্কে দুটি কথা বলা দরকার। প্রথমত, সোভিয়েত বাহিনীর পোল্যাণ্ডে প্রবেশ এবং ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে সোভিয়েতের যুদ্ধ ইংরেজের অবিশ্রাম সোভিয়েত-বিরোধী অপপ্রচারের আবহাওয়ায় সেদিন সোভিয়েত-দরদী মহলেও কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিলেন একথা অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এঁদেরই অন্যতম। দ্বিতীয়ত, এ সত্ত্বেও সোভিয়েতের প্রতি তাঁর মনোভাব যে মূলত অপরিবর্তিতই ছিল তার প্রমাণ এ ঘটনার পরেও সভ্যতার সংকট ও মিস্ র‍্যাথবোনের প্রতি চিঠিতে সোভিয়েতের সপ্রশংস উল্লেখ এবং কবির মৃত্যুর পরে বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলনাবীশের প্রবন্ধে কবির অন্তিম দিনগুলির একটি উক্তি "ওরাই পারবে, দানবকে ঠেকাতে পারবে।"

১৯৪১ সালে যুদ্ধের ভয়াবহতার দিক প্রকাশ পেল গল্পসল্পের 'ধ্বংস' কাহিনীটিতে এবং এ যুগের সব চাইতে 'বড খবর' যে শ্রেণীসংগ্রাম, সে-সংগ্রামে শ্রমজীবীর অনিবার্য জয় এবং তাদের সঙ্গেই যে কবির অন্তরের যোগ—এই সব কথা পাওয়া গেল 'বড় খবরে।' তারিখের দিক থেকে র‍্যাথবোর্নের চিঠির আগে হলেও কবির শেষ জীবনের চিন্তাভাবনা চূড়ান্ত রূপ পেল "সভ্যতার সংকটে"। এর অব্যবহিত পৃষ্ঠপট ভারতে ইংরেজী শাসনের প্রতি কবির প্রবল বিতৃষ্ণা হলেও আসলে সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার সংকটই তাঁর প্রবন্ধটির মূল পটভূমি। তাই কিছুটা আত্মসমালোচনার সুরেই তিনি লিখলেন : "জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম ইওরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্রলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে···আমি পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।" ('সভ্যতার সংকট' রচনাবলী ২৬শ খণ্ড, ৬৪০ পৃষ্ঠা)।

কবিজীবনের এই শেষ পর্বে ধনিক-সভ্যতার সংকটচিন্তায় কবির মন বিশেষ ভারাক্রান্ত. ফ্যাসিজমের নিদারুণতায় তিনি গভীরভাবে বিচলিত, যদিও এই পর্বে পৌঁছে এতদিনে তিনি একটা বাস্তব বিকল্পের সন্ধানও পেয়েছেন সোভিয়েতের মধ্যে। সেখানেও দ্বিধাদ্বন্দ্বও নেই এমন নয়. বিভ্রান্তি আছে—তবু সমগ্র চিন্তাস্রোতের নিশানা কোন্ দিকে সে-সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ নেই।

আর পর্ব থেকে পর্বান্তরে যে ঐক্যসূত্রটি প্রবহমান তা হচ্ছে—অপরাজিত, অপরাজেয় মনুষ্যত্বে নিঃসংশয় বিশ্বাস।

রবীন্দ্র-নাট্য প্রসঙ্গে

হিরণকুমার সান্যাল

রবীন্দ্রনাথ বলতেন, আমার গান, আমার ছোটগল্প আর আমার ছবি এ তোমরা না নিয়ে পারবে না। আশ্চর্য এই, কবিতার কথা বলতেন না, কেননা কবিতা সম্পর্কে বোধহয় তাঁর মনে কোনো সন্দেহই ছিল না ধরে নিয়েছিলেন তা তো লোকে নেবেই কিংবা ইতিপূর্বেই নিয়েইছে। আর যদিও ছেলেবেলা থেকেই তিনি নাটক রচনা ও অভিনয় করেছেন তবু নাটক সম্পর্কে এই জাতীয় উক্তি তাঁর মুখে কখনো শুনি নি। হয়তো তাঁর মনের মধ্যে কোথাও একটা দ্বিধা ছিল যে, যেভাবে অভিনয় করলে তাঁর নাটকগুলি ফুটে ওঠে তা অপরের সাধ্যাতীত। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ যে তিনি পছন্দ করতেন না সে তো জানা কথা। আর এই সব রঙ্গমঞ্চে যে সব নাটকের অভিনয় হত সেগুলি সম্পর্কেও তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। শেষ জীবনে তাঁর দু-একটি নাটক অবশ্য পেশাদারী মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল— এগুলি ব্যতিক্রম।

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি বাদ দিলে তাঁর রচনাসম্ভার অনেকখানি কমে যায় কেননা, তাঁর নাটকীয় রচনা যেমন বহুল তেমনি বিচিত্র কিন্তু তাঁর সমস্ত নাটকগুলি বাদ দিলেও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-গৌরব বোধহয় খুব বেশী ক্ষুণ্ণ হয় না। কিন্তু এ-ও সত্য যে শুধু নাটকীয় রচনার জোরে তিনি মহৎ সাহিত্যিক বলে নিশ্চয়ই গণ্য হতে পারেন। শুধু মহৎ সাহিত্যিক নয়, মহৎ মানুষও। কেননা, সমগ্র রাবীন্দ্রিক শিল্প ও চিন্তা স্তরে স্তরে ধরা পড়েছে তাঁর নাটকগুলিতে।

নাটক শুধু সাহিত্য নয়, অতিরিক্ত আরো কিছু, অর্থাৎ যে সাহিত্য শুধু পাঠ্য তো বটেই উপরন্তু সবাক এবং সচল শুধু সেই সাহিত্যই হল যথার্থ নাটকজাতীয়।[১] মোট কথা বলা যেতে পারে, কোনো রচনা নাটক কি না

১. A true play is three-dimensional ; it is literature that walks and talks before our eyes.—Marjorie Boulton, *The Anatomy of Drama.*

তা বিচারের মাপকাঠি তার অভিনয়যোগ্যতা। এই মাপকাঠি প্রয়োগ করলে দেখা যায় যে, রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে যে-সব রচনার উল্লেখ করা হয় তার অনেকগুলিই যথার্থ নাটকের পর্যায়ে পড়ে না, যেমন, চিত্রাঙ্গদা বা কর্ণকুন্তীসংবাদ। এগুলি কাব্য এবং উৎকৃষ্ট কাব্য কিন্তু এগুলি নাটক নয়।

গীতিকবিরা অনেকেই দেখা যায় অল্পবিস্তর নাট্যরচনার প্রয়াসী হয়েছেন। যেমন আমাদের অতি পরিচিত ইংরেজী রোমান্টিক যুগের কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলি, কীট্‌স্ বা পরবর্তী যুগের ব্রাউনিং, বা আরো কাছাকাছি এসে, য়েট্‌স এবং অবশ্য আমাদের সমসাময়িক কবি এলিয়ট। এর কারণ খানিকটা বৈচিত্র্যের আকর্ষণ অর্থাৎ বিভিন্ন রচনাপদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বাসনা। এই কারণ অবশ্য সহজে বোঝা যায়, কিন্তু ওটাই একমাত্র, এমনকি প্রধান কারণ নয়। তাহলে আসল কারণ কী?

শিল্পসৃষ্টির মূলে রয়েছে সংঘাত—সংঘাতের মধ্যেই শিল্পের জন্ম, শিল্পের সার্থকতা সংঘাতকে প্রতিফলিত ক'রে, সে সংঘাত মনোজগতের হোক বা বহির্জগতের হোক। গীতিকবিতার মধ্যে সচরাচর হয়তো এই সংঘাত স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে না, কেননা গীতিকবিতার ধর্ম হল ইংরেজীতে যাকে বলে মেলডি— সেইজাতীয়, সিমফনি-জাতীয় নয়।

গীতিকবিতার মধ্যে যে সংঘাত থাকে না তা নয় যেমন, রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী কবিতা। এই অসাধারণ কবিতাটির প্রেরণা যে বিশেষ এক সংঘাত, তা যে-কোনো বুদ্ধিমান পাঠকের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট যদিও এই সংঘাতের কারণ মোটেই স্পষ্ট নয়; কেননা এই সংঘাত কবির অবচেতন-লোকের ব্যাপার, তাই কবির সচেতন মনে তার স্পষ্ট ছায়া পড়ে নি। অবশ্য তাই বলে সোনার তরীর মতন কবিতাকে যেন কেউ নাটকীয় কবিতা বলে ভুল না করেন, যেমন নাটকীয় কবিতা বলতে বুঝায় কর্ণকুন্তীসংবাদ বা কথা ও কাহিনীর অনেক আখ্যানমূলক কবিতা। এইরকম আরো একটি বড়ো আকারের কবিতা মালিনী। মালিনীকে অনেকেই পুরোপুরি নাটক বলেহ ধরে নিয়েছেন কিন্তু মালিনী কতটা অভিনয়যোগ্য এ সম্পর্কে এই প্রশ্নের অবকাশ আছে—একথা বলা যেতে পারে। মালিনীর ভিতরকার সংঘাত কবিতায় এত ভালোভাবে ফুটে উঠেছে যে এর পর অভিনয় বাহুল্য মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ একদা জয়দেবের গীতগোবিন্দের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছিলেন যে এই রচনা কথায় ও ছন্দে মিলে এমনই সম্পূর্ণ কাব্য হয়ে উঠেছে যে এর উপর গানের স্থরের কোনো জায়গা নেই। চিত্রাঙ্গদা বা মালিনী, বিশেষ করে চিত্রাঙ্গদা, এই কারণেই ঠিক নাটকের পর্যায়ে পড়ে না। গানে কথার মধ্যে যে অসম্পূর্ণতা তা সম্পূর্ণতা লাভ করে যেমন স্থরসংযোগে, নাটকের শুধু কথার মধ্যেও তেমনি একটা ফাঁক থেকে যায়, যা ভরে ওঠে অভিনয়েব সময়—প্রযোজক ও নট-নটীর সহযোগিতার ফলে। গ্র্যানভিল বার্কার বলেছেন যে, নাটক ছিল সংগীতের স্বরলিপিব মতো কাগজে লেখা কথাগুলো আসল নাটকের বীজমাত্র। বার্কাবের এই উক্তির যাথার্থ্যের সাক্ষাৎ প্রমাণ আমরা পেয়েছি বহুরূপী-প্রযোজিত রক্তকরবী নাটকের অভিনয় দেখে। নাটকটি যখন লেখা হয় তখন এর অর্থ নিয়ে বিস্তর আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর যক্ষপুরীর রাজার জালের একটা রঙিন ছবি পর্যন্ত এঁকে ফেললেন এই তর্কবিতর্কের উত্তেজনায়। ফলে নাটকটির অর্থ পাঠকদেব কাছে স্পষ্ট হওয়া দূরের কথা, ঐ ছবির নামের থেকেও অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অথচ রবীন্দ্রনাথ বিশেষ জোর দিয়েই বলেছিলেন যে নাটকটি রূপক নয়। এমনকি এডোয়ার্ড টমসনের মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধি সমালোচকও নাটকটির সার্থকতা খুঁজে পান নি। কিন্তু এই নাটকটি নাটক হিসেবে যে কতখানি সার্থক তার সন্ধান আমরা পেলাম যখন মঞ্চের উপর এর চরিত্রগুলি সজীব হয়ে উঠল। একেই আমরা যথার্থ নাটক বলব।

অবশ্য এ কথা আমি বলতে চাই নে যে বহুরূপী যে ভাবে রক্তকরবীর প্রযোজনা করেছেন তার মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই। নাটককে এর আগে তুলনা করেছি স্বরলিপির সঙ্গে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে স্বরলিপি অনুযায়ী গান তুলতে হলে গায়কের যেটুকু স্বাধীনতা আছে, নাটকের বেলায় প্রযোজকের স্বাধীনতা তার চাইতে অনেক বেশী। কেউ কেউ হয়তো বলবেন, বহুরূপী সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করেছেন। আমার বক্তব্য, রক্তকরবীর মধ্যে যে তীব্র নাটকীয় সংঘাত আছে অন্ততঃ সেইটুকু বহুরূপী আমাদের স্পষ্ট করে বোঝাতে পেরেছেন। ফলে এই নাটকটির অভিনয়-যোগ্যতা সম্বন্ধে আমাদের মনে যে-দ্বিধার ভাব ছিল, আর তা নেই।

রক্তকরবীর সূত্রে আরো দু-একটি ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যদিও বলেছেন যে, নাটকটি রূপক নয় কেননা এর পালা

হল নন্দিনী নামে একটি মানবীকে নিয়ে। তবু নাটকটিকে রূপক ছাড়া আর কী বলব জানি না। কেউ কেউ বলবেন রক্তকরবী সাংকেতিক বা প্রতীকী নাটক। মোটামুটি ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে কিন্তু ঐ একই। তাহলে রবীন্দ্রনাথ কেন বললেন রূপক নয়? মনে হয় তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, ডাকঘর বা রাজা নাটক দুটিকে যে-অর্থে রূপক (বা বিকল্পে সাংকেতিক) বলা হয় রক্তকরবী মোটেই সেইজাতীয় রচনা নয়; কেননা এর কারবার পুরোপুরি মানুষের পৃথিবীকে নিয়ে। পাছে এর একটা আধ্যাত্মিক অর্থ লোকে বের করবার চেষ্টা করে সেই ভয়েই রবীন্দ্রনাথ এর রূপকত্ব অস্বীকার করেছেন। আধ্যাত্মিক কথাটা একটু গোলমেলে। ইংরেজীতে যাকে স্পিরিচুয়াল বলে তার প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করলে রক্তকরবীকে নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক নাটক বলব। কিন্তু আমরা আধ্যাত্মিক কথাটির একটা সংকীর্ণ মানে করে নিয়েছি যা প্রায় অপার্থিবতার সামিল, জীবাত্মা ও পরমাত্মার রহস্যময় সম্পর্কঘটিত ব্যাপার।

যদি ব্যাপক অর্থে আধ্যাত্মিক শব্দটি প্রয়োগ করি, অর্থাৎ, ইংরেজী স্পিরিচুয়াল শব্দটির প্রতিশব্দ হিসাবে, তাহলে দেখা যায় প্রথম-যৌবনের প্রকৃতির প্রতিশোধ থেকে আরম্ভ করে (এর আগেকার নাটকগুলি নিতান্তই অপরিণত বয়সের রচনা, সুতরাং আলোচনাগ্রাহ্য নয়) একেবারে শেষবয়সের মুক্তধারা, রক্তকরবী ও তপতী পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রধান প্রধান নাটক সবক'টিরই মূল কথা আধ্যাত্মিক। এই কারণেই এডোয়ার্ড টমসন এগুলিকে ড্রামাস্ অফ্ আইডিয়াজ বলেছেন। আমি অবশ্য হাস্যকৌতুক ব্যঙ্গকৌতুক বা হালকা সামাজিক নাটকগুলির কথা এ ক্ষেত্রে ধরছি না।

বোধ হয় কথাটা আর একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। নাটকের কারবার যে সংঘাতকে নিয়ে সে কথা আগেই বলেছি। আর এই সংঘাত যে-জাতীয়ই হোক-না-কেন তার ফলে কোনো-না-কোনো সমস্যার উদ্ভব হবেই। কিন্তু তত্ত্ব বলতে আরো একটু বেশী বোঝায়। ব্যাখ্যা করে বলবার প্রয়োজন নেই, প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটকটির দৃষ্টান্ত দিলেই তত্ত্বের ধারণা যথেষ্ট বোঝা যাবে। আর যদি নিতান্তই ব্যাখ্যার দরকার হয় তাহলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কী বলেন শোনা যেতে পারে:

> "আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া

বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল— এই প্রকৃতির প্রতিশোধ-এও সেই ইতিহাসটিই একটু অন্যরকম করিয়া লিখিত হইয়াছে। পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটা ভূমিকা। আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।"[১]

এ হল কবির কথা, আর, কবির কথা যে আক্ষরিক অর্থে সত্য হবে তার মানে নেই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বা নাটকে কখনও পালাবদল হয় নি বললে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। কিন্তু এই পালা প্রায় সবসময় কোনো-না-কোনো একটা তত্ত্বাশ্রয়ী, নাটকের বেলায়, কবিতার বেলায় নয়। কবিতার মধ্যে তত্ত্ব থাকলেও তা প্রচ্ছন্ন, নচেৎ কবিতার চরিত্র বজায় থাকত না। কিন্তু নাটকের বেলায় দেখা যায় যে প্রায় সব ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ কোনো-না-কোনো একটি তত্ত্বকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন।

তত্ত্ব বললেই দর্শনের কথা ওঠে। রবীন্দ্রনাথকে যদি দার্শনিক বলতে হয় তাহলে তা শুধু তাঁর নাটকের জন্যে, কবিতার জন্যে নয়। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন যে তিনি শুধু শীতকালেই নাটক রচনা করেছেন। কেননা শীতকালে যখন কবিতার উৎস যায় শুকিয়ে আর মন হয় অন্তর্মুখী, তখন নানা তত্ত্ব মনকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়, আর, এই তত্ত্ব নিয়েই তাঁর নাটকের কারবার। আবার বলছি, আমাদের আলোচ্য তাঁর মুখ্য নাটকগুলি—যেমন, প্রথম জীবনের বিসর্জন আর উত্তর-জীবনের রাজা, ডাকঘর, মুক্তধারা, রক্তকরবী ও তপতী। আর হয়তো অচলায়তন। কিন্তু এই নাটকগুলির রচনার কাল শীত হোক বা বসন্ত হোক, কোনো নিছক নাট্যকার এই ধরনের নাটক লিখতে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথের মতো কবির বেলায় কবিতার উৎস পুরোপুরি শুকিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার; বড় জোর এই উৎস হয় অন্তঃসলিলা, কিন্তু একটু সুযোগ পেলেই তা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ যতদিন পদ্যে নাটক রচনা করেছিলেন,

---

জীবনস্মৃতি

কাব্যলক্ষ্মীকে তিনি পুরোপুরি নাটকীয় শাসনে বাঁধতে পারেন নি। মনে হয় কাব্যলক্ষ্মীর মোহ কাটাবার জন্যে তিনি উত্তরজীবনে নাট্যরচনায় শুধু গদ্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন। ফলে এমন একটি গদ্যের সৃষ্টি হল যার ছন্দ পুরোপুরি গদ্যের কিন্তু যার স্পন্দন কাব্যের। আমি শুধু রবীন্দ্রনাথের নাটকের গদ্যের কথা বলছি—তাঁর পদ্য কবিতার বা প্রবন্ধের গদ্যের নয়, কেননা তা অনেকটা ভিন্ন গোত্রের। রবীন্দ্রনাথের নাটক তার চরম নাটকীয় উৎকর্ষে পৌঁছেছে এইজাতীয় গদ্যের বাহনে।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য নাটকগুলি পদ্য নাটকের চেয়ে যে অনেক বেশী জোরালো তা বোঝাবার জন্যে মঞ্চের প্রয়োজন হয় না, শুধু পড়লেই তা বোঝা যায়। পদ্য নাটকগুলিতে নট ও নটীর সংলাপ অনেক সময় পরিণত হয়েছে কবিতা প্রতিযোগিতায়। পদ্যনাট্যগুলিতে তার অবকাশ নেই বলেই হয়তো এগুলির সংলাপ এত জমাট ও এত তীব্র। রবীন্দ্রনাথ চলতি গদ্যের ভাষা করেছেন কাব্যময়, আবার এই কাব্যময় ভাষাকে করেছেন পথচলা মানুষের ভাষা। এ এক অসাধ্যসাধন। এই রকম ভাষার সন্ধান টি. এস. এলিয়ট পান নি বলেই হয়তো তিনি গদ্যকে পুরোপুরি নাটকের উপযোগী ভাষা বলে মেনে নিতে পারেন নি। এই প্রসঙ্গে ছিন্‌জ্-এর গদ্য নাটকগুলির কথা উল্লেখ করে এলিয়ট বলেছেন যে যদিও এই ভাষা কাব্যের সামিল কিন্তু তা ছিন্‌জ্-এর স্বকীয় ভাষা নয় কেননা, যাদের মুখে ছিন্‌জ্ এই ভাষা বসিয়েছেন তাদেরই মুখ থেকে তা ধার করা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতের সঙ্গে প্রাকৃত মিশিয়ে যে ভাষা সৃষ্টি করেছেন তা তৈরি হয়েছে তাঁর নিজের রসায়নাগারে।

কবিতার হাত যখন বেশ পাকা হয়ে উঠেছে ঠিক তখনই কবি রবীন্দ্রনাথ নাটক রচনার পালা থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। এটা নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। কিন্তু গান যাবে কোথায়? গান বাদ দিয়ে নাটক রচনা করা আমাদের দেশের প্রথা নয়। বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চ থেকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বহু দূরে, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রায় সব প্রথাই তিনি বর্জন করেছিলেন তাঁর নাটক থেকে কিন্তু গান বাদে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন গানের রাজা ও সেইসঙ্গে অভিনয়ের রাজা। ছেলেবেলা থেকে শুধু নাটক লেখা নয়, নাটক করাও তাঁর অভ্যাস। সুতরাং সাধারণ রঙ্গমঞ্চের কী প্রয়োজন? জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারই তো এক স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ। এই ঠাকুরবাড়ির

আঙিনা দিয়ে বয়ে যেত ভারতীয়, বিশেষ করে বাংলার, সংস্কৃতির বিচিত্র ধারা। এখানেই হত স্টেজ বাঁধা আর নানা নাটকের পালা আর দিনের পর দিন নানা ধরনের গানের মহড়া। বিরাট ঠাকুর পরিবারে মধ্যেই জুটে যেত দরকারমতো নটনটী, গায়কগায়িকা। যৌবনে পৌঁছতে না পৌঁছতেই রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন এই রত্নমণ্ডলীর মধ্যমণি। যেমন কলম তেমনি কণ্ঠ। অতএব নিজের লেখা নাটকের নায়কের ভূমিকায় তিনি রঙ্গমঞ্চে দেখা দিতে না দিতেই বিদগ্ধ সমাজে অতি সহজেই তাঁর প্রতিষ্ঠা হল শুধু কবি ও নাট্যকার নয়, অভিনেতা ও গায়ক হিসেবেও।

এক ডাকঘর ছাড়া, গান বাদ দিয়ে নাটক রচনা রবীন্দ্রনাথ আর একটিও করেন নি। একেবারে শেষ বয়সে এই ডাকঘরের জন্যে একটি গান রচনা করেছিলেন (সমুখে শান্তিপারাবার)।[১] দ্বন্দ্ব ছাড়া নাটক হয় না এমনকি যে-কোনো বড়ো সাহিত্য রচনার মধ্যে নিহিত থাকে কোনো-না-কোনো দ্বন্দ্ব। কিন্তু নাটকীয় দ্বন্দ্ব জমাবার পক্ষে গান প্রশস্ত কি না তাতে নিশ্চয়ই সন্দেহের কারণ আছে। অন্ততঃ, রবীন্দ্রনাথের নাটকের বেলায় বারবার মনে হয় যে গানগুলি যেন নাটকীয় দ্বন্দ্বকে অনেকটা হালকা করে দিচ্ছে— অবশ্য পড়লে নয়, অভিনয় দেখলে। যেমন অচলায়তন নাটকে যখন অভিনয় বেশ জমে উঠেছে এমন সময় পঞ্চক এসে গান গেয়ে আমাদের মনকে নিয়ে যায় অন্য এক নির্দ্বন্দ্ব জগতে। আর শেষ পর্যন্ত কানে থেকে যায় ঐ গানগুলিই, মনে হয় যেন নাটকের কথাগুলি গানের মালা সাজাবার একটা কাঠামো ছাড়া আর কিছুই নয়। অচলায়তনে কথাগুলির মধ্যে যে জোর নেই এমন কথা বলছি নে, কিন্তু গানের জোর যে আরো বেশী তাই সুরের জোয়ারে ভেসে যায় নাটকের সংলাপ তার সমস্ত অর্থ ও অনর্থ নিয়ে।

কবি রবীন্দ্রনাথ বরখাস্ত হলেন নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের হাতে। এর শোধ নিলেন গানের রাজা খিড়কির দরজা দিয়ে নাটকের মধ্যে ঢুকে।

অচলায়তনের কথা বলেছি। এতে আছে সংলাপে ও গানে একটা রেষারেষি। কিন্তু মুক্তধারা নাটকে দেখা যায় একটু রকমফের। এই নাটকে সংলাপের মধ্যে যা ফোটে নি তা ফুটেছে গানে, আর এই গান জমেছে যার

১। বিচিত্রা-হলে ১৯১৭ সালে যখন ডাকঘরের অভিনয় হয় তখন সব প্রথমে 'হাঁদে গো নন্দরানী' গানটি গাওয়া হয়েছিল। গানটি অবশ্য প্রকৃতির প্রতিশোধ থেকে নেওয়া তবে ডাকঘরের গোড়ার দিকের আবহাওয়ার পক্ষে এই গানটি উপভোগ্য হয়েছিল।

মুখে, অর্থাৎ ধনঞ্জয় বৈরাগী, সে গানই গায় আর কিছু করে না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে গান নাটকটির আবশ্যিক অঙ্গ হয়ে উঠেছে। এই গানগুলি বাদ দিলে নাটকটি ফিকে হয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আসরে গান্ধীজির আবির্ভাবের দশ বছরেরও আগে তাঁর বাণী মূর্ত হয়েছিল এই ধনঞ্জয় বৈরাগীর মধ্যে প্রায় পরিপূর্ণভাবে। অথচ যখন সত্যিকারের ধনঞ্জয় বৈরাগী এসে আমাদের আহ্বান করলেন অসহযোগ আন্দোলনে তখন প্রতিবাদ এল রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে।

মুক্তধারার মধ্যে রয়েছে দুটি পালা। বাহুবলের বিরুদ্ধে আত্মশক্তির প্রতিরোধ হল এক, আর এক হল যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের বিরোধ। এই দুই পালাই হল আধ্যাত্মিক, কিন্তু ধার্মিক নয়। ডাকঘর ও রাজা ছাড়া আর কোনো নাটকে রবীন্দ্রনাথ জীবাত্মা পরমাত্মার সম্পর্কে নিয়ে মাথা ঘামান নি। রাজাতে দেখা যায় মানুষেরই ছাঁচে ঢালা ভগবান। 'দি গোলডেন বাউ' নামে বিখ্যাত বইটি যাঁরা পড়েছেন তাঁদের হয়তো রাজা পড়লে মনে পড়বে ফ্রেজারের উক্তি Man made God in his own image। কিন্তু 'রাজার' এই মনগড়া ভগবানই আবার বলছেন পৃথিবীর মানুষ সম্বন্ধে : "দেখতে পাই যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, ঋতুর উপহার।" ইওরোপে রেনেসাঁস-এর যুগেও মানুষের চোখে তার নিজের রূপ যে কত আশ্চর্য লেগেছিল তার প্রমাণ পাই মাইকেল এন্‌জেলোর ভাস্কর্যে আর শেক্সপীয়রের হ্যামলেটের উক্তিতে : How wonderful is man, ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ সেই মানুষকেই দেখেছেন চোখে রোম্যান্টিক যুগের অঞ্জন মেখে। ইওরোপে রোম্যান্টিক কবিতার পালা যখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে রবীন্দ্রনাথ বাংলার মাটিতে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে তাতে সঞ্চার করলেন নতুন প্রাণ।

রোম্যান্টিক ভাব নিয়ে কবিতা হয় কিন্তু নাটককে মর্মস্পর্শী করতে হলে বাস্তবতার প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির মধ্যে চরম বাস্তবতা দেখা যায় রক্তকরবীতে। এও প্রতীকী নাটক কিন্তু এর প্রতীকগুলি এমন জোরালো যে রক্তমাংসের মানুষের চেয়েও তারা যেন বেশী সজীব। তাই একজন সমালোচক বলেছেন : এইসব প্রতীক হল more real than reality itself। মুক্তধারার মতন এই নাটকেরও বিষয়বস্তু হল মানুষের সঙ্গে

যন্ত্রের বিরোধ। কিন্তু এখানে এই যন্ত্র শুধু নির্জীব কলকব্জা নয়—একটি আস্ত সমাজ পরিণত হয়েছে এক দানবিক যন্ত্রে। এই যন্ত্র যে ধনিকতান্ত্রিক সমাজ আর এই সমাজের উপরওয়ালাদের প্রধান সহায়ক যে ধর্মগুরু তা নাটকটিতে অত্যন্ত স্পষ্ট করেই দেখানো হয়েছে। এই সমাজের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ প্রকাশ পেয়েছে এমন শাণিত শ্লেষে যার তুলনা পাওয়া কঠিন। রক্তকরবীর বাস্তবতা এইখানেই। এর জুড়ি বাংলা নাট্য-সাহিত্যে নেই। নাটকটির সংঘাত তার চরমে গিয়ে পৌঁছেছে শেষ দৃশ্যে। জাল সরে গেল, দেখা গেল রঞ্জনের মৃতদেহ, নন্দিনীর ডাকেও যখন রঞ্জন সাড়া দেয় না তখন একটি ক্ষুরধার মুহূর্তের জন্যে নাটকটি টলমল করে মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির কিনারায়। কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্যেই। এর পরেই রঞ্জনের ঘাতক রাজা বেরিয়ে পড়েন রঞ্জনেরই সঙ্গিনীর হাতে হাত রেখে নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে। তাঁকে বাধা দেয় তাঁরই আমলার দল। যবনিকা পতনের সঙ্গে শোনা যায় দূরে গান হচ্ছে— 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে ছুটে আয় আয় আয়।'

এই নাটকটির মধ্যে অনেকেই বৈপ্লবিক ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছেন। কী করে পেলেন তা জানি না, কেননা ঐ শেষ গানটির সুরে যদি বিপ্লবের বাজনা বাজে, তা হলে তাতে বিপ্লব হওয়া কঠিন। আর রবীন্দ্রনাথ এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতেও বিপ্লবের ইঙ্গিত লেশমাত্র নেই। কিন্তু নাটকটির যে বাস্তবতার কথা আগে উল্লেখ করেছি, এত তীব্র তার তাপ যে দর্শকদের মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে এই নাটকের একমাত্র সংগত পরিণতি হল বিপ্লব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন না, তাতে সন্দেহের কোনো কারণ দেখি না। শেষ পর্যন্ত তাঁর ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস ছিল অক্ষুণ্ণ। আর এই ব্যক্তিত্বেরই জয়ঘোষণা করছে রক্তকরবী নাটক। বিসর্জনের রঘুপতি বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের একমাত্র নায়ক মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির গৌরবে যে মহীয়ান হয়েছে—ইংরেজী ভাষায় যাকে বলে ট্র্যাজিক হিরো।

শেষ বয়সের নাটকগুলিতে রবীন্দ্রনাথ চিরাচরিত ট্র্যাজেডির ধারা থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। ডাকঘরের অমলের যে মৃত্যু ঘটেছে একথা তিনি মানতেনই না, যদিও, দর্শকদের কাছে এই নাটকটি করুণরসে ঘন হয়ে ওঠে ঐ মৃত্যুর জন্যে। তপতীরও শেষ দৃশ্যে সুমিত্রার আত্মাহুতি দর্শকদের

মনে যে সাড়া জাগায় তা মর্মান্তিক দুঃখের নয়। মুক্তধারার যুবরাজের বেলাতেও তাই।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে ট্র্যাজেডি স্থান পায় নি; তখনকার নাটকীয় আদর্শ ছিল মিলনান্ত। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনা রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর নাটকীয় আদর্শ ছিল ভিন্ন। তিনি নাটকীয় সার্থকতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন মর্মান্তিক দুঃখকে অস্বীকার করে নয়, মর্মান্তিক দুঃখকে মানুষের মুক্তির উপায় হিসেবে ব্যবহার করে। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির শেষ অঙ্কে ধ্বনিত হয়েছে এই মুক্তির জয়গান, ট্র্যাজেডি পরিণত হয়েছে গৌরবে। কিন্তু এই গৌরব আধ্যাত্মিক। সুতরাং সন্দেহ থেকে যায় যে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বাস্তবতাকে বর্জন করে আশ্রয় নিয়েছেন আধ্যাত্মিকতায়।

রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির কথাই এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে, অর্থাৎ যে-নাটকগুলির উপর তাঁর নাটকীয় কীর্তি নির্ভর করবে। কিন্তু এইগুলি বাদ দিলেও তাঁর বাদবাকি নাট্যরচনা সংখ্যায়, বৈচিত্র্যে বা উৎকর্ষে নগণ্য নয়। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনোদিনই ঘনিষ্ঠ যোগ হয়নি, হওয়া সম্ভবও ছিল না, কেননা সমসাময়িক নাট্যকারদের তুলনায় তাঁর জীবনদীক্ষা ছিল অনেক বেশী প্রশস্ত ও রসবোধ ছিল অনেক বেশী সুকুমার। জীবনের গূঢ় তাৎপর্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ মূলত রোম্যান্টিক কবি হয়েও বারবার নাটকীয় সংঘাতের মধ্য দিয়ে চেষ্টা করেছেন তাঁর জীবনাদর্শ প্রকাশ করতে। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে নাটকের অঙ্গাঙ্গিযোগ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপযুক্ত রঙ্গমঞ্চ পান নি বলে হয় তো জনসাধারণের মনে তাঁর মুখ্য নাটকগুলি সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নি। কিন্তু এ কথা কি অস্বীকার করা যায় যে তিনি নাট্যসাহিত্যে আমাদের স্বাদ বদলে দিয়ে গেছেন?

বাংলার নবজাগরণ ভারতবর্ষের ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়। কিন্তু এই অধ্যায়ে শহুরে মধ্যবিত্তের মোহাচ্ছন্ন সংস্কৃতিতে প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল মাটি ও মানুষের যোগসূত্র। রবীন্দ্রনাথ হয়তো সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হন নি কিন্তু এই যোগসূত্রটি আবিষ্কারের প্রয়াসে তাঁর সৃষ্টি উজ্জ্বল। তাঁর নাটকে এই সূত্রটি বারবার দেখা দিয়েছে একটি পথের আকারে। নাটকীয় লোক-যাত্রার ও ঘটনা পরম্পরার বাহন এই পথ। এ যেন মহাভারতীয় মহাজনমার্গ।

এর অবস্থান শুধু দেশে নয় কালেও, সুতরাং এই পথকে গণ্য করা যেতে পারে গাণিতিকের space-time continuum-এর ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া হিসাবে। এই একটি সূত্র দিয়ে তিনি গ্রথিত করতে চেয়েছেন, হয়তো খুব সচেতন ভাবে নয়, তাঁর সমগ্র অভিজ্ঞতাকে। রবীন্দ্রনাথ নিজে বললেও এ-কথা আমরা কখনোই মানব না যে এই অভিজ্ঞতা হচ্ছে সীমার মধ্যে অসীমের উপলব্ধিতে সীমাবদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনে দেখা যায় নিরন্তর এক অস্থিরতা। বারবার মিষ্টিক ও রোম্যান্টিক কবির ভূমিকা ছেড়ে তিনি বেরিয়ে পড়েছেন নব নবতর মূল্যের সন্ধানে। এই আবেগেই রচিত হয়েছে তাঁর অনেক নাটক ও নভেল। কিন্তু সেই ব্যাপক বাস্তবতাবোধ, যা ছাড়া মহত্তম নাটক বা নভেল রচনা অসম্ভব, তা তিনি পুরোপুরি অর্জন করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। তাই তাঁর নাটকে বারবার ফুটে উঠেছে লিরিক কবিতার চরিত্র। তাঁর বড় নাটকগুলির একটিও সম্পূর্ণ নাটকীয় সার্থকতায় উত্তীর্ণ হয়েছে কিনা সন্দেহ, যদিও মাঝে মাঝে তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছেন বহ্নিমান নাটকীয় মুহূর্ত। এই রকম মুহূর্তের পর মুহূর্ত থমথম করে তাঁর নভেলেও। কিন্তু তাঁর বিরাট মনের বিচিত্র সম্পদ নাটক ছাড়া আর কোনো রচনাতে ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয় নি। বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস স্তরে স্তরে ধরা পড়েছে এই নাটকগুলিতে সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত দুর্বলতা নিয়ে। তাই সমস্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও নব নব দিগন্তের দীপ্তিতে এই নাটকগুলি উদ্‌ভাসিত।